এস্থলে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। ঋষিগণ শুদ্ধ যে ভৌগোলিক বিবরণেই কল্পনার ছড়াছড়ি করিয়াছেন, তাহা নহে। সপ্তদ্বীপ এবং সপ্তসমুদ্রের যেরূপ আয়তন ও সংস্থিতির বর্ণন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আরব্য উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ গণিতেও ইহাঁদের অগাধ বিদ্যা ছিল। কৃত্তিবাস পণ্ডিত যেমন রামের সৈন্যসংখ্যার গণনা করিতে যাইয়া, উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম চারিদিকের সৈন্যসংখ্যার সমষ্টির বেলা 'বায়ান্নহাজার' বলিয়া, শুভঙ্করের পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন, প্রাচীন মহর্ষিগণও তদ্রূপ, প্রথমে পৃথিবীর পরিমাণ পঞ্চাশৎকোটি যোজন নির্দ্দেশ করিয়া, পরে সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের পরিমাণে এত গোল করিয়াছেন যে, একটির সহিত অপরের কোনও মিল নাই। আমরা ঠিক দিয়া দেখিতেছি যে, সপ্তসমুদ্র ও সপ্তদ্বীপের পরিমাণ সমষ্টি প্রায় ষোলকোটি যোজনের অধিক হয় না। যদি বল, স্বাদু জলসমুদ্রের পরে একটি দ্বিগুণ বিশিষ্ট দেবতার আলয়স্বরূপ স্বর্ণভূমির ও তৎপর লোকালোক পর্ব্বতের উল্লেখ আছে, তাহা লইয়া ভূমণ্ডলের পরিমাণ সম্পূর্ণ; কিন্তু সাতটি দ্বীপ ও সাতটি সমুদ্রের আয়তন ১৬কোটি আর একটি ভূমি ও একটি পর্ব্বতের আয়তন ৩৪ কোটি হইবে, একথা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি না। অথবা একথা বলাই বাহুল্য, কেন না যাহার আমূল অবিশ্বসনীয়, তাহাতে আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা কি? মহর্ষিগণ কেবল সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্রের আয়তন ও স্থিতি নিরূপণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, এই সকল দ্বীপের অধিবাসী, এবং তাহাদের অবস্থা ও ধর্ম্ম প্রভৃতিরও বর্ণনা করিয়াছেন।

শাকদ্বীপস্তু মৈত্রেয় ক্ষীরদেন সমন্ততঃ।
শাকদ্বীপ প্রমাণেন বলয়েনেব বেষ্টিতঃ॥
ক্ষীরাব্ধিঃ সর্ব্বতোব্রহ্মন্ পুষ্করাখ্যেণ বেষ্টিতঃ।
দ্বীপেন শাকদ্বীপাত্তু দ্বিগুণেন সমন্ততঃ॥
স্বাদূদকে নোদধিনা পুষ্করঃ পরিবেষ্টিতঃ।
সমেন পুষ্করস্যৈব বিস্তারান্মণ্ডলাত্তথা॥

প্রথমতঃ জম্বুদ্বীপস্থ জম্বুবৃক্ষ হইতে যে ফল পতিত হয়, তাহার রস একত্রীভূত হইয়া সেখানে জম্বুনদী নামে এক মহতী নদী হইয়াছে; সেই নদীর জল 'অমৃতস্বাদুরুচাতে'* অমৃতের ন্যায় মিষ্ট স্বাদ বিশিষ্ট। জম্বুদ্বীপনিবাসীরা ঐ নদীর জম্বুরসরূপ জলপান করে। তাহাতে—

'নখেদো নচ দৌর্গন্ধ্যং ন জরা নচেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
তৎপানস্বস্থমনসাং জনানাং তত্র জায়তে॥' ইতি বৈষ্ণবে।

তত্তীরবাসিদিগের মন সর্ব্বদা সুস্থ থাকে, কখনও অন্তঃকরণে খেদের উদ্রেক হয় না, শরীরে দুর্গন্ধ হয় না, পুংশক্তির হ্রাস হয় না ও জরা হয় না। সুমেরু পর্ব্বতপ্রভাবে

* শৈবপুরাণে

এইস্থল সাধারণ লোকদিগের অনধিগম্য, কেবল

'তত্রযান্তি জিতক্রোধা জিতলোভা জিতেন্দ্রিয়াঃ।' ইতি শৈবে।

জিতক্রোধ, জিতলোভ এবং জিতেন্দ্রিয় লোকদিগেরই ইহা অধিগম্য।

প্লক্ষদ্বীপে চারি বর্ণ বাস করে। যথা বৈষ্ণবে—

'আর্য্যকাঃ কুরবাশ্চৈব বিবিংশা ভাবিনশ্চয়ে।

বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাস্তে শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম ॥

ইজ্যতে তত্র ভগবাংস্তৈর্বর্ণৈরার্য্যকাদিভিঃ।

সোমরূপী জগৎস্রষ্টা সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরোহরিঃ ॥'

অর্থাৎ আর্য্যক, কুরব, বিবিংশ ও ভাবি; ইহারা জম্বুদ্বীপে ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল জাতি চন্দ্রকে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বররূপে পূজা করে।

'শাল্মলে যেতু বর্ণাশ্চ বসন্ত্যেতে মহামুনে।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব যজন্তিতং ॥

বায়ুভূতং মুখশ্রেষ্ঠৈর্ব্বিজ্ঞোনোযজ্ঞসংজ্ঞিতং।'

শাল্মলি দ্বীপেও ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ অবস্থিতি করেন, তাঁহারা বায়ুকে ঈশ্বর বলিয়া মানেন, এবং তাহাকেই যজ্ঞেশ্বর বলিয়া তদুদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করেন।

এইরূপে কুশদ্বীপে ও চারিবর্ণ আছে, তাঁহারা নিত্যানুষ্ঠানতৎপর।

"তত্রতেতু কুশদ্বীপে ব্রহ্মরূপং জনার্দ্দনং।

যজন্তঃ ক্ষয়য়ন্ত্যুগ্র মধিকার ফলপ্রদং ॥"

ইঁহারা ব্রহ্মরূপি পরমেশ্বরকে হোমাদি দ্বারা যজন করিয়া স্ব স্ব অধিকারানুরূপ কর্ম্মফল সম্ভোগপূর্ব্বক কর্ম্ম ক্ষয় করেন।

ক্রৌঞ্চদ্বীপবাসিগণ 'যাগৈরুদ্রস্বরূপস্থ ইজ্যতে যজ্ঞ সন্নিধৌ।' রুদ্ররূপি ঈশ্বরকে হোমদ্বারা অর্চ্চনা করে।

'শাকদ্বীপেতু তৈর্বিষ্ণুঃ সূর্য্যরূপ ধরোমুনে।

যথোক্তৈরর্চ্চ্যতে সম্যক্ কর্ম্মভির্নিয়তাত্মভিঃ ॥'

শাকদ্বীপস্থ অধিবাসিগণ কর্ম্ম দ্বারা সূর্য্যরূপি ভগবানকে অর্চ্চনা করে।

"দশবর্ষ সহস্রাণি তত্র জীবন্তি মানবাঃ।

নিরাময় বিশোকাশ্চ রাগদ্বেষবিবর্জ্জিতাঃ ॥

তুল্যরূপাস্তু মনুষ্যা দেবৈস্তত্রৈকরূপিণঃ।

বর্ণাশ্রমাচারহীনং ধর্ম্মাহরণ বর্জ্জিতং।

* * * *

ভোজনং পুষ্করদ্বীপে তত্রস্বয়মুপস্থিতং ॥"

পুষ্করদ্বীপে অধিবাসীদের আয়ুসংখ্যা দশসহস্র বৎসর; তাহারা নিরাময়, অশোক ও রাগদ্বেষহীন। তাহারা সকলেই তুল্যরূপ এবং দেবতাদিগের সদৃশ। সেখানে বর্ণভেদ নাই, আশ্রমভেদ নাই, আচার নাই, বা কোনও ধর্ম্ম নাই। সেখানে আহারের জন্য চিন্তিত হইতে হয় না, কারণ আহার স্বয়ং উপস্থিত।

অতঃপর কোন কোন পর্ব্বত ও নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে।

" সর্ব্বেষাঞ্চৈব দ্বীপানাং সপ্ত সপ্তৈব পর্ব্বতাঃ।
সপ্তৈব নদ্যস্তেষান্তু বর্ষাণি সপ্ত সপ্তবৈ॥
নতু রোগা ন জরা ন শোকা ন পরিশ্রমঃ।
মান্যাং স্ত্রিয়ং বিজানন্তি চক্রবাক সধর্ম্মিণঃ।
ত্রেতাযুগ সমঃকালঃ সর্ব্বদৈব মহামতে।
প্লক্ষদ্বীপাদিষু ব্রহ্মন্ শাকদ্বীপান্তকেষুবৈ॥
পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি জনাজীবন্ত্য নাময়াঃ॥"

প্লক্ষদ্বীপ অবধি শাকদ্বীপ পর্য্যন্ত পঞ্চদ্বীপে সপ্তসপ্ত পর্ব্বত, সপ্তসপ্ত নদী ও সপ্তসপ্ত বর্ষ আছে। ঐ সমস্ত বর্ষবাসিগণ অরোগ, অশোক, অজর ও অপরিশ্রম। ইহারা অন্যস্ত্রীসঙ্গ করে না, স্বামী স্ত্রী চক্রবাক্ মিথুনের ন্যায়। ত্রেতাযুগে লোকদিগের যেরূপ আয়ুসকাল ছিল, ইহাদেরও তদ্রূপ পঞ্চসহস্রবর্ষ পরমায়ু।

"একস্তত্র মহাভাগ প্রখ্যাতো বর্ষপর্ব্বতঃ।
মানসোত্তর সংজ্ঞোসৌ মধ্যতো বলয়াকৃতিঃ॥

* * * * *

বর্ষদ্বয়ন্তু মৈত্রেয় ভৌমঃ স্বর্গোহয়মুত্তমং।"

শাক দ্বীপের মধ্যভাগে বলয়াকারে মানসোত্তর নামে এক বর্ষ পর্ব্বত আছে। উহাতে দ্বীপটীকে বর্ষদ্বয়ে বিভক্ত করিয়াছে, এবং ঐ বর্ষদ্বয় এত সুন্দর যে তাহাদিগকে ভূস্বর্গ বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যে স্বাদু জল সমুদ্রের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার পর পারে, " সর্ব্বজন্তু বিবর্জ্জিতা " দ্বিখণ্ড এক " কাঞ্চনীভূমিঃ " আছে। তাহার পর পৃথিবীর সীমারূপে এক বৃহৎ শৈল আছে—

" অর্ব্বাচীনেতু তস্যার্দ্ধে চরন্তিরবিরশ্ময়ঃ।
পরার্দ্ধেতু তমোনিত্যং লোকালোকস্ততঃ-স্মৃতঃ॥" ইতিলৈঙ্গে।

উহার এক পার্শ্বে রবি রশ্মির গমন, অপর পার্শ্বে সূর্য্য কিরণের গমনাভাব। তৎপ্রযুক্ত ঐ শৈলের নাম লোকালোক পর্ব্বত।

অনেকে অনুমান করেন যে, আধুনিক এসিয়াখণ্ডকেই প্রাচীন আর্য্যেরা জম্বুদ্বীপ কহিতেন, অপর ছয় দ্বীপের বিবরণ কল্পিত হইলেও জম্বুদ্বীপের বিবরণ তাঁহারা সম্যক্ প্রকারে অবগত ছিলেন, এবং জম্বুদ্বীপ সম্বন্ধে অনেক বৃত্তান্ত প্রকটন ও করিয়া গিয়াছেন। এই অনুমান নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক না হইলেও সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে। কারণ জম্বুদ্বীপের বিষয়ে আর্য্যেরা অনেক কথা কহিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার অধিকাংশেরই আধুনিক তত্ত্বের সহিত ঐক্য নাই। যাহাহউক সে সকল বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া পুরাণে যেরূপ বর্ণন আছে, তাহাই অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি। জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত-বিষ্ণুপুরাণে যথা—

" ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং-স্মৃতং।

হরিবর্ষং তথৈবান্যন্মেরোর্দক্ষিণতো দ্বিজ ॥
রম্যকঞ্চোত্তরং বর্ষং তথৈবানুহিরণ্ময়ং।
উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব যথাবৈভারতং তথা ॥
ইলাবৃতঞ্চ তন্মধ্যে সৌবর্ণোমেরুরুচ্ছ্রিতঃ।
মেরোঃপূর্ব্বেণভদ্রাশ্বং কেতুমালঞ্চ পশ্চিমে।
নবসাহস্রমেকৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তম ॥”

জম্বুদ্বীপের দক্ষিণাংশে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত এই ভারতবর্ষ, তদুত্তরে কিম্পুরুষ, তদুত্তরে হরিবর্ষ, তদুত্তরে সুমেরুর চতুঃপার্শ্বে ইলাবৃতবর্ষ, ইলাবৃতের পূর্ব্বে ভদ্রাশ্ববর্ষ ও পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, এই তিনবর্ষের উত্তরে রম্যকবর্ষ, তদুত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, এবং তদুত্তরে কুরুবর্ষ। এই নয় বর্ষের প্রত্যেকের পরিমাণ নয় সহস্র যোজন!

উপরে যে হিমালয় ও সুমেরু পর্ব্বতের উল্লেখ হইল, তন্মধ্যে হিমালয়ের বর্ণনা স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে; সুমেরুর বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ আছে—

“ তস্যাপি মেরুর্মৈত্রেয় মধ্যে কনক পর্ব্বতঃ।
চতুরশীতি সহস্রো যোজনৈস্তস্যচোচ্ছ্রয়ঃ ॥
প্রবিষ্টঃষোড়শাধস্তা দ্বাত্রিংশন্মূর্দ্ধ্নি বিস্তৃতঃ।
মূলে ষোড়শসহস্রো বিস্তরাস্তস্য ভূভৃতঃ ॥”

অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের মধ্যভাগে সুমেরু নামে এক কাঞ্চনময় পর্ব্বত আছে। তাহার উচ্চতা চৌরাশি সহস্র যোজন, এবং পৃথিবীর অভ্যন্তরে ষোল সহস্র যোজন প্রোথিত; ইহার শিরোভাগের বিস্তার বত্রিশ সহস্র যোজন; এবং মূলের বিস্তার ষোলসহস্র যোজন। লিঙ্গপুরাণে আছে—

“ নতত্র সূর্য্যাস্তপতি নচজীর্য্যন্তিমানবাঃ।
চন্দ্রসূর্য্যো সনক্ষত্রৌ প্রকাশেতেনতত্রবৈ॥”

শৈবেচঃ—

‘ নচবর্ষতি পর্জন্যোগিরেস্তস্য প্রভাবতঃ।’

এই পর্ব্বতে সূর্য্য প্রখর রশ্মিদ্বারা তাপদানে অসমর্থ, এবং ইহার অধিবাসীরা জরাজীর্ণ নহে। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি তথা প্রকাশ হইতে পারে না; এবং মেঘ পর্য্যন্ত সেখানে বারি বর্ষণ করে না।

পুনশ্চ বৈষ্ণবে—

‘ মেরোশ্চতুর্দ্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তৃতং।
ইলাবৃতং মহাভাগ চত্বারশ্চত্রে পর্ব্বতাঃ ॥
বিষ্কম্ভারচিতামেরোর্যোজনাযুত মুচ্ছ্রিতাঃ।
কদম্বস্তেষু জম্বুশ্চ পিপ্পলো বট এবচ।
একাদশ শতায়ামাঃ পাদপাগিরিকেতবঃ ॥’

সুমেরুর চতুর্দ্দিকে নয় সহস্র যোজন বিস্তৃত ইলাবৃতবর্ষ। ঐ বর্ষের চতুঃপার্শ্বে চারিটি পর্ব্বত। সেই প্রাচীর স্বরূপ শৈল চতুষ্টয়ের উপরিভাগে ক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম এবং উত্তরদিকে কদম্ব, জম্বু, অশ্বত্থ, ও বট বৃক্ষ আছে। উহার এক এক বৃক্ষের উচ্চতা একাদশ সহস্র যোজন।

মহর্ষিগণ তৎপরে নববর্ষের সীমাপর্ব্বতগুলির এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন যে, হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, নীল, শ্বেত, শৃঙ্গবান, মাল্যবাণ ও গন্ধমাদন, ঐ অষ্ট মহাদুর্লংঘ্য পর্ব্বতের দ্বারা নববর্ষ বিভক্ত

হওয়াতে, একবর্ষের লোক অপর বর্ষে যাইতে পারে না। ভারতবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষও হরিবর্ষের উত্তর সীমায় ক্রমে হিমালয়, হেমকূট, এবং নিষধ নামক অদ্রিত্রয় অবস্থিত, ইহাদের দৈর্ঘ্য ক্রমে, ৮০, ৯০, ও ১০০ সহস্র যোজন। কেতুমাল, ইলাবৃত,ও ভদ্রাশ্ব এই বর্ষত্রয়ের উত্তর সীমা নীল পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য ও নিষধের ন্যায় লক্ষ যোজন। রম্যকবর্ষের উত্তর সীমা শ্বেত পর্ব্বত নবতি সহস্র যোজন দীর্ঘ ও হিরন্ময় বর্ষের উত্তর সীমা শৃঙ্গবান্ অশীতি সহস্র যোজন দীর্ঘ। এই ছয় পর্ব্বতের প্রত্যেকটি দ্বিসহস্র যোজন উচ্চ ও দ্বিসহস্র যোজন বিস্তৃত। এবং দৈর্ঘ্যে ইহারা পূর্ব্ব পশ্চিম সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। কিন্তু জম্বুদ্বীপের গোলতা নিবন্ধন কোথাও দৈর্ঘ্য কিঞ্চিৎ অধিক, কোথাও কিছু ন্যূন। *

বিষ্ণুপুরাণের স্থলান্তরে লেখা আছে যে, মালাবাণ ও গন্ধ মাদন পর্ব্বত, উত্তরে নীল পর্ব্বত ও দক্ষিণে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, এবং প্রত্যেকে চল্লিশ সহস্র যোজন উচ্চ।

'আনীল নিষধায়ামৌ মাল্যবদ্ গন্ধমাদনৌ।
চত্বারিংশৎ সহস্রাণি পরিব্রঙ্কৌ মহীতলাৎ।'

তদন্তর লিঙ্গপুরাণে এই সকল পর্ব্বতের শোভা ও ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি এইরূপে বর্ণিত আছে:—

'হিমবৎপ্রমুখাশ্চাষ্টৌ মর্য্যাদাপর্ব্বতাইমে।
নানাধাতু পিনদ্ধাশ্চ নানারত্নাকরা শ্চবৈ॥
নানাপুষ্প ফলোপেতা নানাবৃক্ষগণাবৃতাঃ।
ভূস্বর্গা দেবভোগাশ্চ দুষ্প্রাপ্যা মানবৈর্ভুবি।
হেমকূটেতু গন্ধর্ব্বা বিজ্ঞেয়া শ্চাপ্সরো গণাঃ॥
সর্ব্বে নাগাস্তু নিষধে শেষ বাসুকি তক্ষকাঃ॥
নীলেষু বৈদূর্য্যময়ে সিদ্ধ ব্রহ্মর্ষয়ো মলাঃ।
দৈত্যানাং দানবানাঞ্চ শ্বেত পর্ব্বত উচ্যতে॥
শৃঙ্গবৎ পর্ব্বতে চৈব পিতৃণাং নিলয়াঃ শুভাঃ।
হিমবান্ দক্ষ মুখ্যানাং ভূতানামীশ্বর স্যচ।
সর্ব্বাদ্রিষু মহাদেবো হরিণা ব্রহ্মণা সুরৈঃ॥'

গন্ধমাদন পর্ব্বত সম্বন্ধে স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে—

শৃঙ্গীচ ক্রমেনৈবং প্রমাণকাঃ। অবগাঢ়াস্ত্বভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব্ব পশ্চিমৌ। দ্বীপস্য মণ্ডলীভাবাদহ্রাস বৃদ্ধি প্রকীর্ত্তিতে॥

---

* শ্রীমদ্ভাগবতে। যস্মিন্নব বর্ষাণি নবযোজন সহস্রায়ামান্যষ্টভির্মর্য্যাদা গিরিভিঃ সবিভক্তানি ভবন্তি॥ বৈষ্ণবেচ। হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধাশ্চ স্য দক্ষিণে। নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গীচ উত্তরে বর্ষপর্ব্বতাঃ। লক্ষ প্রমাণৌ দ্বৌমধ্যে দশহীনাস্তথা পরে। সহস্রদ্বিতয়োচ্ছ্রায়াস্তাবদ্বিস্তারিণশ্চতে॥ বারাহে। জম্বুদ্বীপ প্রমাণেন নিষধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ তস্মাচ্চ দশভাগেন হেমকূটঃ প্রহীয়তে। হিমবান্ বিংশভাগেন তস্মাদেব প্রহীয়তে। অশীতি হিমবান্ শৈল আয়াতঃ পূর্ব্বপশ্চিমে। নীলঃ শ্বেতশ্চ

'সন্তি বিদ্যাধরাণাঞ্চ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
উদ্যানানি বিচিত্রাণি ভবনানি বহুনিচ ॥
তেষু বিদ্যাধর বরা বিদ্যাধর্য্যশ্চ কৌতুকাৎ।
বিহরন্তি সুখং যত্রবায়ুর্বহতি গন্ধবান ॥
সুগন্ধি পুষ্প সম্ভূতান্ গন্ধানাদায় সর্ব্বতঃ।
দেবাদৈত্যাদানবাশ্চ কদাচিদ্ যান্তিতত্রবৈ ॥'

উপরি উদ্ধৃত সংস্কৃত পদগুলি এত সরল যে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পাঠক বৃন্দের ও সহজে মর্ম্ম গ্রাহ্য হইবে, এই বিশ্বাসে আমরা বাঙ্গলায় অনুবাদ করিলাম না। এবং বর্ত্তমান শ্রেণীর প্রবন্ধ দীর্ঘ হইলে অনেক পাঠকের নিকটই নীরস বোধ হয়। অতএব এস্থলেই প্রথম প্রস্তাবের উপসংহার করিলাম। শ্রীজঃ—

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। "মনোরঞ্জন-স্বপ্ন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দ্বারা প্রণীত ও প্রকাশিত।" গ্রন্থকার এই মনোরঞ্জন-স্বপ্নে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের মূল সত্য এবং সমাজ-রহস্য ও ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি বহুবিষয়ের মূল তত্ত্ব দিব্যচক্ষে দর্শন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন,—কিন্তু তিনি যেরূপ দেখিতে পাইয়াছেন, সেইরূপ দেখাইতে পারেন নাই। তিনি শেষ দেখিয়াছেন এই,—" নিরাকার নির্ব্বিকার পদার্থ ভাবিতে চেষ্টা করিয়া তাহাতে অপারগ হইলে মন যেমন নীচকার্য্যে রত হয়, দেবদেবীর চিন্তা করিলে মন তেমন হয় না। **** অতএব ভক্তির উদয় হইলে যে সাকার মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা হয়, তাহার আর সন্দেহ নাই। ভক্তিসেবক ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মারা অনাদি, অনন্ত ও অসীম পদার্থকে কল্পনাবাঞ্ছিত বিদ্যাবিভূষিত সীমাবিশিষ্ট মনে ও পরিমিতবুদ্ধিতে ধ্যান বা ধারণা করা অসম্ভব বিধায় সৃষ্টি স্থিতি লয় দর্শন দ্বারা ঈশ্বরের তিন গুণের উদ্রেক করতঃ তাঁহার প্রতিরূপস্বরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ও তাঁহাদিগ হইতে অপর দেবদেবী কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে দৃঢ়ভক্তি করিবার সূক্ষ্ম ও সুচারুপথ প্রদর্শন করিয়াছেন।"

এই উদ্ধৃত অংশের শেষভাগটি পড়িবার সময় ইহাকে আদালতের রোবকারি কিংবা পুলিসের রিপোর্ট বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। কারণ প্রচলিত বাঙ্গালায় একই বাক্যে করিয়া করতঃ, হইয়া হওতঃ ইত্যাদিরূপ অনন্তকোটী অসমাপিকা ক্রিয়া এইক্ষণ আর স্থান পায় না, এবং বিধায় প্রভৃতি অর্থশূন্য শব্দও ব্যবহৃত হয় না। রিপোর্ট ও রোবকারিতেই এইরূপ ক্রিয়াপদবৈচিত্র ও বিধায় প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হইয়া

থাকে। উদ্ধৃত অংশে কম্পনাবাঞ্ছিত পদটি কি অর্থে কাহার বিশেষণ তাহা আমাদিগের বুদ্ধিগম্য হইল না। আমরা অবশ্য এজন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়াছি। কেন না, যাহা বুঝি না, তাহার সমালোচনা করা অনুচিত।

২। "সুরবালা—সুরবালা। স্বর্গীয়া স্বর্ণলতা বিরচিত। হরিনাভি সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে প্রকাশিত।" গ্রন্থকর্ত্রী যখন জীবিত নাই, তখন আমরা নিন্দা করিলেও তাহা তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না, প্রশংসা করিলেও সে প্রশংসায় তিনি পুলকিত হইবেন না। সুতরাং আমরা তাঁহাকে আর কি বলিব? তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে এইমাত্র বলিতাম যে, নাটক কাহাকে বলে তাহা না বুঝিয়া থাকিলেও তিনি সুললিত পদ্য রচনায় নিপুণ। অর্দ্ধশিক্ষিত বালিকার পক্ষে ইহাই বিস্তর প্রশংসা।

৩। "আর্য্য-সংগীত।" এখানি কে আমাদিগকে উপহার দিলেন, ত[illegible] না। ক[illegible] গ্রন্থকার তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই। কবিতাটি পড়িয়া বোধ হইল, হেমবাবুর কবিতাবলী সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। তবে কথা এই, অন্যদীয় কবিতার পদাবলী যেরূপ কণ্ঠস্থ হয়, রস ও মাধুর্য্য সেইরূপ সহজে হৃদ্গত হয় না।

৪। "নিষ্ফলতরু। কোন্নগর নিবাসিনী শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী বিরচিত। শ্রীভুবনমোহন ঘোষকর্ত্তৃক প্রকাশিত।"—পূর্ণিমার শশী, প্রিয়তমের প্রতি, বিধবার স্বপ্ন এবং বসন্তসমাগম প্রভৃতি কতিপয় গদ্য ও পদ্য রচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি গ্রথিত, গ্রন্থকর্ত্রী বর্ত্তমান কালের নভেল নাটকীয় বাঙ্গালায় মন্দ শিক্ষিত নহেন। তিনি শব্দের সহিত শব্দ গাঁথিবার কৌশল যেরূপ শিখিয়াছেন, যদি সেইরূপ গাঢ় শিক্ষা পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার লেখা এইরূপ এলান এলান এবং অনেক স্থলেই অর্থশূন্য ও উদ্দেশ্য শূন্য না হইয়া,—যে সকল কথা ইদানীং সকলেই সকল পুস্তকে পড়িতে পান, শুধু তাহাতেই পরিপূর্ণ না রহিয়া, অধিকতর পাঠযোগ্য হ[illegible] ইত। তিনি পিঞ্জর রুদ্ধ সারিকার [illegible] পরের কথা না কহিয়া নিজের কথা কহিলে, শুনিবার জন্য লোকের অধিকতর আগ্রহ জন্মিত; এবং লোকে বঙ্গীয় কুলবালাদিগের শিক্ষার পরিমাণ বুঝিতে পাইত। এই পুস্তক সেই সকল আশার সাফল্য বিষয়ে,—"নিষ্ফল তরু।"

৫। "প্রণয়পাগল, প্রথমখণ্ড। শ্রীরজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।"—রচনার নমুনা,—

"কামিনি।
পাগল করিলি আমারে
এমন সৌরভ মধু কে দিল তোমারে?
একটু নয়নান্তর হইলে অমনি
কেন পাগলিনী তুমি হয়ে সুবদনি!
মধুগন্ধ আবাহনে ডাক বারে বারে
পাগল করিলি আমারে।"

পূর্ব্ব বাঙ্গালার কতিপয় ভূস্বামী এই গ্রন্থের মুদ্রণ সাহায্য করিয়াছেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া পরিচিত এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইহা উপহার লইয়াছেন। সকলেরই রুচি পরিমার্জ্জিত!!

৬। "মেয়েলী অর্থাৎ বঙ্গীয় কামিনী-দিগের ব্যবহৃত গার্হস্থ্য শ্লোক ও পদাবলী। প্রথম ভাগ। শ্রীললিতমোহন রায় কর্তৃক সংকলিত।" এই গ্রন্থ হইতে দুই চারিটি মেয়েলী কথা পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কড়ি দিয়া কিন্‌ব দই।
গোয়ালিনী আমার কিসের সই॥"
"জামাইর বড় কোচার ফের।
ছয়বুড়ি কড়ি সুতার সের॥"
"মাসিমার আদরে।
পরাণ আমাব বিদরে॥"
"যদি থাকে নছিবে।
আপনে আপনে আসিবে॥"

ইহার মধ্যে কতকগুলি উক্তি নিতান্ত অশ্লীল, ও অশ্রাব্য। নিতান্ত জঘন্য জাতীয় স্ত্রীলোক কি পুরুষের মুখে ভিন্ন এরূপ কথা প্রায় কোথাও শুনা যায় না। সংগ্রহকার তাঁহার ২৩৮, ২৩৯ প্রভৃতি নম্বরের উক্তি কোন্ শ্রেণি মেয়েদের মুখে শুনিয়াছেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। অন্য কতকগুলি নিতান্ত গ্রাম্য ও বীভৎস, যথা ৮৮নম্বর। আর এক কথা এই, যে কথায় যৌটক অথবা মেল আছে, তাহাই যে মেয়েলী ইহা তাঁহাকে কে বলিয়াছে। এই গ্রন্থ ময়মনসিংহের এক অতি প্রধান ভূম্যধিকারীকে উৎসর্গ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ উৎসর্গ দেওয়া বঙ্গদেশ ভিন্ন পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি প্রচলিত আছে কি না, তাহা আমরা জানি না। উৎসর্গ পত্রের প্রথমেই লেখা আছে,—"আর্য্য! মেয়েলী চিরদিনই আপনার নিকট আদরের জিনিস।" বাঙ্গালি গ্রন্থকার বঙ্গীয় ভূস্বামীকে ইহা না কহিয়া আর কি কহিবে? কিন্তু যাঁহাকে এই গ্রন্থ উপহার দেওয়া হইয়াছে, তিনি উচ্চতর বিষয়ে অনুরাগী বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত।

৭। "বিজনসংগীত। কাব্য, শ্রীযদুনাথ পালিত কর্তৃক প্রণীত।" এখানি সম্প্রতি মুদ্রিত না হইলেই ভাল ছিল। বঙ্গদেশের অনেক বুদ্ধিমান যুবা—জানিনা কি এক প্রলোভনে পড়িয়া, শিক্ষার সময়কে গ্রন্থ রচনায় ব্যয়িত করিতেছেন। সময়ের এইরূপ অপব্যবহার সমাজের অনিষ্টকর। যশঃস্পৃহার অঙ্কুশতাড়না অবশ্যই অনেকের পক্ষে অসহ্য, কিন্তু যাঁহাদিগের সহিষ্ণুতা নাই, তাঁহারা জগতে প্রায়শঃই যশস্বী হন না। বিজনসংগীত রচয়িতাও যদি আর দশ বৎসরকাল অপেক্ষা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত উপকার হইত।

জীবনপ্রভাত।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ঈশানী-মন্দীর।

" ————————— ফেলিলা অদূরে
সরোবর, কূলে তার চণ্ডীর দেউল।"
মধুসূদন দত্ত।

পরাক্রান্ত জায়গীরদার ও জুমলাদার চন্দ্ররাওয়ের বাটী হইতে কএক ক্রোশ দূরে ঈশানীর একটি মন্দির ছিল। অনতি-উচ্চ একটি পর্ব্বত-শৃঙ্গে সেই মন্দির অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দির-সম্মুখে প্রস্তররাশি সোপানরূপে খোদিত ছিল, নীচে একটি পর্ব্বততরঙ্গিণী কুল্ কুল্ শব্দ করিয়া সেই সোপানের পদ প্রক্ষালন করিয়া বহিয়া যাইত। পুরাকাল অবধি অসংখ্য যাত্রী ও উপাসক এই পুণ্য-নদীতে স্নান করিয়া সোপান আরোহণ করিয়া ঈশানীর পূজা দিত, অদ্য পর্য্যন্ত মন্দিরের গৌরব বা যাত্রীসংখ্যা হ্রাস হয় নাই। মন্দিরের পশ্চাতে, পর্ব্বতের পৃষ্ঠ-দেশ বহু পুরাতন বৃক্ষ দ্বারা আবৃত, চূড়া হইতে নীচে সমতল ভূমি পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষশ্রেণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইত না। দিবাযোগেও সেই বিশাল বৃক্ষ-শ্রেণী ঈষৎ অন্ধকার করিত, সেই সুস্নিগ্ধ ছায়াতে ঈশানী-মন্দিরের পূজক ও ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কুটীরে বাস করিত। সেই পুণ্য সুস্নিগ্ধ স্থান দেখিলেই বোধ হয় যেন তথায় শান্তিরস ভিন্ন অন্য কোন ভাবের উদ্রেক হয় নাই, ভারতবর্ষের পবিত্র পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শব্দ সেই পুরাতন পাদপ-বৃন্দ শ্রবণ করে নাই। বহু যুদ্ধ, অসংখ্য হত্যাকাণ্ডে মহারাষ্ট্রদেশ ব্যতিব্যস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইতেছিল, কিন্তু হিন্দু কি মুসলমান কেহই এই ক্ষুদ্র শান্ত পর্ব্বতমন্দির আহবের ভীষণ স্বরে কলুষিত করেন নাই।

রজনী এক প্রহরের সময় একজন পথিক একাকী সেই শান্ত কাননের মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন। পথিকের হৃদয় কি উদ্বেগ-পরিপূর্ণ! প্রশস্ত ললাট কুঞ্চিত, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ, নয়ন হইতে উন্মত্ততার অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছিল। পথিক ক্ষণেক দ্রুতবেগে এদিক ওদিক পদচারণ করিতেছিলেন, ক্ষণেক বা স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রোষে ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিতেছিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। রোষে, জিঘাংসায়, বিষাদে, অদ্য রঘুনাথের হৃদয় একেবারে দগ্ধ করিতেছিলেন।

অনেকক্ষণ পদচারণ করিতে লাগিলেন, শরীর একেবারে অবসন্ন হইয়াছে, তথাপি হৃদয়ের উদ্বেগ নিবারণ হয় না, শ্রান্তিবশতঃ কখন পাদপে ভর দিয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করেন, পুনরায় নূতন চিন্তায় উত্তেজিত হইয়া শ্রান্তি বিস্মৃত হয়েন, পুনরায় শীঘ্র বেগে পদচারণ করেন। রঘুনাথ উন্মত্তপ্রায়। এ ভীষণ চিন্তার আশু উপশম না হইলে রঘুনাথের বিবেচনাশক্তি বিচলিত বা লুপ্ত হইবে! প্রকৃতি ভীষণ চিকিৎসক! এই বিষম সংসারে শেলসম যে দুঃখ হৃদয় বিদীর্ণ করে, অগ্নিসম যে চিন্তা শরীর শোষণ ও দাহ করে, যে মানসিক রোগের ঔষধ নাই, চিকিৎসা নাই, প্রকৃতি চিন্তাশক্তি লোপ করিয়া তাহার উপশম করে। উন্মত্ততাই কত শত হতভাগার আরোগ্য। কত সহস্র হতভাগা এই আরোগ্য দিবানিশি প্রার্থনা করে, কিন্তু প্রাপ্ত হয় না।

শরীর অবসন্ন হইল, রঘুনাথ অগত্যা একটি পাদপতলে উপবেশন করিলেন,—নিশ্চেষ্টভাবে বৃক্ষে ভর দিয়া উপবেশন করিলেন।

সেই পাদপের অনতিদূরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পুরাণপাঠ করিতেছিলেন। আহা! সেই সঙ্গীতপূর্ণ পুণ্যকথা যেন শান্ত নিশীথে শান্ত কাননে অমৃত বর্ষণ করিতেছিল, নক্ষত্র-বিভূষিত নৈশ গগণ-মণ্ডলে ধীরে ধীরে উত্থিত হইতেছিল। এখনও কাশী বা মথুরার পুরাতন মন্দিরে সূর্য্যোদয়ে বা সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে সহস্র ব্রাহ্মণে সেই অনন্ত পুরাণ কথা বা বেদমন্ত্র পাঠ করেন; যখন সেই পুণ্যধামে বহুদেশের বহুযাত্রীর সমাগম দেখি, সনাতন মন্দিরে সনাতন-ধর্ম্মের গৌরব দেখি, সায়ংকালের আরতিশব্দ বা শত মন্দিরের ঘণ্টা ও শঙ্খরব গগনে যুগপৎ উত্থিত হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে উপবেশন করিয়া গম্ভীরস্বরে বেদপাঠ বা পুরাণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তখন আমি নৈশকাল বিস্মৃত হই, আধুনিক সময় ও আধুনিক জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল বিস্মৃত হই, হৃদয়ে নানা স্বপ্নের উদয় হয়, বোধ হয়, যেন সেই প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বাস করিতেছি, চারিদিকে সেই পুরাকালের লোক, পুরাকালের সমাজ ও সভ্যতা, পুরাকালের শান্তি ও সুস্নিগ্ধতা।

সেই সমস্ত মহৎ কথা,—পুণ্যকথা; শাস্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণমুখোচ্চারিত হইয়া সেই শান্ত নৈশ কাননে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অচেতন পাদপকেও যেন সচেতন করিতে লাগিল, শাখাপত্র যেন সেই গীত কুতূহলে পান করিতে লাগিল, বায়ু সেই গীত বিস্তার করিতে লাগিল, মানবহৃদয় কখন বা প্রফুল্লিত, কখন বা উৎসাহিত, কখন বা গলিত হইতে লাগিল।

কত সহস্র বৎসর হইতে এই পুণ্যকথা ভারতবর্ষে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে! সুন্দর বঙ্গদেশে, তুষারপূর্ণ কৈলাসবেষ্টিত দূর কাশ্মীরে, বীরপ্রসূ রাজ-

স্থান ও মহারাষ্ট্রভূমিতে সাগরপ্রক্ষালিত কর্ণাট ও দ্রাবিড়ে, সহস্র বৎসর অবধি এই গীত ধ্বনিত হইতেছে। যেন চিরকালই এই গীত ধ্বনিত হয়, আমরা যেন এ শিক্ষা কখন বিস্মৃত না হই। গৌরবের দিনে এই অনন্ত গীতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল, ও অযোধ্যা, মিথিলা, হস্তিনা, মগধ, উজ্জয়িনী, দিল্লী প্রভৃতি দেশ বীরত্বে ও যশে প্লাবিত করিয়াছিল। দুর্দিনে এই গীত গাইয়া সমরসিংহ, সংগ্রামসিংহ, প্রতাপসিংহ, হৃদয়ের শোণিত দিয়াছিলেন, এই মহামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া শিবজী পুনরায় পুরাকালের গৌরব সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। অদ্য ক্ষীণ দুর্ব্বল হিন্দুদিগের আশ্বাসের স্থল, ক্রন্দনের স্থল, এই পূর্ব্ব গীত মাত্র, যেন বিপদে, বিষাদে, দুর্ব্বলতায় আমরা পূর্ব্বকথা না বিস্মৃত হই, যতদিন জীবন থাকে যেন হৃদয় যন্ত্র এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হইতে থাকে!

নব্য পাঠক। তুমি ইলিয়দ পাঠ করিয়াছ, দান্তে, সেক্সপীয়র, মিল্টন পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতম আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্ম চার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কথা! দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পতি-ভক্তিকথা! এই কথা হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে,—এ কথা যেন হিন্দুজাতি কখন বিস্মৃত না হয়!

পাঠক। একত্র বসিয়া এক এক বার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক সময়ের রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে,—নচেৎ পুস্তক দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

শান্ত কাননে পবিত্র পুরাণকথা ও সঙ্গীত রঘুনাথের তপ্ত ললাটে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল। উদ্বিগ্নহৃদয় শান্তি সেচন করিতে লাগিল। হতভাগার উন্মত্ততা ক্রমে হ্রাস পাইল, সেই মহৎ কথার নিকট আপনার শোক ও দুঃখ কি অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল! আপনার মহৎ উদ্দেশ্য ও বীরত্ব কি ক্ষুদ্র বোধ হইল। ক্রমে চিন্তাহারিণী নিদ্রা রঘুনাথকে অঙ্কেগ্রহণ করিলেন। রঘুনাথের শ্রান্ত অবসন্ন শরীর সেই বৃক্ষমূলে শয়িত হইল।

রঘুনাথ স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। আজি কিসের স্বপ্ন? আজি কি গৌরবের স্বপ্ন দেখিতেছেন, দিন দিন পদোন্নতি, দিন দিন বিক্রম ও যশোবিস্তারের স্বপ্ন দেখিতেছেন? হায়। রঘুনাথের জীবনের সে স্বপ্ন ভগ্ন হইয়াছে, সে চিন্তা শেষ হইয়াছে, মরীচিকা-পূর্ণ সংসারের সে একটি মরীচিকা বিলুপ্ত হইয়াছে।

রঘুনাথ কি যুদ্ধক্ষেত্রের স্বপ্ন দেখি-

তেছেন? শত্রুকে বিনাশ করিতেছেন, দুর্গ জয় করিতেছেন, যোদ্ধার কার্য্য করিতেছেন, সেই স্বপ্ন দেখিতেছেন? রঘুনাথের সে উদ্যম শেষ হইয়াছে, সে স্বপ্নও বিলুপ্ত হইয়াছে।

একে একে যৌবনের উদ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে, আশাদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, এই অন্ধকার রজনীতে শান্ত বন্ধুহীন যুবকের হৃদয়ে বহু দিনের কথা পূর্ব্ব জীবনের স্মৃতির ন্যায় জাগরিত হইতেছে; শোকভারে হৃদয় আক্রান্ত হইলে, আশা, সুখ, গৌরব আমাদের নিকট বিদায় লইলে, বন্ধুহীন জনের যে কথা স্মরণ হয়, রঘুনাথ সেই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। স্নেহময়ী মাতার স্নেহসিক্ত মুখখানি মনে জাগরিত হইল, পিতার দীর্ঘ অবয়ব ও প্রশস্ত ললাট মনে হইল, বাল্যকালে সেই দূর মাড়ওয়ারে ক্রীড়া করিতেন, হাস্যধ্বনিতে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেন, সেই কথা স্মরণ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকালের সহচরী, শান্ত, ধীর, প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মীকে মনে পড়িল; আহা সে স্নেহময়ী ভগিনীকে কি আর এ জীবনে দেখিতে পাইবেন? আজি সে সোণার সংসার কোথায়, সে প্রফুল্ল আশালহরী কোথায়, এই শোকের দিনে, সন্তাপের দিনে, যাহার সান্ত্বনা বাক্যে প্রাণ জুড়াইবে, এরূপ হৃদয়ের সহোদরা কোথায়? নিদ্রিতের মুদিত নয়ন হইতে একবিন্দু অশ্রু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িল।

নিদ্রিত রঘুনাথ সেই স্নেহময়ীর মুখখানি চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলিত করিলেন। কি দেখিলেন? বোধ হইল যেন লক্ষ্মী স্বয়ং ভ্রাতার শিরোদেশ আপন অঙ্কে স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, কোমল শীতল হস্ত ভ্রাতার উষ্ণ ললাটে স্থাপন করিয়া হৃদয়ের উদ্বেগ দূর করিতেছেন, সহোদরার স্নেহ-পূর্ণ নয়নে যেন সহোদরের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন। আহা! বোধ হইল যেন শোকে বা চিন্তায়, লক্ষ্মীর প্রফুল্ল মুখখানি শুষ্ক হইয়াছে, নয়ন দুইটী সেইরূপ স্থির, প্রশস্ত, স্নিগ্ধ, কিন্তু শোকের আবাসস্থান।

রঘুনাথ নয়ন মুদ্রিত করিলেন, আর এক বিন্দু অশ্রুবর্ষণ করিলেন,—বলিলেন 'ভগবন্ অনেক সহ্য করিয়াছি, কেন বৃথা আশায় হৃদয় ব্যথিত করিতেছ?'—

যেন কোমল হস্তে রঘুনাথের অশ্রুবিন্দু বিমুক্ত হইল! রঘুনাথ পুনরায় নয়ন উন্মিলিত করিলেন, এ স্বপ্ন নহে,—তাঁহার প্রাণের সহোদরাই তাঁহার মস্তক অঙ্কে ধারণ করিয়া সেই বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়াছেন!

উঃ! রঘুনাথের হৃদয় আলোড়িত হইল; তিনি লক্ষ্মীর হাত দুইটি আপন তপ্ত হৃদয়ে স্থাপন করিয়া সেই স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে চাহিলেন;—তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, নয়ন হইতে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল, অবশেষে আর সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার শব্দ করিয়া

রোদন করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'লক্ষ্মী! লক্ষ্মী! তোমাকে কি এ জীবনে আবার দেখিতে পাইলাম? অন্য সুখ দূর হউক, অন্য আশা দূর হউক, লক্ষ্মী তোমার হতভাগা ভ্রাতাকে নিকটে স্থান দিও, সে এজীবনে আর কিছু চাহে না।' লক্ষ্মী ও শোক সম্বরণ করিতে পারিলেন না, ভ্রাতার হৃদয়ে আপন মুখ লুকাইয়া একবার প্রাণভরে কাঁদিলেন। আহা! এ ক্রন্দনে যে সুখ, জগতে কি রত্ন আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে যাহা অভাগাগণ সে সুখের নিকট তুচ্ছজ্ঞান না করে?

পরস্পরকে বহুদিন পর পাইয়া পরস্পরে অনেকক্ষণ বাক্‌শূন্য হইয়া রহিলেন। বহুদিনের কথা, বাল্যকালের কথা রহিয়া রহিয়া হৃদয়ে জাগরিত হইতে লাগিল, সুখের লহরীর সহিত শোকের লহরী মিশ্রিত হইয়া হৃদয় উচ্ছলিতে লাগিল; থাকিয়া থাকিয়া দরবিগলিত ধারায় উভয়ের হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ভগিনীর ন্যায় এজগতে আর স্নেহময়ী কে আছে, ভ্রাতৃস্নেহের ন্যায় আর পবিত্র স্নেহ কি আছে? আমরা সে ভালবাসা বর্ণন করিতে অশক্ত, সহৃদয় পাঠক রঘুনাথ ও লক্ষ্মীর মনের ভাব অনুভব করুন।

অনেকক্ষণ পরে দুইজনের হৃদয় শীতল হইল; তখন লক্ষ্মী আপন অঞ্চল দিয়া ভ্রাতার নয়নের জল মোচন করিয়া বলিলেন, 'ঈশানীর ইচ্ছায় কত অনুসন্ধানের পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম, আহা, আজ আমার কি পরম সুখ; দুঃখিনীর কপালে কি এত সুখ ছিল!' ক্ষণেক পর আপন অশ্রুবিন্দু বিমোচন করিয়া বলিলেন, 'ভাই, এই শীতল বাতাসে আর থাকিলে তোমার অসুখ হইবে, চল মন্দিরের ভিতর যাই; আমি আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না।' উভয়ে গাত্রোত্থান করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

ভ্রাতা ভগিনী মন্দির-অভ্যন্তরে আসিলেন, লক্ষ্মী একটি স্তম্ভের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, শ্রান্ত রঘুনাথ পূর্ব্ববৎ লক্ষ্মীর অঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া শয়ন করিলেন, মৃদুস্বরে উভয়ে গভীর অন্ধকার রজনীতে পূর্ব্ব কথা কহিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে ভ্রাতার ললাটে ও দেহে হস্ত বুলাইয়া লক্ষ্মী কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ তাহার উত্তর করিতে লাগিলেন। দস্যু-হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া অনাথ বালক কোন কোন্ দেশে বিচরণ করিয়াছিলেন, কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন। কখন মহারাষ্ট্রীয় কৃষকদিগের সহিত চাষ করিতেন, কখন গো বৎস বা মেষপাল রক্ষা করিতেন, মেষের সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে, উপত্যকায়, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতেন বা নির্জ্জনে বসিয়া চরণদিগের গীত গাইতেন। কখন সায়ংকালে নদীকূলে এ-

কাকী বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই গীত গাইয়া হৃদয়কে শান্ত করিয়াছেন, কখন প্রত্যূষে অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বকথা স্মরণে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছেন। পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণ প্রদেশে কএক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছেন, একজন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিকের অধীনে কার্য্য করিতেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কখন কখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ-ব্যবসায়ে উৎসাহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, অবশেষে মহানুভব শিবজীর নিকট উপস্থিত হইয়া সৈনিকের পদ গ্রহণ করেন। আজি তিন বৎসর হইল সেই কার্য্য করিয়াছেন, জগদীশ্বর জানেন তিনি কার্য্যে ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু সেই চন্দ্ররাওয়ের ষড়যন্ত্রে অদ্য অপমানিত হইয়া দেশে দেশে নিরাশ্রয়রূপে ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে জীবনে তাঁহার উদ্দেশ্য মাত্র নাই, পিতার ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া এ অসার জগৎ পরিত্যাগ করিবেন।

ভ্রাতার দুঃখ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্নেহময়ী ভগিনী নিঃশব্দে অবারিত অশ্রু বর্ষণ করিতেছিলেন; তিনি নিজের শোক সহ্য করিতে পারেন, ভ্রাতার দুঃখে একেবারে ব্যাকুল হইলেন। যখন সে কথা শেষ হইল কথঞ্চিৎ শোক সম্বরণ করিয়া আপনার কি পরিচয় দিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চন্দ্ররাওয়ের উপর ভ্রাতার যে বিজাতীয় ক্রোধ তাহা তিনি বুঝিলেন, চন্দ্ররাওয়ের স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিলে ভ্রাতার হৃদয়ে কি কষ্ট হইবে, তাহাও বুঝিলেন। ধীরে ধীরে অশ্রুজল মোচন করিয়া বলিলেন;—

"মহারাষ্ট্রদেশে আসিবার অনতি পরেই একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্র জায়গীরদার তাঁহাকে বিবাহ করেন। নারী স্বামীর নাম করে না, কিন্তু গগনের শশধরের নামই তাঁহার স্বামীর নাম, গগনের শশধরের ন্যায় তাঁহার ক্ষমতা ও গৌরবজ্যোতি চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার বিপুল সংসারে লক্ষ্মী সুখে আছেন, প্রভুও দাসীর উপর অনুগ্রহ করেন, সে অনুগ্রহে দাসী সুখে আছেন। এ জীবনে তাঁহার আর কোন বাসনা নাই, কেবল প্রাণের ভ্রাতাকে সুখে থাকিতে দেখিলেই তাঁহার জীবন সার্থক হয়।

রঘুনাথের সংবাদ তিনি মধ্যে মধ্যে পাইতেন, তাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্য সেই কামনায় মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়াছিলেন, সহসা মন্দির পার্শ্বে বৃক্ষমূলে প্রাণের ভ্রাতাকে পুনরায় পাইলেন।

এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া লক্ষ্মী ভ্রাতার হৃদয়ে শেলসম দুঃখ উৎপাটন করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী দুঃখিনী, দুঃখের ব্যথা জানিতেন। লক্ষ্মী নারী, দুঃখ সান্ত্বনা করিতে জানিতেন। সহিষ্ণু হইয়া নিজ দুঃখ সহ্য করা ও সান্ত্বনা দিয়া পরের দুঃখ দূর করাই নারীর ধর্ম্ম।

অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্য দিয়া ভ্রা-

তার মন শান্ত করিতে লাগিলেন। বলিলেন আমাদিগের জীবনই এইরূপ, সকল দিন সমান থাকেনা। ভগবান্ যেসুখ দেন তাহা আমরা ভোগ করি, যদি একদিন দুঃখ পাই তাহা কি সহ্য করিতে বিমুখ হইব? মানব জন্মই দুঃখময়, যদি আমরা দুঃখ সহ্য না করিব তবে কে করিবে? সুদিন দুর্দ্দিন সকলেরই আছে,—দুর্দ্দিনে যেন আমরা সেই বিধাতার নাম লইয়া নিজ শোক বিস্মৃত হই। তিনিই একদিন পিত্রালয়ে আমাদের সুখ দিয়াছিলেন, তিনিই অদ্য কষ্ট দিয়াছেন, তিনিই পুনরায় সে কষ্ট মোচন করিবেন।

লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

'ভাই! এ নৈরাশ দূর কর; একপ অবস্থায় থাকিলে শরীর কত দিন থাকিবে? আহার নিদ্রা ত্যাগ করিলে মনুষ্য-জীবন কত দিন থাকে?'

রঘুনাথ। 'থাকিবার আবশ্যক কি? যে দিন বিদ্রোহী বলিয়া সৈনিকের নামে কলঙ্ক পড়িল, সেই দিন সৈনিকের জীবন গেল না কি জন্য?'

লক্ষ্মী। 'তোমার ভগ্নী লক্ষ্মীকে চিরদুঃখিনী করিবে এই কি ইচ্ছা? দেখ ভাই আমার আর এ জগতে কে আছে? পিতা নাই, মাতা নাই, জগৎ সংসারে কেহ নাই। তুমিও কি দুঃখিনী লক্ষ্মীর প্রতি সমস্ত মমতা ভুলিলে? বিধাতা কি এ হতভাগিনীর উপর একেবারে বিমুখ হইলেন?' লক্ষ্মীর নয়ন হইতে ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুনাথ ক্রুদ্ধ হইয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া বলিলেন, 'লক্ষ্মী! তুমি আমাকে ভাল বাস, তাহা জানি, তোমাকে যে দিন কষ্ট দিব সে দিন যেন ঈশ্বর আমার প্রতি বিমুখ হন। কিন্তু ভগিনি! এ জীবনে আর আমার সুখ নাই,—তুমি স্ত্রীলোক, সৈনিকের শোক বুঝিবে কিরূপে, জীবন অপেক্ষা আমাদিগের সুনাম প্রিয়, মৃত্যু অপেক্ষা কলঙ্ক ও অপযশ সহস্রগুণে কন্টকর। সেই কলঙ্কে রঘুনাথের নাম কলুষিত হইয়াছে।'

লক্ষ্মী। 'তবে সেই কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় কেন বিমুখ হও? মহানুভব শিবজীর নিকটে যাও, তাঁহার ক্রোধ দূর হইলে তিনি অবশ্যই তোমার কথা শুনিবেন, তোমার দোষ নাই, বুঝিবেন।'

রঘুনাথ উত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধিমতী লক্ষ্মী বুঝিলেন পিতার অভিমান, পিতার দর্প, পুত্রে বর্ত্তমান। তিনি প্রাণ থাকিতে অন্যায়াচারীর নিকট আবেদন করিবেন না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ভ্রাতার অন্তরের ভাব বুঝিয়া সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন, 'মার্জ্জনা কর, আমি স্ত্রীলোক, সমস্ত বুঝি না। কিন্তু যদি শিবজীর নিকট যাইতে অস্বীকার কর, কার্য্যদ্বারা কেন আপন যশ রক্ষা কর না?

পিতা বলিতেন সেনার সাহস ও প্রভু-ভক্তি সমস্ত কার্য্যে প্রকাশ হয়, যদি বিদ্রোহী বলিয়া তোমাকে কেহ সন্দেহ করিয়া থাকে, অসিহস্তে কেন সে সন্দেহ খণ্ডন কর না ? '

উৎসাহে রঘুনাথের নয়ন ধক্ ধক্ করিতে লাগিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ' কিরূপে ? '

লক্ষ্মী। ' শুনিয়াছি শিবজী দিল্লী যাইতেছেন, তথায় সহস্র ঘটনা ঘটিতে পারে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সৈনিকের আত্মপরিচয় দিবার সহস্র উপায় থাকিতে পারে। আমি স্ত্রীলোক, আমি কি জানিব, বল ? কিন্তু তোমার পিতার ন্যায় সাহস, তাঁহারই ন্যায় বীরত্ব-প্রতিজ্ঞা করিলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য না সফল হইতে পারে ? '

রঘুনাথের যদি অন্য চিন্তার সময় থাকিত তবে বুঝিতেন কনিষ্ঠা লক্ষ্মী মানব-হৃদয়-শাস্ত্রে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহেন ; যে ঔষধি আজি রঘুনাথের হৃদয়ে ঢালিয়াছিলেন, তাহাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে শোকসন্তাপ দূর হইল, সৈনিকের হৃদয় পূর্ব্ববৎ উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল।

রঘুনাথ অনেকক্ষণ নিস্পন্দে চিন্তা করিলেন, তাঁহার নয়ন উল্লাসোৎফুল্ল,মুখ-মণ্ডল সহসা নব গৌরব ধারণ করিল। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন—

' লক্ষ্মী ! তুমি বালিকা, কিন্তু তোমার কথা শুনিতে শুনিতে আমার মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। আমার জীবন আর নিরুদ্দেশ্য নহে, আমার হৃদয় উৎসাহশূন্য নহে। ভগবান সহায় হউন, রঘুনাথজী বিদ্রোহী নহে, ভীরু নহে, একথা জগতে এখন প্রচার হইবে। কিন্তু তুমি বালিকা, তোমার নিকট এসমস্ত কহি কেন, তুমি আমার হৃদয়ের ভাব কি বুঝিবে ? '

লক্ষ্মী ঈষৎ হাসিলেন, ভাবিলেন ' রোগ নির্ণয় করিলাম আমি, ঔষধি দিলাম আমি, তথাপি কিছু বুঝি না ? ' প্রকাশ্যে বলিলেন, ' ভাই। তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইল। তোমার মহৎ উদ্দেশ্য আমি কিরূপে বুঝিব ? কিন্তু যাহাই হউক তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী যত দিন বাঁচিবে, তুমি পূর্ণমনোরথ হও, জগদীশ্বরের নিকট ইহাই প্রার্থনাকরিবে।'

রঘুনাথ। ' আর লক্ষ্মী। আমি যত দিন বাঁচিব, তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা কখন বিস্মৃত হইব না। '

অনেকক্ষণ পরে লক্ষ্মী অধোবদনে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

' আমার আর একটি কথা আছে, কিন্তু কহিতে ভয় হইতেছে।'

রঘু। 'লক্ষ্মী। আমার নিকট তোমার কি কথা বলিতে ভয় হয় ? আমি তোমার সহোদর, সহোদরের নিকট কি ভয় ?'

লক্ষ্মী। 'চন্দ্ররাও নামে একজন জুমলাদার বোধ হয় তোমার অপকার করিয়াছেন।'

রঘুনাথের হাস্য দূর হইল, রোষে জি-

ঘাংসায় ওষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপন করিলেন। বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না ।

কম্পিতস্বরে দুঃখিনী লক্ষ্মী বলিলেন, 'জিঘাংসা মহল্লোকের অনুচিত। ভাই, অঙ্গীকার কর তাঁহার অনিষ্ট করিবে না।'

রঘুনাথ কর্কশ ভাবে বলিলেন—

'তিনি যদি আমার সহোদর ভ্রাতা হইতেন তথাপি কপটাচারীকে মার্জ্জনা করিতাম না,—এই অসি দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিব। সে পামরের নাম করিয়া কেন তোমার পবিত্র মুখ কলুষিত করিতেছ ?'

লক্ষ্মী স্বভাবতঃ স্থিরপ্রকৃতি, শান্তা, ও বুদ্ধিমতী,কিন্তু স্বামীনিন্দা সহ্য করিতে পারিলেননা। সজল নয়নে সরোষে বলিলেন।

'ভ্রাতার নিকট পূর্ব্বে কখনও আমি কোন ভিক্ষা করি নাই ; একটি কথা বলিলাম তাহা রাখিলে না ; আমি পাপীয়সী, আমরা সকলে পামর, বিদায় দাও, আর জন্মের মত ভগিনীকে দেখিতে পাইবে না।'

সস্নেহে, সজলনয়নে রঘুনাথ বলিলেন,

'লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী ! তোমাকে কবে আমি মন্দ কথা বলিয়াছি ? চন্দ্ররাওকে আমি মার্জ্জনা করিতে পারি না, কেন সে ভিক্ষা করিতেছ ?'

লক্ষ্মী ঝর্ ঝর্ করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিলেন,—'অনাথা ভগিনীর প্রতি কত ভালবাসা আছে তাহাই জানিবার জন্য। ভাই ! তাহা জানিলাম। এক্ষণে বিদায় দাও, দুঃখিনীর অন্য ভিক্ষা নাই।'

রঘুনাথ সজলনয়নে অনেক ক্ষণ চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, 'লক্ষ্মী ! চন্দ্ররাওয়ের জন্য তুমি কেন যাচ্ঞা করিতেছ জানি না, তাহাকে কখনও মার্জ্জনা করিব মনে করি নাই, কিন্তু তোমার নিকট অদেয় আমার কিছু নাই। এই ঈশানী-মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিতেছি চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট করিব না। আমি তাহার দোষ মার্জ্জনা করিলাম—জগদীশ্বর তাহাকে মার্জ্জনা করুন।'

লক্ষ্মী হৃদয়ের সহিত বলিলেন 'জগদীশ্বর তাঁহাকে মার্জ্জনা করুন।'

পূর্ব্বদিকে প্রভাতের আলোকছটা দেখা যাইল। লক্ষ্মী তখন অনেক অশ্রুবর্ষণ করিয়া সস্নেহে ভ্রাতার নিকট বিদায় লইলেন, বলিলেন—'আমার সঙ্গে বাটীর অন্য লোক মন্দিরে আসিয়াছে এখনও সকলে নিদ্রিত আছে, এইক্ষণেই আমি না যাইলে জানিতে পারিবে। এখন চলিলাম, পরমেশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করুন।'

'পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন' এই বলিয়া সস্নেহে লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইয়া রঘুনাথও মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। লক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইলাম, পাঠক ! চল আমরা হতভাগিনী সরযুর নিকট বিদায় লইয়া আইসি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

"যাও যুদ্ধে, তোমা অদ্য করি অভিষেক,
* * * *
"যাও যশোবিমণ্ডিত হইয়া আবার
"এইরূপে আসি পুনঃ দাঁড়াও সাক্ষাতে।"
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণের দিন রঘুনাথের যাইতে কি জন্য বিলম্ব হইয়াছিল পাঠক অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। সে যুদ্ধ, সে আক্রমণ, অতিশয় সঙ্কটাপন্ন, রঘুনাথ জানিতেন। সঙ্কটের সময় পশ্চাতে থাকা রঘুনাথের অভ্যাস ছিল না, সুতরাং সে যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিবেন কি না, সন্দেহ। যুদ্ধে যাইবার পূর্ব্বে একবার প্রাণভরে হৃদয়ের সরযুকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন,—জীবনের মত একবার সরযূর নিকট বিদায় লইবেন।

সন্ধ্যার সময় ছাদে সরযূ বালা ভ্রমণ করিতেছিলেন,—ধীরে ধীরে পশ্চাতে আসিয়া রঘুনাথ ডাকিলেন 'সরযূ!'
সে শোকপূর্ণ স্বর শুনিয়া সরযু শিহরিয়া উঠিলেন, রঘুনাথের অশ্রু-আপ্লুত চক্ষু দুটী দেখিয়া ভীত হইলেন। উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে রঘুনাথের নিকটে আসিয়া দুই হস্তে রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—

'ছি রঘুনাথ! তোমার চক্ষুতে জল কেন? তোমার কোন কষ্ট হইয়াছে? আমার মাথা খাও, বল না, চক্ষের জল ফেলিতেছ কেন?' নিজের অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন,—কিন্তু অগত্যা আপনার চক্ষুতে জল আসিল।

রঘুনাথ যখন আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—'না সরযূ, কিছু নহে। তোমাকে যখন দেখি তখনই আমার হৃদয় পূর্ণ হয়, আমি কথা কহিতে পারি না। যে দিন প্রথমবার তোমাকে তোরণ-দুর্গে দেখিয়াছিলাম, সে দিন যেরূপ আমার শরীর হইতে প্রাণ তোমার দিকে ধাবিত হইয়াছিল,—এখন শতবার তোমাকে দেখিয়াছি, দিবানিশি তোমার মুখখানি মনে মনে দেখি,—এখনও প্রাণ সেইরূপ তোমার দিকে ধায় এখনও শরীর সেইরূপ অবসন্ন হয়। জগদীশ্বর। এমন পুণ্য কি করিয়াছি যে এ আনন্দময়ী পুষ্পকে হৃদয়ে ধারণ করিব!'

সরযূ কথা কহিতে পারিলেন না,—রঘুনাথের হস্তে, তাঁহার হস্ত সন্নিবেশিত ছিল, কেবল সেই হস্ত ঘর্ম্মাক্ত ও কম্পিত হইল, দেহযষ্টি বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল, কমনীয় লজ্জায় রঞ্জিত মুখমণ্ডল হেঁট করিলেন, সুখে চক্ষু দুটি জলে প্লাবিত হইল। উঃ! রঘুনাথের কথায় সরযূর হৃদয়ে যে আনন্দলহরী বহিতেছিল কে বর্ণনা করিতে পারে? জগতে কি আনন্দ আছে, স্বর্গে কি সুখ আছে, যে জন্য সরযূ সে মুহূর্ত্তের আনন্দ বিনিময় করিতে চাহেন?

দুই জনে ক্ষণেক পরস্পরের হস্তধারণ

করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন; শেষে রঘুনাথ বলিলেন—

'সরযূ! এখন বিদায় দাও।'

সহজ স্বরে এই কথাগুলি কহিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল,—সরযূ পুনরায় রঘুনাথের হৃদয়ের উদ্বেগ বুঝিতে পারিলেন। বলিলেন—

'রঘুনাথ, তোমার মনে কি কথা আছে আমাকে বলিতেছ না; তাহা না হইলে সন্ধ্যার সময় হঠাৎ আমাকে দেখিয়া চক্ষুর জল ফেলিলে কেন,—তাহা না হইলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াই বিদায় চাহিতেছ কেন? ছি ছি তুমি আমার নিকট মনের কথা লুকাইতেছ, রঘুনাথ। সরযূর মনে এমন কথা কি আছে যে তুমি না জান?'

রঘুনাথ অদ্য নিশীথের যুদ্ধকথা গোপন করিবেন বিবেচনা করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না, বলিলেন—

'না সরযূ, তোমার নিকট লুকাইবার রঘুনাথের কি আছে,—আজ,—আজ, আজ রাত্রিতে একটি সামান্য যুদ্ধে যাইতেছি সেই জন্য বিদায় লইতে আসিলাম, চিন্তা করিও না, পুনরায় কাল দেখা হইবে।'

সরযূ শিহরিয়া উঠিলেন, দাঁড়াইতে না পারিয়া রঘুনাথের শরীরের উপর হেলিয়া পড়িলেন এবং তাঁহারস্কন্ধে আপন মস্তক স্থাপন করিলেন; কথা কহিতে পারিলেন না; রঘুনাথ দেখিলেন সরযূ নিরব, অজস্র অশ্রুতে তাঁহার স্কন্ধ, বাহু ও বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে।

রঘুনাথ অনেক কথা বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—ছি সরযূ, তুমি কেন মিথ্যা ভয় করিতেছ; আমি কত যুদ্ধে গিয়াছি, পুনরায় ত তোমার পার্শ্বে আসিয়াছি, অদ্য এটি অতি সামান্য যুদ্ধ মাত্র। আর দেখ, আমরা পরাধীন, ঘৃণিত, অপদার্থ, মুসলমানেরা আমাদের রাজা, আমরা দাস; একথা স্মরণ করিলে কাহার অন্তঃকরণ না বিদীর্ণ হয়, কে না নীরবে রোদন করে? পুনরায় হিন্দুরাজ্যের জন্য আমরা যুদ্ধ করিতেছি, যিনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, তিনি আমাদের সহায় হইবেন। আর যদিই এ যুদ্ধে হত হই, মনুষ্যভাগ্যে ইহা অপেক্ষা কি সুখ হইতে পারে? তুমি রাজপুত কন্যা, রাজপুতের ন্যায় অদ্য আমাকে বিদায় দাও।'

ক্ষণেক রোদনে সরযূর হৃদয়ের উদ্বেগ শান্ত হইল, তিনি মস্তক তুলিয়া শান্ত নির্ম্মল পবিত্র নয়নে রঘুনাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—'রঘুনাথ তোমার মহৎ উদ্দেশ্য জানি, যে দিন অবধি তুমি সেই উদ্দেশ্যের কথা আমাকে বলিয়াছ, সেই দিন অবধি কখনও তোমাকে যুদ্ধে যাইতে বিরত করি নাই। অদ্যও করিব না, কিন্তু নারীর প্রাণ, কখন্ কি ভাব উদয় হয় কে বলিবে, সহসা আমার মনে কেন ব্যথা পাইলাম, সহসা কেন চক্ষুতে

জল আসিল জানি না। যাও রঘুনাথ বিলম্ব করিওনা; তোমার হৃদয় সাহসী, আশয় মহৎ ও উন্নত, যুদ্ধে চিরজয়ী হও, দেশ দেশান্তরে তোমার যশ, তোমার নাম প্রচারিত হউক, সরযূও একাকিনী বসিয়া সেই যশোগীত গাইবে! জগদীশ্বর তোমাকে জয়ী করুন! তিনি জগতের রাজা, যিনি যোদ্ধার চিরবন্ধু, তাঁহাকে প্রণাম করি।'

'তিনি তোমাকে নিরাপদে রাখুন এই বলিয়া রঘুনাথ চলিয়া গেলেন। ছাদে সরযূ একাকিনী দণ্ডায়মানা, রাজপুতবালা সাহস বাক্যে হৃদয়বল্লভকে বিদায় দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় শান্ত হইতেছে না, ঝর্ ঝর্ করিয়া নয়ন হইতে নীরবে অশ্রুবিন্দু পড়িতেছে।

কতক্ষণ পর অন্ধকার প্রান্তরে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল; দূরে নিবিড় অন্ধকারে একজন অশ্বারোহীর উন্নত আকৃতি বিলুপ্ত হইল। সরযূ চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া আর কিছু দেখিতে পাইলেন না, সমস্ত নিস্তব্ধ ও অন্ধকার; তাঁহার হৃদয় শূন্য ও অন্ধকার। ধীরে ধীরে ছাদ হইতে নামিলেন।

সেদিন অন্ধকারে সরযূ নয়নের মণি হারাইলেন, সেই দিন জীবনের জীবন হারাইলেন।

এক দিন, দুই দিন অতিবাহিত হইল, রঘুনাথের কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। আশা প্রথমে কাণে কাণে বলিতে লাগিল—'রঘুনাথ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছেন, রঘুনাথ রাজসম্মানিত হইয়াছেন, বিজয়ী শীঘ্র উল্লাসিত হৃদয়ে সরযূপার্শ্বে আসিবেন, পরম কুতূহলে সরযূর হস্ত ধরিয়া যুদ্ধের গল্প বলিবেন।' অশ্বের ক্ষুরশব্দ হইলেই সরযূর হৃদয় উদ্বেগপূর্ণ হইত, তিনি গবাক্ষ দিয়া চাহিয়া দেখিতেন, পুনরায় ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিতেন। গৃহে দ্রুত পদবিক্ষেপ শুনিলে সরযূ চমকিয়া উঠিতেন, পুনরায় নীরবে বসিয়া থাকিতেন।

দিন গেল রজনী আসিল, পুনরায় দিবস আসিল, এক দিন, দুই দিন, তিন দিন গেল, রঘুনাথ আর আসিলেন না। সরযূ সেই পথ চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইলেন, আশা চিন্তায় পরিণত হইল, বালিকার গণ্ডস্থল ক্রমে শুষ্ক হইল, চক্ষুদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে জলপূর্ণ হইতে লাগিল; রঘুনাথ আসিলেন না।

সে চিন্তার অব্যক্ত্য যাতনা প্রকাশ করা যায় না; বালিকা কাহাকে সেকথা বলিবেন? নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, নীরবে গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিতেন, অথবা সায়ংকালে সেই ছাদে উঠিয়া সেই অন্ধকার পরিপূর্ণ প্রান্তরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শ্রান্ত হইতেন। সেই উন্নত দেহ কি দূরে দেখা যাইতেছে? সরযূর যোদ্ধা কি যুদ্ধ-উল্লাসে সরযূকে বিস্মৃত হইলেন? যুদ্ধে কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? সহসা অশ্রুজলে সর-

যূর নয়ন আপ্লুত হইল, শুষ্ক গণ্ডস্থল দিয়া ধারা বহিয়া পড়িতে লাগিল।

সহসা বজ্রবনাদ সংবাদ আসিল রঘুনাথ বিদ্রোহী, বিদ্রোহাচরণের জন্য অবমানিত হইয়া দূরীকৃত হইয়াছেন। প্রথম মুহূর্ত্ত সরযূ চকিতের ন্যায় রহিলেন, কথার অর্থ তাঁহার বোধগম্য হইল না। ক্রমে ললাট রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, রক্তোচ্ছ্বাসে মুখমণ্ডল রঞ্জিত হইল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, নয়ন হইতে অগ্নিকণা বহির্গত হইতে লাগিল। দাসীকে বলিলেন "কি বলিলি, রঘুনাথ বিদ্রোহী? রঘুনাথ মুসলমানদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন? কিন্তু তুই নির্ব্বোধ, তোকে কি বলিব, সম্মুখ হইতে দূর হ।' শান্ত ধীর-স্বভাব সরযূকে এবম্বিধ ক্রুদ্ধ দেখিয়া দাসী বিস্মিত হইল, শশব্যস্তে সরিয়া গেল।

ক্রমে যুদ্ধ হইতে একে একে অনেক সৈন্য আসিতে লাগিল, সকলে বলিতে লাগিল 'রঘুনাথ বিদ্রোহী।' বার বার সরযূ এই কথা শুনিতে লাগিলেন, তাঁহার সখিগণ সরযূকে এই কথা বলিলেন; বৃদ্ধ জনার্দ্দন সাশ্রুলোচনে বলিতে লাগিলেন যে, কে জানে সেই সুন্দর উদারমূর্ত্তি বালকের মনে এরূপ ক্রূরতা ছিল? সরযূ সমস্ত শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না, রঘুনাথের বীরত্বে ও সত্যব্রততায় সরযূর যে স্থির অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা বিলুপ্ত হইল না। তিনি কাহাকেও কোন উত্তর দিলেন না, তাঁহার মুখমণ্ডল অন্ধ আবক্ত, নয়ন জলশূন্য।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইলে পর একদিন সন্ধ্যার সময় সরযূ সরোবরতীরে যাইলেন; হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া ধীরে ধীরে চিন্তিত ভাবে গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

সহসা পথিমধ্যে সেই নৈশ অন্ধকারে জটাজূটধারী দীর্ঘকায় একজন গোস্বামীকে দেখিতে পাইলেন, ঈষৎ বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইলেন। যত গোস্বামীর দিকে দেখিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার তেজঃপূর্ণ অবয়ব দেখিয়া সরযূর হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পর একটি বিষয় চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'প্রভু! একজন অসহায় নারী আপনার আশ্রয় যাচ্ঞা করিতে আসিয়াছে, তাহাকে ক্ষমা করুন।'

গোস্বামী সরযূর দিকে চাহিলেন, ক্ষণেক স্থির ভাবে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন।

'রমণি, আপনার উদ্দেশ্য আমি অবগত আছি, কোন যুবক যোদ্ধার কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছেন।'

সরযূ অধিকতর ভক্তি সহকারে বলিলেন,—

'ভগবন্ আপনার গণনাশক্তি অসাধারণ,—যদি অনুগ্রহ করিয়া আরও কিছু বলেন তবে বাধিত হই।'

গোস্বা। 'জগতে সকলে তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া জানে।'

সরযূ। 'প্রভুর অজ্ঞাত কিছুই নাই। প্রকৃত অবস্থা কি?'

গোস্বা। 'ম[illegible]ী তাঁহাকে বিদ্রোহী [illegible] দূর করিয়া দিয়াছেন।'

সরযূর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, আরক্ত নয়নে কহিলেন, 'তপস্বী প্রবঞ্চনা বিশ্বাস করিব, কিন্তু রঘুনাথকে বিদ্রোহী বিশ্বাস করিব না! গোস্বামিন্ আমি বিদায় হই।'

গোস্বামীর নয়ন সহসা জলপূর্ণ হইল, —ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আরও কিছু আমার বক্তব্য আছে।'

সরযূ। 'নিবেদন করুন।'

গোস্বা। 'মনুষ্য হৃদয় অবগত হওয়া মনুষ্যগণনার অসাধ্য, যোদ্ধার হৃদয়ে কি ছিল জানিবার এক মাত্র উপায় আছে।

"শাস্ত্রে লিখে প্রণয়িনীর হৃদয় প্রণয়ীর হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ, যদি রঘুনাথের যথার্থ প্রণয়িনী কেহ থাকে, তাঁহার নিকট গমন করুন, তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি জিজ্ঞাসা করুন, তাঁহার হৃদয়ের চিন্তা মিথ্যাবাদিনী নহে।' গোস্বামী তীব্রদৃষ্টিতে সরযূর দিকে চাহিতে ছিলেন।

সরযূ। আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'জগদীশ্বর তোমাকে ধন্যবাদ করি, তুমি আমার হৃদয়ে এতক্ষণে শান্তি দান করিলে। সেই উন্নত চরিত্র যোদ্ধার প্রণয়িনী হইবার যে আশা করে, জীবন থাকিতে রঘুনাথের সত্যব্রতত্বে তাহার স্থির বিশ্বাস বিচলিত হইবে না। হৃদয়েশ! জগতে তোমার অন্যায় নিন্দা করুক, কিন্তু একজন দুঃখিনী বিপদে সম্পদে চিরকাল তোমার যশোগান গাইবে।' সরযূর নয়ন যুগল এতক্ষণে জলপূর্ণ হইল, গোস্বামী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়াছিলেন,—তাঁহারি দুই নয়ন শুষ্ক ছিলনা, তাপসের শান্ত হৃদয় উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল।

ক্ষণেক পর কষ্টে আত্মসংযম করিয়া গোস্বামী বলিলেন,—

'ভদ্রে! আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, যে আপনিই সেই যোদ্ধার প্রকৃত প্রণয়িনী। আমি দেশে দেশে পর্য্যটন করি, সম্ভবতঃ রঘুনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে পারে;—আপনার তাঁহাকে কিছু বক্তব্য আছে?'

গোস্বামীর সম্মুখে রঘুনাথকে হৃদয়েশ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সরযূ ঈষৎ লজ্জিত হইলেন; কিন্তু সে ভাব সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'প্রভুর সহিত তাঁহার সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল?'

গোস্বা। 'কল্য রজনীতে ঈশানীমন্দিরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।'

সরযূ। 'রঘুনাথ আপাততঃ কি

করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, প্রভু কি অবগত আছেন ?'

গোস্বা। 'নিজ বাহুবলে নিষ্কার্য্য-গুণে অন্যায় অপযশ তিরোহিত করিবেন অথবা সেই চেষ্টায় প্রাণদান করিবেন।'

সরযূ। 'ধন্য বীরপ্রতিজ্ঞা। প্রভু। যদি তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ হয়, বলিবেন, সরযূ রাজপুতবালা, জীবন অপেক্ষা যশ অধিক জ্ঞান করে। বলিবেন, সরযূ যতদিন জীবিত থাকিবে রঘুনাথ কে কলঙ্কশূন্য বীর বলিয়া তাঁহারই চিন্তা করিবে, তাঁহারই যশোগীত গাইবে,। ভগবান অবশ্য রঘুনাথের যত্ন সফল করিবেন।'

গোস্বা। 'ভগবান তাহাই করুণ। কিন্তু ভদ্রে! সত্যের সর্ব্বদা জয় হয় না,— বিশেষ রঘুনাথ যে দুরূহ উদ্যমে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহাতে তাঁহার প্রাণসংশয় ও আছে।'

সরযূর নয়নদ্বয় সহসা জলপূর্ণ হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সদর্পে সে জল মোচন করিয়া বলিলেন,—

'রাজপুতের সেই ধর্ম্ম। আপনি তাঁহাকে জানাইবেন যদি কর্ত্তব্য সাধনে হৃদয়েশের প্রাণ বিয়োগ হয়,—তাঁহার দাসী তাঁহার যশোগীত গাইতে গাইতে উল্লাসে নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দিবে!'

উভয়ে ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন; গোস্বামীর বাক্‌শক্তি ছিল না। অনেকক্ষণ পরে সরযূ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রঘুনাথ আর কিছু আপনার নিকট বলিয়াছিলেন ?'

গোস্বামী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া উদ্বেগ কম্পিতস্বরে বলিলেন—"আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বিদ্রোহী বলিয়া জগৎ যাহাকে ঘৃণা করিবে আপনি কি তাহাকে হৃদয়ে স্থান দিবেন ? জগতে যাহার নাম উচ্চারণ করিবে না, আপনি কি মনে মনে তাহার নাম স্মরণ করিবেন ? জগতে কি একজনমাত্র বিদ্রোহী রঘুনাথকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবেন ;—ঘৃণিত, অবমানিত, দূরীকৃত রঘুনাথকে ঐ শীতল হৃদয়ে স্থান দিবেন ?' সন্যাসীর কণ্ঠরোধ হইল।

সরযূ বলিলেন 'প্রভু। সে বিষয় কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? সরযূ রাজপুতবালা, অবিশ্বাসিনী নহে।'

গোস্বা। 'জগদীশ্বর! তবে আর তাঁহার হৃদয়ে কষ্ট নাই, লোকে যদি মন্দ বলে তিনি জানিবেন একজন এখনও রঘুনাথকে বিশ্বাস করে!

এক্ষণে বিদায় দিন ; আমি এই কথাগুলি বলিলে রঘুনাথের হৃদয়ে শান্তিসেচন হইবে!'

সজল নয়নে সরযূ বলিলেন, 'আরও বলিবেন তাঁহার উন্নত উদ্দেশ্য আমি প্রতিরোধ করিব না, অসিহস্তে যশের পথ পরিষ্কার করুন, যিনি জগতের আদি পুরুষ তিনি তাঁহার সহায় হইবেন! আর যদি এই উদ্যমে তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটে,

জানিবেন, তাঁহার চিরবিশ্বাসিনী সরযূ ও এ অকিঞ্চিৎকর জীবন বিসর্জ্জন করিবে।'

উভয়ে পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন। সরযূ বলিলেন 'প্রভু! আমার হৃদয় শান্ত করিয়াছেন, প্রভুর নাম জিজ্ঞাসা করিতে পারি?'

গোস্বামী চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'সীতাপতি গোস্বামী।'

রজনী জগতে গভীরতর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল। সেই অন্ধকারে একজন গোস্বামী একাকী রায়গড় দুর্গাভিমুখে গমন করিতেছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

রায়গড় দুর্গ।

" ধিক্ দেব ঘৃণাশূন্য, অক্ষুব্ধ হৃদয়,
এত দিন আছ এই অন্ধতমপুরে,
দেবত্ব, বিভব, বীর্য্য, সর্ব্ব তেয়াগিয়া,
দাসত্বের কলঙ্কেতে ললাট উজ্জ্বলি?'

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, শিবজীর তদানিন্তন রাজধানী রায়গড়ে রজনী দ্বিপ্রহরের সময় একটি সভা সন্নিবেশিত হইয়াছে। শিবজীর প্রধান প্রধান সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী ও দূরদর্শী বিচক্ষণ পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। পরাক্রান্ত যোদ্ধা, ধীশক্তি সম্পন্ন মন্ত্রী, শীর্ণতনু শুক্লকেশ বহুদর্শী ন্যায়শাস্ত্রী, সভাতল সুশোভিত করিয়াছেন; যুদ্ধব্যবসায়ে, বুদ্ধিসঞ্চালনে বা বিদ্যাবলে ইহারাই শিবজীর চিরসহায়তা করিয়াছেন, শিবজীর ন্যায় ইহাঁদের ও হৃদয় স্বদেশানুরাগে পূর্ণ, হিন্দুদিগের গৌরবসাধন জন্য ইহাঁরা দিনে দিনে মাসে মাসে বৎসরে বৎসরে অনিদ্র হইয়া চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অদ্য সে চেষ্টা কোথায়, সেই উৎসাহ কোথায়? সভাস্থল নীরব, শিবজী নীরব, মহারাষ্ট্রীয় বীরগণ অদ্য মহারাষ্ট্রীয় গৌরবলক্ষ্মীর নিকট বিদায় লইবার জন্য সমবেত হইয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর শিবজী মুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

'পেসওয়াজী! আপনি তবে এই পরামর্শ দিতেছেন, সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি, তাঁহার অধীন জায়গীরদার হইয়া থাকিব? মহারাষ্ট্রীয় গৌরবরবি চিরান্ধকারে মগ্ন হইবে?'

মুরেশ্বর। 'মনুষ্যের যাহা সাধ্য আপনি তাহা করিয়াছেন, বিধির নির্ব্বন্ধ কে লঙ্ঘন করিতে পারে?'

পুনরায় সভাস্থ সকলে নীরব।

পুনরায় শিবজী বলিলেন—

'স্বর্ণদেব! যখন আপনি আমার আদেশে এই সুন্দর প্রশস্ত রায়গড় দুর্গ নির্ম্মান করিয়াছিলেন, তখন ইহা রাজার রাজধানী স্বরূপ নির্ম্মান করেন, না সামান্য জায়গীরদারের আবাসস্থান বলিয়া নির্ম্মান করেন?'

আবাজী স্বর্ণদেব ক্ষুণ্ণস্বরে উত্তর করিলেন—

'ক্ষত্রিয়রাজ! ভবানীর আদেশে এক দিন স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, ভবানীর আদেশে সে চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাতে আক্ষেপ অবিধেয়। যখন রায়গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম তখন কে জানিত হিন্দুসেনাপতি জয়সিংহ সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইবেন? ঈশানী স্বয়ং হিন্দুসেনাপতির সহিত যুদ্ধ নিষেধ করিয়াছেন।'

অন্নজী দত্ত কহিলেন, 'মহারাজ! পূর্ব্বেই আমরা দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজা জয়সিংহের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছি, সে বিষয় অদ্য পুনরুত্থাপন করিয়া আক্ষেপ করিলে ফল কি? যাহা অনিবার্য্য তাহা হইয়াছে, অধুনা আপনার দিল্লীগমনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যত' বিবেচনা করুন।'

শিবজী কহিলেন, 'অন্নজী! আপনার কথা সত্য, কিন্তু যে আশা, যে উৎসাহ, যে চেষ্টা হৃদয়ে বহুকালাবধি স্থান পাইয়াছে, তাহা সহজে উৎপাটিত হয় না;' ক্ষণেক চিন্তার পর বলিলেন, 'এ যে উন্নত পর্ব্বতশ্রেণী চন্দ্রালোকে দৃষ্ট হইতেছে, বাল্য-সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী! ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া বা উপত্যকায় ভ্রমণ করিয়া হৃদয়ে কত স্বপ্নের আবির্ভাব হইত তাহা কি স্মরণ হয়? পুনরায় মহারাষ্ট্রদেশ স্বাধীন হইবে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে, যুধিষ্ঠির বা রামচন্দ্রের ন্যায় সসাগরা ধরার অধিপতি, হিমালয় হইতে সাগর কূল পর্য্যন্ত সমগ্র-দেশ শাসন করিবেন। ঈশানি! যদি এ আশা অলীক স্বপ্নমাত্র, তবে এরূপ স্বপ্নে কেন বালকের হৃদয় চঞ্চল করিয়াছিলে?'

এই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলের হৃদয় বিদীর্ণ হইল; সকলে নীরব, সভায় শব্দ মাত্র নাই,—সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে ঘরের এক প্রান্তে ঈষৎ অন্ধকার স্থান হইতে একটি গম্ভীর-স্বর শ্রুত হইল, 'ঈশানী প্রবঞ্চনা করেন না; রাজন্! তীক্ষ্ণ হস্তে অসি ধারণ করুন, অধ্যবসায় সহিত এই উন্নত পথ অনুসরণ করুন,—স্বপ্ন এখনও সফল হইবে।'

চকিত হইয়া শিবজী চাহিয়া দেখিলেন, জটাজুটধারী, বিভূতি-ভূষিত-অঙ্গ, নবীন গোস্বামী সীতাপতি।

উৎসাহে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, বলিলেন, 'গোঁসাঞিজী! তুমি বাল্য-উৎসাহ আমার হৃদয়ে পুনরুদ্রেক করিতেছ,—বাল্য-কথা পুনরায় স্মরণ হইতেছে। তাত, দাদাজী কানাইদেব মৃত্যুশয্যায় শয়িত হইয়া আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন 'বৎস! তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তদপেক্ষা মহত্তর চেষ্টা নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর, ব্রাহ্মণ গোবৎসাদি ও কৃষকগণকে রক্ষা কর, দেবালয় কলুষিতকারীকে শাস্তি প্রদান কর, ঈশানী

যে উন্নত পথ তোমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই পথ অনুধাবন কর।' বিংশতি বৎসর পরে অদ্যাপি দাদাজীর গম্ভীরস্বর আমার কর্ণ-কুহরে শব্দিত হইতেছে,—দাদাজী কি প্রবঞ্চনা বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন ?'

পুনরায় সেই গোস্বামী সেই গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—'কানাইদেব প্রবঞ্চনা বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, উন্নত পথ অনুসরণ করিলে অবশ্যই উন্নত ফললাভ হইবে,—পথমধ্যে যদি আমরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া উদ্দেশ্য হারাইয়া নিরস্ত হই, সে কি তাত, দাদাজী কানাইদেবের প্রবঞ্চনা না আমাদের ভীরুতা ?'

'ভীরুতা' শব্দ উচ্চারণ মাত্র সভাতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, বীরদিগের কোষে অসি ঝন্‌ঝনা শব্দ করিল,—ক্রোধী চন্দ্ররাও জুমলাদার গোস্বামীর গলদেশ সজোরে ধারণ করিলেন। সীতাপতি ধীর, ভয়শূন্য,—ধীরে ধীরে আপন বজ্রহস্তে চন্দ্ররাওয়ের হস্ত ছাড়াইয়া যেন পতঙ্গবৎ সেই জুমলাদারকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বিস্মিত হইয়া সকলে বুঝিলেন গোস্বামীর চিরজীবন কেবল যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হয় নাই।

গোস্বামী পুনরায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—

'রাজন্। ব্রাহ্মণের বাচালতা ক্ষমা করুন, যদি অন্যায় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি ক্ষমা করুন। কিন্তু মদীয় উপদেশ সত্য কি অলীক, ক্ষত্রিয়রাজ! আপন বীর হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করুন। যিনি জায়গীরদারের পদবী হইতে রাজপদবী গ্রহণ করিয়াছেন, যিনি অসিহস্তে বহু বিপদ, বহু সঙ্কট হইতে স্বাধীনতার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন, যিনি পর্ব্বতে, উপত্যকায়, গ্রামে, অটবীতে, বীরত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়াছেন, তিনি কি সে বীরত্ব বিস্মরণ হইবেন, সে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিবেন? বালসূর্য্যের ন্যায় যে হিন্দুরাজ্যের তেজ চারিদিকে অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া উদয় হইতেছে,—সে সূর্য্য কি অকালে অস্ত যাইবে? রাজন্, হিন্দু-গৌরব-লক্ষ্মী আপনাকে বরণ করিয়াছেন, আপনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন? আমি ধর্ম্মব্যবসায়ী মাত্র, আমার পরামর্শ দিবার অধিকার নাই, স্বয়ং বিবেচনা করুন।'

সভাস্থ সকলে নীরব,—শিবজী নীরব, কিন্তু তাঁহার নয়ন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল।

অনেক ক্ষণ পরে শিবজী গোস্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

'স্বামিন্! আপনার সহিত অল্পদিনই আমার পরিচয় হইয়াছে,—আপনি দেব কি মনুষ্য জানি না কিন্তু দৈববাণী হইতে আপনার কথা অধিক মিষ্ট, হৃদয়ে গভীরতর অঙ্কিত হইতেছে! একটি কথা জিজ্ঞাসা করি;—হিন্দু সেনাপতির তুমুল প্রতাপ, তীক্ষ্ণ রণকৌশল, অসংখ্য

রাজপুতসেনা, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে এরূপ সৈন্য আমাদের কোথায় ? '

সীতাপতি। রাজপুতগণ বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ ও দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ ক'রে না, জয়সিংহ রণপণ্ডিত, কিন্তু শিবজীও ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। পরাজয় আশঙ্কা করিলেই পরাজয় হয়। পুরুষসিংহ! বিপদ তুচ্ছ করিয়া, দৈব সংহনন করিয়া, কার্য্যসাধন করুন, ভারতবর্ষে এরূপ হিন্দু নাই যে আপনার যশোগান না করিবে, আকাশে এরূপ দেবতা নাই যিনি আপনার সহায়তা না করিবেন।' সভাস্থল পুনঃস্তম্ভিত।

শিবজী। 'মানিলাম, কিন্তু হিন্দুতে হিন্দুতে যুদ্ধ করিয়া রুধিরস্রোতে দেশ প্লাবিত করিবে, সেকি মঙ্গল, সে পুণ্যকর্ম্ম ?'

সীতাপতি—'না—কিন্তু সে পাপে কে পাতকী ? যিনি স্বজাতির জন্য, স্বধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করেন, না যিনি মুসলমান অর্থভুক্ হইয়া স্বজাতির বৈরতাচরণ করেন, তিনি ?'

শিবজী পুনরায় নীরব হইয়া রহিলেন, প্রায় এক দণ্ড কাল নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিশাল হৃদয় কত ভীষণ চিন্তালহরীতে আলোড়িত হইতে ছিল, কে বলিবে ? এক দণ্ড কাল পর ধীরে২ মস্তক উঠাইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—

'সীতাপতি! অদ্য জানিলাম মহারাষ্ট্র দেশ এখনও বীরশূন্য হয় নাই, এখনও পরাধীন হইবে না। পুনরায় যুদ্ধ হইবে,—সে যুদ্ধের দিনে আপনা অপেক্ষা বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সাহসী সহযোগী আমি আকাঙ্ক্ষা করি না। কিন্তু সে যুদ্ধের দিন এখনও আইসে নাই। আমি পরাজয় আশঙ্কা করিতেছি না, স্বধর্ম্মি-নাশ আশঙ্কা করিতেছি না, অন্য একটি কারণে আপাততঃ যুদ্ধে বিমুখ হইতেছি, শ্রবণ করুন।

'যে মহৎব্রত ধারণ করিয়াছি তাহা সাধনার্থ কত ষড়যন্ত্র, কত গুপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়াছি, আপনার নিকট অগোচর নাই। কত হত্যা করিয়াছি, কত সন্ধিবাক্য বিস্মরণ হইয়াছি, কত গর্হিত কার্য্যে শিবজীর নাম কলুষিত রহিয়াছে! দেব দেব মহাদেব জানেন আপনার লাভের জন্য এ সমস্ত করিনাই,—হিন্দু-গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে, শিবজীর কেবল এই এক মাত্র উদ্দেশ্য।

' অদ্য হিন্দুধর্ম্মের অবলম্বনস্বরূপ, হিন্দু প্রতাপের প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ মহারাজ জয়সিংহের সহিত সন্ধি করিয়াছি,—শিবজী সে সন্ধি লঙ্ঘন করিতে অপারগ! বিধর্ম্মীর সহিত কপটাচরণ করিয়াছি,—ভগবান্ সে পাপ ক্ষমা করুন,—মহানুভব রাজপুতের সহিত কপটাচরণ শিবজী জীবন থাকিতে করিবে না।

'ধর্ম্মাত্মা এক দিন আমাকে বলিয়া ছিলেন, সত্যপালনে যদি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষা না হয় সত্য লঙ্ঘনে হইবে ।'

সেকথা অদ্যাপি আমি বিস্মৃত হইনাই, —সে কথা অদ্য বিস্মরণ হইব না।

'সীতাপতি। আরংজীব যদি আমাদের সন্ধির কথা লঙ্ঘন করেন, তখন আপনার পরামর্শ গ্রহণ করিব, তখন শিবজী দুর্ব্বল হস্তে খড়্গ ধরিবে না। কিন্তু জয়সিংহের সহিত এই সন্ধি লঙ্ঘন করিতে শিবজী অপারগ।'

সভাসদ্ সকলে নীরব হইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পর অন্নজী বলিলেন—

'মহারাজ। আর একটি কথা আছে —আপনি কি দিল্লি যাওয়া স্থির করিয়াছেন ?'

শিবজী। সে বিষয়েও আমি জয়সিংহকে বাক্য দান করিয়াছি।'

অন্নজী। 'মহারাজ। আরংজীবের চতুরতা জানেন, তাঁহার কথা বিশ্বাস করিবেন ? তিনি আপনাকে কি মনোরথে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কি আপনি অনুভব করিতে পারেন না ?'

শিবজী। অন্নজী। জয়সিংহ স্বয়ং বাক্য দান করিয়াছেন যে দিল্লী গমনে আমার কোনরূপ অনিষ্ট ঘটিবে না।'

অন্নজী। 'কপটাচারী আরংজীব যদি আপনাকে বন্দী করেন বা হত্যা করেন, তখন জয়সিংহ কিরূপে আপনাকে রক্ষা করিবেন ?'

শিবজী। সন্ধি লঙ্ঘনের ফল তিনি অবশ্যই ভোগ করিবেন। দত্তজী! মহারাষ্ট্রভূমি বীরপ্রসবিনী, আরংজীব এরূপ আচরণ করিলে মহারাষ্ট্র দেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে সাগরের জলে তাহা নিবারিত হইবে না, আরংজীব ও সমস্ত দিল্লীর সাম্রাজ্য তাঁহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে। পাপের ফল নিশ্চয়ই ফলিবে।'

শিবজীকে স্থির প্রতিজ্ঞ দেখিয়া আর কেহ নিষেধ করিলেন না। ক্ষণেক পর শিবজী বলিলেন—

'আর একটি কথা আছে, পেশওয়াজী মুরেশ্বর! আবাজী স্বর্ণদেব। অন্নজী দত্ত। আপনাদিগের ন্যায় প্রকৃত বন্ধু আমার অতি বিরল,—আপনাদিগের ন্যায় কার্য্যক্ষম বিচক্ষণ পণ্ডিত মহারাষ্ট্র দেশে বিরল। আমার অবর্ত্তমানে মহারাষ্ট্র দেশ আপনারা তিন জনে শাসন করিবেন, আপনাদিগের আদেশ আমার আদেশের ন্যায় সকলে পালন করিবে, এরূপ আজ্ঞা দিয়া যাইব।'

মুরেশ্বর, স্বর্ণদেব ও অন্নজী শাসনভার গ্রহণ করিলেন। অন্নজী মালশ্রী তখন বলিলেন, 'ক্ষত্রিয় রাজ। আমার একটি আবেদন আছে। বাল্যকাল হইতে আপনার সঙ্গ ত্যাগ করি নাই, অনুমতি করুন, আপনার সহিত দিল্লী যাত্রা করি।'

সজল নয়নে শিবজী বলিলেন, মালশ্রী। তোমার নিকট আমার অদেয় কিছুই নাই,—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।'

সীতাপতি ক্ষণেক পর বলিলেন 'রাজন্! তবে আমাকে বিদায় দিন, আমার ব্রত সাধনার্থ বহুতীর্থে যাইতে হ-

হবে। জগদীশ্বর আপনাকে নিরাপদে রাখুন।'

শিবজী। 'নবীন গোস্বামিন। কুশলে তীর্থযাত্রা করুন। যুদ্ধের সময় আপনাকে পুনরায় স্মরণ করিব, আপনা অপেক্ষা প্রকৃত যোদ্ধা আমি দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি না। আপনার মত অল্প বয়সেই এরূপ তেজঃ, সাহস ও বীরত্ব আমি আর কাহারও দেখি নাই।'

পরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অপরিস্ফুটস্বরে বলিলেন—'কেবল আর এক জনকে জানিতাম!'

সভা ভঙ্গ হইল। শিবজী শয়নাগারে যাইয়া বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, নবীন গোস্বামীর উৎসাহবাক্য বার বার মনে উদ্রেক হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর নিদ্রিত হইলেন, নিদ্রায়ও যেন সেই উৎসাহবাক্য শুনিতে লাগিলেন, সেই বীরভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বপ্নে সকল ঠিক দেখা যায় না, অবস্থা ও রূপের পরিবর্ত্তন হয়। শিবজী স্বপ্নে সেই উত্তেজনা বাক্য শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু বক্তা যেন সে নবীন গোস্বামী নহে, বক্তা রঘুনাথজী হাবেলদার!

আর্য্যায়ুর্ব্বেদ।

অভাব ও প্রয়োজনীয়তাই যাবতীয় বিজ্ঞান ও আবিষ্ক্রিয়ার জনক জননী। অন্যথা নদীমাতৃক মিসর দেশে জ্যামিতির বহুল প্রচার ও কৃপণ-প্রকৃতি শীতকটীবন্ধে কৃষি বাণিজ্য ও শিল্পযন্ত্রাদির আদি উদ্ভাবন দৃষ্ট হইত না। জগতে যখনই যে জাতি পরিতস্থ অপরাপর জাতি অপেক্ষা উন্নত হইয়াছে, তখনই সেই জাতি, দেশ কাল ও জলবায়ুর ক্রিয়াভেদে, স্বীয় বিশেষ বিশেষ অভাব মোচনার্থ নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া, অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির শিক্ষক হইয়াছে। উপরে যে শাস্ত্রের নামাঙ্কিত হইল, তাহা যে কোন জাতি বিশেষের প্রয়োজনীয় মাত্র এমত নহে; উহা শরীরিমাত্রের সাধারণ প্রয়োজনভূত। প্রাচীনকালেও, যে সকল জাতি অতীব অসভ্যাবস্থায় ছিল, তাহাদেরও তৎকালে এইশাস্ত্র কিয়ৎপরিমাণে বিদিত ছিল। যাহার শরীর আছে, তিনিই ইহার জন্য কখনও না কখন ব্যাকুল হইয়াছেন। আয়ুর্ব্বিদ্যা ও তৎক্রিয়াধিকরণভূত মানবশরীর এইরূপ অখণ্ড্য নিয়মে সংবদ্ধ যে, একের অস্তিত্ব অপরের পরিচায়ক। কিন্তু তাদৃশ আবহমান অকিঞ্চিৎকর অসংবদ্ধ ভেষজতত্ত্ব একটি বিজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

ইতিহাসালোকবর্ত্তী হস্তে করিয়া কালের অন্ধকার পথে যে পর্য্যন্ত গমন করা

যায়, তন্মধ্যে ভারতের বেদ ও পরস্থ'নো-দীচ্য প্রদেশের নিমরদই প্রাচীনতম। এতদপেক্ষা দূরগতকালে কি ছিল, তাহা তাহার কিছু পরিচয় দেয় না। আমরা আদৌ প্রাচীনতম ঋগ্বেদের কয়েকটি প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া দেখাইব যে পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতি আর্য্যগণ তখনই প্রায় শাস্ত্রনাযোচিত আয়ুর্ব্বিজ্ঞান উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

উপাসনাবৃত্তি যেমন মনুষ্যের প্রকৃতিগত, মনুষ্য ইহা একেবারে ছাড়িতে পারে নাই, বোধ হয় পারিবেও না, রোগোৎপত্তিও তদ্রূপ মানবপ্রকৃতির আদিবিকারজনিত; এজন্যই বেদকবি বলিয়াছেন, বেদ নিত্য ও আদিপুরুষ ব্রহ্মার কীর্ত্তিত। আবার তাদৃশ হেতু নিবন্ধনই আর্য্যগণ ব্রহ্মাকেই আয়ুর্ব্বেদের আদিবক্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন।

পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ প্রথিত আছে যে, সত্যযুগে লোকসকল নীরোগী ছিল। ত্রেতার প্রারম্ভে ও সত্যের শেষভাগে রোগ সঞ্জাত হয়। অনেক নব্যশিক্ষিত পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী, হয়ত, প্রোক্ত পৌরাণিক বাক্য শুদ্ধ কল্পনাসম্ভূত ও একেবারে অন্তঃসারশূন্য বলিয়া উপহাস করিবেন; কিন্তু একটুকু প্রীতির সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে, তিনি নিশ্চয়ই উহার সারবত্তা অনুভব করিতে পারিবেন। আমরা ভ্রমেও একথা বলিব না যে, সেইকালে সমস্ত মনুষ্য একেবারে সুস্থ ছিল; কদাপি কাহারও স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত ক্লেশ পাইতে হয় নাই, বরং ইহাই দেখাইব যে অতীব প্রাচীন ভারতসমাজেও রোগ শোক বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু, কথা এই যে, সত্যে নিরাময়ত্ব সম্বন্ধে পৌরাণিক বাক্য একেবারে তাৎপর্য্যবিহীন নহে। যখন মানবসমাজ শিশু, যখন পল্লীগ্রামে প্রতি বর্গক্রোশে দ্বিসহস্র লোকও থাকে নাই; যখন মানবজাতি প্রাচীনা বলিয়া জগতে পরিচিত হয় নাই; বাল্যবিবাহ, মদ্যপান ও অপরাপর সভ্যতাসূচক বিলাসসামগ্রী যখন ভারতক্ষেত্রে দুর্ব্বলতার বীজ বপন করে নাই, যখন ঢাকার অতি সূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র বিনিময়ে দৃঢ়তর বল্কল, বাস্পশোভন ছত্রবিনিময়ে বৃক্ষচ্ছায়া সেবন করিয়া আর্য্যঋষি ক্লান্ত হয়েন নাই, সেই সময়ে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দির বহুবিধ রোগের অস্তিত্ব ছিল না, অতি সাধারণ রকমের কোন কোন পীড়া ব্যতীত প্রায়ই রোগ প্রাচুর্য্য ছিল না। এস্থলে 'নিরোগী' এই পদটি রোগহীনত্বসূচক নহে; নঞের অল্পত্ব অর্থই এস্থলে প্রয়োজ্য।

মানব সমাজের বিস্তৃতির সঙ্গে অনেক সুখ ও আসিয়াছে, অনেক দুঃখ ও আসিয়াছে। যে দেশ যত জনাকীর্ণ হইয়াছে, সাধারণতঃ সেই দেশই তত পীড়ার জ্বালায় জ্বলিয়াছে।

ঋগ্বেদের পূর্ব্বে ও তৎসম কালে যে অংশেং আয়ুর্বেদ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে-

ছিল বেদের বহুবিধ প্রার্থনা তাহার পরিচয় দিতেছে। এই কালে আয়ুর্ব্বেদ একটি শাস্ত্ররূপে পরিণত হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। যাহা হউক ইহাই আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তি ভূমি। আমরা এই কালকে বেদায়ুর্ব্বেদ বা দেবায়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত করিলাম। এই কালের আদি গুরু ব্রহ্মা শেষ গুরু ইন্দ্র। ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ ও ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন; ইহাঁরাই দ্বিতীয় কালের প্রবর্ত্তক ; ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রধানতঃ চিকিৎসক ছিলেন বলিয়া, ইহার নাম ব্রাহ্মণ বৈদ্যায়ুর্ব্বেদ বা মিশ্রায়ুর্ব্বেদ। মিশ্রায়ুর্ব্বেদই কাল ক্রমে বৈদ্যায়ুর্ব্বেদ রূপে পরিণত হয়। শেষ কাল বা সর্ব্বায়ুর্ব্বেদ মুসলমান রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় ; এবং আজ পর্য্যন্ত উন্নতি বা অবনতির সোপানে বিচরণ করিতেছে।

আমরা পরবর্ত্তি কয়েক পৃষ্ঠায় এই চারিটি বিভাগের যথা প্রাপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিব। সত্য বটে স্থানে২ বর্ত্তমান কালের বিশ্বাসাতীত দুই একটি প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইবেক ; কিন্তু কি করিব, ভারতের কোন ঐতিহাসিক বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করিতে গেলে জানিয়া শুনিয়া এই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। পাঠক এতাদৃশ স্থলে, অভিপ্রায় গ্রহণ করিবেন, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া ইহার প্রতি অক্ষর গ্রহণ করিতে যাইয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

দেবায়ুর্ব্বেদ।

বা

বেদায়ুর্ব্বেদ।

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত আয়ুর্ব্বেদবিৎ পণ্ডিত ব্রহ্মাকে আয়ুর্ব্বেদের আদি গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; এরূপ বিবৃত আছে যে তিনি লক্ষ শ্লোকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ণ করেন, ও সহস্র অধ্যায়ে বিভাগ করিয়া ইহাকে অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ রূপে নিবেশিত করেন। কালান্তরে, যখন মানব গণ অল্পায়ুষ্ক ও অল্প মেধস্ক নিবন্ধন, তদধ্যয়নে অক্ষম হইয়া উঠিল, পরদুঃখকাতর পিতামহ আপনি অতি সংক্ষেপে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদতত্ত্ব আট ভাগে প্রণয়ণ করে *। ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ হইতে আশ্বিন দ্বয়, আশ্বিন্ হ-

* ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদো নাম যদুপাঙ্গ মথর্ব্ববেদস্যানুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোক শত সহস্রমধ্যায়সহস্রঞ্চ কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ। ততোহল্পায়ুষ্টমল্পমেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য নরাণাং ভূয়োষ্টধা প্রণীতবান। সুশ্রুত ১অ সূত্রস্থান।

ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরধিজগে। তস্মাদশ্বিনাবশ্বিভ্যামিন্দ্রঃ ইন্দ্রাদহং, ময়াত্বিহ প্রদেয়মর্থিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ। ব্রহ্মণাহি যদা প্রোক্তমায়ুর্ব্বেদং প্রজাপতিঃ জগ্রাহ নিখিলেনাদাবশ্বিনৌতু পুনস্ততঃ অশ্বিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদেহ কেবলম্। চরকসংহিতায়াং।

ইতে ইন্দ্র আয়ুর্বেদ লাভ করেন। অশ্বিন দিগের অপর নাম সনত্কুমার। প্রথিত আছে ইহারাই স্বর্গবৈদ্য ছিলেন। ধন্বন্তরি ও ভরদ্বাজ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা ক-রিয়া পৃথিবীতে শারীর বিজ্ঞানের আদি প্র-চারক হয়েন। আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থে পাঁচ জন গুরু পরম্পরা পর্য্যন্ত, স্বর্গে আয়ুর্বেদ প্র-চারিত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। পরে দৃষ্ট হইবে যে ঋগ্বেদ কালে ইহাঁরাই বৈদ্য বলিয়া পূজিত হইয়াছেন। সুতরাং স্বর্গা-য়ুর্বেদ কালকে বৈদিক কাল বলাতে বোধ হয় সত্যের অপলাপ হয় নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে, দীর্ঘ বৈদিক কালে যে সকল ভেষজতত্ত্ব বেদকবিদের বহু গবেষণাতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাই অল্পেং ধন্ব-ন্তরি ও ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক এক অত্যুৎকৃষ্ট শাস্ত্র রূপে পরিণত হয়। বেদকবি মে-ধাতিথি বলিয়াছেন "জলেতেই অমৃত, জলেতেই সমস্ত রোগনাশক ওষধি বর্ত্ত-মান।" * "হে সোম তুমিই আমা-দের প্রশংসার পাত্র, তুমিই ওষধি তরুর প্রভু।" এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে জলের অসাধারণ রোগনিবারিণী শক্তি অতি প্রাচীন কালেই ভারত সমাজে বি-দিত ছিল।

পুনশ্চ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্তোত্রে সো-মবল্লের নিকট রোগদূঢ়করণার্থ প্রার্থনা বিদ্যমান দেখা যায়। সোমবল্ল যে শুদ্ধ বলকর ও মাদক এমত নহে, ইহা যে বহু-বিধ জরাজীর্ণাপহারক তাহাও সেই পুরা-কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, এই প্রার্থনা সোম-দেবের নিকট, কারণ পরবর্ত্তিস্তোত্রেই 'হে সোম তুমি অন্যতরুর সহিত বহু আ-বর্ত্তনে পরিবর্দ্ধিত হও' এরূপ বাক্যে সো-মপদ কদাপি চন্দ্র নামান্তর নহে। সো-মকে আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ স্থানক্রি-য়াদিভেদে চতুর্বিংশতিভাগে বিভক্ত ক-রিয়াছেন *। তাঁহারাও ইহার অসা-ধারণ জরাপহারিণী শক্তি দেখিয়া ইহাকে ওষধিপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন †। পুনরপি ২০ শ সূক্তে "সোম আমাকে বলিয়াছেন যে জলেতেই সমস্ত ওষধি * * * *। হে জল তুমি আমাদের শরীরের নিমিত্ত রোগ নিবারক ভেষজ সৃষ্টিকর। ২১ সূক্ত। ‡ এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে তৎকালে অধিকাংশ ভেষজই জলজ ছিল; জল যে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত

* অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্র-শস্তয়ে। ঋগ্বেদসংহিতায়াং।

* এক এব ভগবান্ সোমঃ স্থানক্রি-য়াভেদেন চতুর্বিংশতিধাভিদ্যতে যথা অং-শুমান্ মুঞ্জবাংশ্চৈব চন্দ্রমা রজতপ্রভঃ। **

† ঔষধীনাং পতিং সোমমুপভুজ্য বিচ-ক্ষণঃ। সুশ্রুত
দশবর্ষ সহস্রাণি নবান্ ধরিয়তি তনুম্ ॥ ঐ

‡ অপসুমে সোমোঽব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজাঃ। অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্ব ভেষজীঃ। আপপৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বেমম। * * *

হইত তাহারত সন্দেহই নাই। এস্থলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে বেদ কবিগণ সোমলতার অধিষ্ঠানভূত দেবের ও কল্পনা করিয়াছেন; কারণ অনেক সূক্তে সোমদেবের প্রার্থনা ও বিদ্যমান আছে * আয়ুর্ব্বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ অশ্বিন্ রুদ্রাদির ন্যায় সোমকে কদাপি চিকিৎসক বলিয়া বর্ণন করেন নাই; শুদ্ধ ওষধিপতি বলিয়াই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। ঋকে স্থানে স্থানে স্বাস্থ্য ও বললাভের নিমিত্ত রুদ্রদেবের প্রার্থনা বর্ত্তমান দেখা যায়; পরবর্ত্তিগ্রন্থাদিতে "স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতম্" বলিয়া অনেক তৈলবটিকার প্রশংসাধ্বনিও বিদ্যমান্ আছে। অন্যতর বেদ কবি গৃৎসমদ বলিয়াছেন 'হে রুদ্র। ত্বৎপ্রদত্ত স্বাস্থ্যরক্ষক ঔষধি দ্বারা যেন আমরা শত শত শীত বাঁচিয়া থাকি। ওষধিতত্ত্ব দ্বারা তুমি আমাদের সন্তানগণকে বলান্বিত কর। কারণ শুনিতে পাই তুমিই চিকিৎসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ'। এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে আত্রেয় ধন্বন্তরি, সুশ্রুত এমন কি বাভটগুপ্ত পর্য্যন্ত ইহাঁকে অশ্বিন্ ইন্দ্রাদির ন্যায় বৈদ্যশ্রেণীভুক্ত করেন নাই। কিন্তু রসেন্দ্র সারসংগ্রহাদি অনেক আধুনিক গ্রন্থে ইহার ভূরি ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ অনুমিত হয় যে তন্ত্রকারগণ পূর্ব্বাচার্য্যদের এই ভ্রমানুসন্ধান পাইয়া বেদোল্লিখিত রুদ্রদেবকে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ী ও মহাদেবকে পরম বৈদ্য বলিয়া আপনাদিগের আরাধ্যদেবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

নৃপতিগণ যে অতি প্রাচীন কাল হইতে এতদ্ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইতেন ঋকেই তাহার আভাস্ পাওয়া যায় * বাস্তব, যে প্রণালীতে ভারতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান পদপল্লব ফল পুষ্পাদিতে সুশোভিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, তাহার মূল সূত্র—আধার উর্ব্বরতা বিধায়ক সার বীজাদি ঋকের সময়েই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বাভিপ্সিত গণনানুসারে ঋকের কাল খৃঃ জন্মের পূর্ব্ব ২০০০ বৎসরের অন্যূন বলেন। সুতরাং যে আয়ুর্বেদের দুই একটি গলিত পত্র আজও প্রাপ্ত হইতেছি, অন্ততঃ ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বীজ বপন সম্পন্ন হইয়াছিল। রোগ মাত্র সাধারণতঃ জলের উপাদেয়তা, বহুবিধ জলজ পদার্থের রোগাপহারিনী শক্তি, উর্দ্ধজত্রুগত রোগচিকিৎসা, বিশেষতঃ চক্ষুরোগাপনয়ন, ও রাজার আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে তত্ত্বাবধানের আবশ্য-

* মানঃ শংসো অবরুযো ধূর্ত্তি প্রণঙ্ঘর্ত্তস্য রক্ষাণো ব্রহ্মণস্পতে। সধাবীয়ো ন বিষ্যতি যমিন্দ্রো ব্রহ্মণস্পতিঃ সোমো হিনোতি মর্ত্ত্যংয়ো রেবান্যো অমীবহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ মনঃসিষক্তু যস্তুরঃ। ঋগ্বেদ সংহিতায়াং।

* শতন্তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্ব্বী গভীরা সুমতিষ্টে অস্তু * * * বস্টোমুবাবঃ।

কর্ত্তা, সেই পুরাকালেই আর্য্যমনস্বিদের নির্ম্মল জ্ঞানগোচর হইয়াছিল। তখন জাতিভেদও হয় নাই, ব্যবসায় ভেদও হয় নাই। একই ব্যক্তির সন্তান স্ব স্ব রুচি অনুসারে উপজীবিকার উপায় অবলম্বন করিতেন। জনৈক বেদ কবি এই বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, 'আমার পিতা চিকিৎসক, মাতা তণ্ডুল প্রস্তুতকারিণী এবং আমি কবি।' ভারতে ব্রাহ্মণ সন্তান কেবল যাজনাধ্যায়নাদি ব্যতীত ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে পারিবেন না, তৎকালে এমন কোনও সামাজিক অনুশাসন ছিলনা। কে কি ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিল, সমাজ তদনুসন্ধানে কাহাকে প্রশংসা বা নিন্দা করিবার জন্য আকুলিত হইত না।

ব্রাহ্মণ বৈদ্যায়ুর্ব্বেদ
বা
মিশ্রায়ুর্ব্বেদ।

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সত্যের শেষভাগে ত্রেতার প্রারম্ভে রোগোৎপত্তি হয়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, যে সত্যের অনাময়ত্ব, রোগহীনত্ব বোধক নহে, রোগের বিরলত্ব ব্যঞ্জক; এস্থলেও রোগোৎপত্তি রোগবাহুল্য বোধক জ্ঞান করিতে হইবেক। এই সময়েই ভগবান্ ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করেন! ধন্বন্তরির জন্ম বিবরণ পৌরাণিক কল্পনা মিশ্রিত হইলেও উহার কাল্পনিকাংশে কবি প্রতিভা (Poetical genius) ও সমুদায়ে ঐতিহাসিক সারবত্তা বিলক্ষণ বিদ্যমান আছে। আর্য্যভূমিতে ধন্বন্তরিই আদি বৈদ্য।

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে যে কালে সমস্তগ্রাম, নগর, উপনগর, নানাবিধ মহামারিতে ব্যতিব্যস্ত, নিরুপায় আতুর অসহ্য ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্তহইবার কোনও পন্থা না দেখিয়া একেবারে হতাশ, সেই সময়েই অতি কুশল করুণাপরায়ণ বৈদ্যলাভ, সমস্ত প্রাণীর ভয়ানক পীড়া নিবারণের অমোঘপ্রায় উপায় লাভ, ভারতক্ষেত্রের ধর্ম্মশীল মনুষ্য হৃদয়ে দয়ারনিধান মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ করুণা বলিয়া প্রতীত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভারতবাসী এই জন্যই ধন্বন্তরিকে অযোনিসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ধন্বন্তরির অমানুষী প্রতিভাই তাঁহাকে নারায়ণরূপী বলিয়া ভারতের পুজোপহার প্রদান করিয়াছিল। একই ব্যক্তির দ্বারা এক সময়ে বহুস্থানব্যাপক মারী নিবারণ অসম্ভব; সুতরাং বাধ্য হইয়াই শীঘ্র শীঘ্র অনেক আর্য্যঋষি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তদ্ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বহু লোকের বিপদ্শান্তি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ক্ষত্রিয় দ্বিজ মাত্রই আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন; কিন্তু কালান্তরে ধন্বন্তরির সন্তান পরম্পরা বংশবাহুল্য হওয়াতে ও ব্যবহারজীবিদের অনুশাসন ভয়ে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি তদ্ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। যাহা হউক এই সময়ের প্রথমভাগ ব্রাহ্ম-

গাদি দ্বিজগণ ও পরভাগে বৈদ্যগণ তদ্ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া ইহাকে মিশ্রকাল নামে অভিহিত করা গেল।

ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্য।

স্কন্দ, গারুড় ও মার্কণ্ডেয় পুরাণানুসারে ভগবান্ ধন্বন্তরি ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সমুদ্ভূত হয়েন। এইরূপ প্রথিত আছে যে, একদা মহর্ষি গালব * সমিৎকুশাহরণার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বনোপান্তে উপস্থিত হইলেন। অতিশ্রান্ত মুনি তৃষ্ণাতুর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন যে, বনবহির্ভাগে একটি কন্যা জলপূর্ণকুম্ভ কক্ষে করিয়া গৃহে যাইতেছে। মুনিবর তদ্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন হে কন্যে! আমি নিতান্ত তৃষ্ণাতুর, জলদান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। ব্রাহ্মণভক্তিপরায়ণা জলকুম্ভ প্রদান করিলে মহর্ষি গালব স্নান করিয়া যথেষ্ট

* যুধিষ্ঠির উবাচ।
ধন্বন্তরির্মহাভাগ অমরেশঃ কথং পুরা।
অভবচ্চর্ব্বতো বিজ্ঞস্তন্মে বদ মহামুনে॥
মৈত্রেয় উবাচ।
ভোরাজেন্দ্র যথা জাতো ধন্বন্তরিরিহৈবতু।
মহর্ষির্গালবো নাম কাষ্ঠদর্ভাহরোবনম্॥
জগাম তত্রভ্রমণাদতিশ্রান্তোবভূব সঃ।
ততোনিরীক্ষয়ামাস তৃষ্ণাতুর কলেবরঃ॥
বনস্যচ বহির্ভাগে কন্যামেকাং দদর্শ সঃ।
জলপূর্ণ ঘটং নীত্বা গচ্ছন্তীং পিতৃমন্দিরং॥
তাংদৃষ্ট্বাহৃষ্টচিত্তোহসৌ বভাসে মুনিপুঙ্গবঃ।
হে কন্যে ত্বংজলং দেহি প্রাণরক্ষাং কুরুষ্বমে।
ততঃসা কলশং ভূমৌ নিধায়াতিষ্ঠদুত্তমা।
গালবশ্চার্দ্ধতোয়েন স্নাত্বা তোয়ং পপৌচতৎ।
প্রোবাচ চাপি হে কন্যে ত্বং সৎপুত্রবতীভব॥
ততঃপ্রোক্তবতী কন্যা ন মে পাণিগ্রহোহভবৎ।
ততোমুনিবরশ্চাহ কাত্বং কিংনাম তে বদ।
উবাচ পুনরন্যোবা বৈশ্যকন্যাহমহং বিভো।
বীরভদ্রাভিধানাচ জানীহি মুনিপুঙ্গবঃ॥
ততো বিচিন্ত্য স মুনি স্তামাদায় জগামহ।
ঋষীণামগ্রতো নীত্বা বৃত্তান্ত মবদত্তদা।
আকর্ণ তে মহারাজ উচ্চৈর্হর্ষিত মানসঃ
ভদ্রং কৃতং মমে নূনমানীতেয়ং যতস্ত্বয়া।
বৈশ্যায়াং বীরভদ্রায়াং ধন্বন্তরির্ভবিষ্যতি
ইত্যুক্ত্বা তেহপি মুনয়ঃ কুসপুত্তলিকাং ততঃ
কৃত্বা ক্রোড়ে দদুস্তস্যা বেদমুচ্চার্য্যতৎকুশে
প্রাণপ্রতিষ্ঠা মপ্যাসাচক্রুঃ পুরুষকাকৃতিম্।
ততোহভবৎ কাঞ্চনরাশি গৌরং
বালোতি সৌম্যাকৃতিরেব তস্যাঃ
ক্রোড়ে বিলোক্যৈব সুতং মুনীন্দ্রাঃ
প্রাপুর্ম্মুদং বেদতঃ এষ জাতঃ।
বৈদ্য সুতোহয়ং জননী কুলেচ
স্থিত সুতোহম্বষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ
এবমুক্ত্বা ততঃসর্ব্বেমুনয়ো দেবরূপিণঃ
অমৃতাচার্য্যমস্যাখ্যাং চক্রুর্বৈশ্যাভিধানকম্॥
* * * অম্বষ্ঠাচারচন্দ্রিকোদ্ধৃত পুরাণ বচনানি।

জল পান করিলেন। এবং অতি পরিতোষ লাভ করিয়া বলিলেন হে কন্যে আমার পরিতোষ হেতু তোমার সৎপুত্র লাভ হউক। কন্যা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ভগবন্ আমার যে বিবাহ হয় নাই। গালব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বৈশ্যকন্যা বলিলেন, আমার নাম বীরভদ্রা, আমি বৈশ্যকন্যা। ঋষিবর তাঁহাকে সঙ্গে নিয়া মুনিসমাজে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন, সকলে হর্ষিত হইয়া বলিলেন, মুনিবর, আপনি বড় মঙ্গল করিয়াছেন এই বীরভদ্রার গর্ভে ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণ করিবেন এই বলিয়া সকলে কুশপুত্তলিকা নির্ম্মাণকরতঃ বীরভদ্রার ক্রোড়ে অর্পণ করিলেন ও বেদমন্ত্র জপ করিয়া ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। অমনি অতি সৌম্যাকৃতি কাঞ্চনরাশি গৌর বীরবালক বীরভদ্রার ক্রোড়দেশ আলোকিত করিল। মুনিগণ হৃষ্টচিত্তে বেদ হইতে জাত বলিয়া ইহার নাম বৈদ্য রাখিলেন, এবং জননীক্রোড়ে স্থিত বলিয়া ইনি অম্বষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

সহৃদয় সদ্বিবেচক পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে অম্বষ্ঠ বংশ প্রবর্ত্তক ভগবান্ ধন্বন্তরির জন্মবিবরণ কেন পুরাণ কবি এবম্বিধ অলৌকিক উপাখ্যান ও অলঙ্কারমিশ্রিত করিয়া বিবৃত করিয়াছেন। যিনি অসাধারণ অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন, সকলেই তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অলৌকিক বলিয়া মনে করে। পুরাণ কবি এজন্যই ধন্বন্তরিকে অযোনিসম্ভব ও নারায়ণাংশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন *। যাহা হউক এবম্বিধ পুরাণ ইতিহাস হইতে সার গ্রহণ করিলে সংক্ষেপতঃ এই মাত্র জানা যায় যে তৃষ্ণাতুর মহর্ষি গালবের পিপাসা শান্তি করিয়া সুশীলা বৈশ্যকন্যা গালব দত্ত পুত্রলাভরূপ বর প্রাপ্ত হয়েন †। কিন্তু স্বয়ং অবিবাহিত এবং মহর্ষি বাক্যও মিথ্যা হইবার নহে, সুতরাং সমাজ কলঙ্ক অবশ্যম্ভাবী; ইত্যাকার চিন্তা করিয়া সবিনয়ে সমস্ত মনঃশঙ্কা গালবকে নিবেদন করিলেন। গালব অপরাপর মহর্ষিদিগের পরামর্শানুসারে বীর ভদ্রাকে বিবাহ করিলেন। বলা বাহুল্য যে তৎকালে ব্রাহ্মণাদির অন্তরজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ শাস্ত্র সঙ্গত ছিল। ধন্বন্তরি এই বীর ভদ্রার গর্ভে ও গালব ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ভরদ্বাজ প্রভৃতি মহর্ষিগণ একত্র হইয়া ইঁহাকে আয়ুর্বেদ ব্যবসায় দান করেন। মহৌজা অমৃতাচার্য্য এইরূপ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া বৈদ্য বংশের মূল সংস্থাপক হয়েন।

* ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যোনারায়ণঃস্বয়ম্।

† পাঠক মনে রাখিবেন যে সেইকালে কন্যাগণ সর্ব্বদাই অল্প বয়সে বিবাহিত হইতেন না।

বয়ঃসন্ধি।

So our lines glide on: the river ends we don't know where, and the sea begins, and then there is nomore jumping ashore.
George Eliot.

একাকী বসিয়া সান্ধ্যগগণের মধুর শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। সুবর্ণ রঞ্জিত সহস্র মেঘখণ্ড আকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল। নীলাকাশে দুগ্ধফেণশুভ্র বলাকাপংক্তি কালিন্দীর নির্ব্বাত বক্ষে শ্বেতকুসুমদামবৎ ভাসিয়া যাইতেছিল। মৃদু পবনসঞ্চারে মেঘখণ্ড বিশেষ ঈষৎ অপসারিত হইল। পাঠক, স্বর্ণ-সীঁথি বিভূষিত কোন প্রিয় শ্যামাঙ্গীর মুখ-কান্তি অতৃপ্ত নয়নে নিরীক্ষণ করিয়াছ? নিটোল ললাট প্রদেশে, যেখানে উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি শ্যাম মাধুরীতে মিশিয়া যায়, সেই স্থানের সেই শোভা কি কখনও দেখিয়াছ? যদি দেখিয়া থাক, তবে আমি সেই আসন্ন প্রদোষ সময়ে গঙ্গা পুলীনে বসিয়া মেঘপ্রান্তে নীলাকাশের যে প্রশস্ত শোভা দেখিতেছিলাম তাহার আভাস পাইবে।

আরও তো অনেকবার সান্ধ্যাকাশের এই পরম রমণীয় শোভা দর্শন করিয়াছি; তবে আজি এ বিহ্বলতা কেন? চিত্তের এ মৃদু চাঞ্চল্য, চক্ষুর এ অপূর্ব্ব রাগব্যক্তি কেন? বহুদিন গত হইল আর একবার এই শোভার নবীনত্বে মোহিত হইয়াছিলাম। সে দিবস আমার জীবনে এক চিরস্মরণীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। গভীর নিশিথে তমসাবৃত কক্ষের গবাক্ষ উন্মুক্ত করিলে যেমন স্ফুরৎচন্দ্রিকারাশি অকস্মাৎ কক্ষ আলোকিত করে;—অদূরবিকশিত কুসুমসৌরভবাহী মৃদুবায়ুস্রোত কক্ষ আমোদিত করে; সে দিবস আমার হৃদয়ের নিগূঢ় প্রদেশে সেইরূপ শারদচন্দ্রমাস্নিগ্ধ, ফুল্ল-কুসুম-সুরভিত, অব্যক্তপ্রকৃতি এক নূতন ভাবের সঞ্চার হয়। সে দিবস আমি কৈশোরসীমা অতিক্রম করিয়া, যৌবরাজ্যে প্রথম পদক্ষেপ করিয়াছিলাম; সে দিবস আমার জীবনে নির্ঝরনদীসঙ্গমবৎ অপূর্ব্ব ঘটনা সংঘটিত হয়। নীলাকাশে বিদ্যুৎরেখাবৎ আজি তাহার মধুর স্মৃতি ক্ষণকালের জন্য হৃদয় আলোকিত করিয়াছে।

এখন আমি কৈশোরসীমা অতিক্রম করিয়া যৌবরাজ্যের অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছি। আমার জীবনের এক অঙ্ক

অভিনীত হইয়াছে, দ্বিতীয় অঙ্ক এখনও শেষ হয় নাই। উচ্ছৃঙ্খলবৃত্তি ভাবরাগ লইয়া এখনও রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিতেছি। সাধু প্রকৃতির মৃদুশাসনে সুকার্য্য করিয়া কখনও নরজীবনে দৈবসুষমা প্রদর্শন করিতেছি; এবং গভীর রজনীতে হৃদয়ের নিগূঢ়প্রদেশে আত্মপ্রসাদের বিমলজ্যোতি অনুভব করিয়া একাকী আমোদোৎসব করিতেছি; কখনও বা কূট প্রকৃতির দুর্ব্বার প্রবোচনায় ক্রুত পরিচালিত হইয়া মানবচরিত্রে নরকসুলভ কলঙ্কক্ষেপ করিতেছি, এবং অনুতাপের মুর্ম্মুরদাহে বিদগ্ধ হইতেছি, এই ভাবে জীবন যাইতেছে। কিন্তু হৃদয় আজি কিছু বিচলিত হইয়াছে; ভূতকালের এক মধুর দৃশ্য আজি অকস্মাৎ উহাতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

কোটি কোটি লোকেরতো কিশোর বয়স চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কেহ কি নিরলে নীরবে মনোসংযোগে একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ যে, কোন্ অলক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া যৌবনভাব তোমার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে? তোমার অজ্ঞাতসারে কোন্ সময়ে তোমার হৃদয় কুট্মলভাব পরিহার করিয়া যৌবন কুসুমের নববিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? আজি তোমার হৃদয় যৌবনগর্ব্বোল্লাসিতা ভাদ্র গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে বিহ্বল; কিন্তু তুমি কি বলিতে পার, কোন্ সময়ে নবপ্রাবৃটের প্রথম ধারা তোমার চিত্তভূমি সিক্তিত করিয়া প্রথমে ক্ষীণ প্রবাহিত হইয়াছিল? অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে, তাই বলিয়া কি জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা স্বরূপ এই সরিৎসাগরসঙ্গম কখন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিবে না?

মানব জীবনে বয়ঃসন্ধি নিরূপিত করিবার কি কোন নির্দ্দিষ্ট রেখা আছে? এমন কি কোন নির্দ্দিষ্ট কাল, চিহ্ন কিম্বা কার্য্য আছে যে, যাহা লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক জীবনের এই অভূতপূর্ব্ব, অপুনঃসম্ভাবী সন্ধিস্থল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে? বয়োধিক্যতো প্রকৃত যৌবনের পরিচায়ক নহে; তুমি বিংশতিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছ বলিয়াই যে তুমি যৌবরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছ এমত নহে। সংসারে নির্জ্জীব, ক্ষীণায়তন, এবং আজন্মরোগক্লিষ্ট কত লোক আছে, কিন্তু কেহই তাহাদিগকে যৌবনশালী বলিয়া উপহাস করিবে না। শরীরপুষ্টি যৌবনসূচক নহে। কেহবা পঞ্চবিংশবর্ষ বয়সে নৈসর্গিক কারণে পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের ন্যায় ক্ষীণাঙ্গ; কেহবা পঞ্চদশবর্ষ বয়সেই সর্ব্বপ্রকার শারীরিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তবে কি বিদ্যা এবং বুদ্ধিকেই যৌবনের আনেতা বলিব? তাহাও যুক্তিসঙ্গত হয় না। একবিংশতি বর্ষে কেহ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হইতেছেন; কেহবা আবাৰ্দ্ধক্য নিবিষ্টমনে জীবন উৎসর্গ করিয়াও অভিলষিত সিদ্ধি করিতে সমর্থ হয় না। তখন কি বলিব যে

পশ্চাদ্রুক্ত হতভাগ্য আমরণ যৌবনরাজ্যে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই ? কেহ কেহ বলিবেন যে, জীবনে ধর্ম্মভাবের গভীরতা লাভই যৌবনপ্রাপ্তিসূচক, এ নির্দ্দেশও নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল। তাহা হইলে ধ্রুব এবং প্রহ্লাদ অপগণ্ড বয়সেই প্রাপ্ত যৌবন হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। আর উদ্দাত শ্মশ্রু, উদ্ধতবিক্রম রত্নাকরকে বালক বলিতে হয়! তবে দেখা যাইতেছে যে, বয়স, বিদ্যা, বুদ্ধি কিংবা ধর্ম্মভাব প্রভৃতি মানবজীবনে যৌবনভাব আনয়ন করে না।

তবে সর্ব্বজন স্পৃহনীয় এই কমনীয় সময়ের আনেতা কে? কোন্ ঘটনা, কোন্ চিহ্ন অবলম্বন করিয়া আমরা এই মধুর রসসঞ্চার গণনা করিব।

আমি নরনারীর জীবনে যৌবনভাব সঞ্চারের এক মাত্র কারণ ও সময় অবধারণ করিয়াছি; তাহা সম্পূর্ণ আকস্মিক। স্ত্রী কিংবা পুরুষ বিশেষের প্রতি অকপট দৃষ্টিতে হঠাৎ যখন একের হৃদয়ে অন্যতরের প্রতি কোন অভূতপূর্ব্ব, অজ্ঞাত প্রকৃতি নবভাবের সঞ্চার হয়, তখন হইতেই যৌবন প্রারম্ভ গণনা করিতে হইবে। সে ভাব, না প্রীতি সম্ভূত, না প্রেম প্রণোদিত; তাহা স্নেহ হইতে স্বতঃনির্গত নহে, কিম্বা ভক্তিপ্রসূত অথবা ভীতিদীপ্ত নহে, অথচ তাহাতে পরস্পর গাঢ় সংশ্লিষ্ট এই সকল বৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। ভাবুক সেই নবোদিত ভাবের প্রকৃতি বুঝিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

অন্যে এই ভাবের কি সংজ্ঞা প্রদান করিবে, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি ইহাকে পূর্ব্বরাগ বলিয়া থাকি। পূর্ব্বরাগ বলিলে আধুনিক সংস্কৃত সমাজে অনেকের নিকট কেবল প্রাপ্ত বয়স্ক নর নারীর মধ্যে অন্যান্যের প্রতি প্রেমাভিলাষ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমি পূর্ব্বরাগের এ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নহি। পূর্ব্বরাগ প্রণয়ে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বরাগ প্রণয় নহে। প্রীতি সঙ্কোচভাব পরিশূন্য। কিন্তু পূর্ব্বরাগ অন্যান্যের মধ্যে লজ্জার মৃদু প্রভাব অনুভূত করাইবে। যে কখনও পূর্ব্বরাগের আভাস অনুভব করে নাই, সে ভাবি প্রণয়পাত্রের নিকট গমন করিতে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আত্মীয়স্বজন জ্ঞানে নিয়মিত এবং সরল আচরণে সে কখন লজ্জার অনুপ্রভাবেও আকৃষ্ট হইবে না। কিন্তু যখনই কৌমারসুলভ স্বচ্ছহৃদয়ে পূর্ব্বরাগের আভাস আসিয়া পতিত হইবে, তখনই তাহার মুখলাবণ্য অন্তঃস্মিত প্রভাসিত হইয়া উঠিবে। অনির্দ্দিষ্টহেতু মৃদু লজ্জার কম আবরণে অকৃত্রিম নয়নবিভ্রম লুক্কায়িত হইবে। এবং হৃদয়ের নিগূঢ়তম প্রশান্ত প্রদেশে এই আকস্মিক আবেগের সাক্ষাৎ কারণ আবিষ্কার করিতে সে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইবে। প্রকৃত প্রণয়ে লজ্জার আধিপত্য নাই। প্রণয়ী অম্লানচিত্তে, স্মিতমুখে প্রণয়ভাজনের সম্মুখীন হইবে এবং অন্যান্যের

প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। সংসারের বাধা, গুরুগঞ্জনা, সমাজের লাঞ্ছনা তাহাকে বিরত করিতে পারিবে না। স্রোতস্বতী পর্ব্বত প্রান্ত হইতে যদি একবার বেগে প্রধাবিতা হয়, তুঙ্গশৈল সংবাধা প্রাপ্ত হইলেও দুর্ব্বার বেগ জলপ্রপাতরূপে তাহা অতিক্রম করিয়া সহস্রোত্তর বিক্রমে পুনর্ব্বার নিজ পন্থার অনুসরণ করে। আমি এমত বলিতেছি না যে, সকল প্রণয়ীই কুল, মান আত্মীয় কুটুম্ব, গৃহ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অভিলষিত পাত্রের অনুসরণ করিবে। কিন্তু হৃদয় আত্মবশ নহে, প্রণয়ের অধীন। প্রণয় যেখানে, হৃদয় সেখানে স্বতঃ প্রধাবিত হইবে। শরীর পিঞ্জরবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের স্বচ্ছন্দবিহার নরশাসনবহির্ভূত। তবে এমন মহাপ্রণয়ী থাকিতে পারেন, যিনি প্রণয়োৎসবে আত্মসুখোৎসর্গ করিয়াও চিত্তের স্থৈর্য্য এবং শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যিনি পূর্ব্বরাগ অনুভব করিয়াছেন, তিনি রাগ ভাজনকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানে মনে মনে তাঁহার আরাধনা করিবেন; আর যিনি প্রণয়ী হইয়াছেন, তিনি প্রণয় পাত্রের সমকক্ষ, অথবা তাঁহাকে সমকক্ষ বলিয়া বিশ্বাস করেন। পূর্ব্বরাগ যেরূপ প্রীতি কিম্বা প্রেম নহে, তেমনি উহা শুধু ভক্তি, ভীতি কিংবা স্নেহসম্ভূতও নহে।

নর নারীর জীবনে কখন যে এই মাহেন্দ্রমুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই। কেহবা লৌকিক যৌবন অনেক দিন লাভ করিয়াও এই অপূর্ব্বভাবের অধিকারী হয় না। আবার কেহবা অতি অল্প বয়সেই উহার মোহন প্রভাবে উদ্দীপ্তহৃদয় হইয়া উঠে। কিন্তু যে বয়সেই হউক না কেন, মানব যে মুহূর্ত্তে ইহার আভাস অনুভূত করে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার স্বল্পপ্রসব জীবনস্রোত মৃদুসংলাপী নির্ঝরপ্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া উত্তালতরঙ্গক্ষুব্ধা পূর্ণ গঙ্গার কলপ্রবাহে উদ্বেলিত হয়। কৈশোর সুলভ মুগ্ধভাব, অস্ফুটপ্রকৃতির পরানুবর্ত্তন, যৌবনোদ্গমে সংসারপর্য্যবেক্ষণে এবং স্বাবলম্বনে পরিণত হয়। আশু সন্তুষ্ট কৌমারভাব নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভূতকালে বিলীন হইয়া যায়; এবং সংসারভার মস্তকে ধারণ করিয়া হাস্যমুখে নবযৌবন মানবহৃদয় অধিকার করে। কল্য বালক ছিলে, আজি যুবা হইলে! আজি হইতে শারদচন্দ্রমায় কলঙ্ক থাকিবে না; এবং শিতরশ্মী শীতলতর অনুভূত হইবে। আজি হইতে স্ফুটকুসুমে নবরাগব্যক্তি ও গভীরতর সুরভি নিঃসৃত হইবে; এবং বনবিহঙ্গ নিনাদে নূতন তন্ত্রীর মধুরালাপ শ্রুত হইবে।

যদি পুরুষ হও, তাহা হইলে কামিনীর মুখমণ্ডলে নূতন শোভা দেখিতে পাইবে। এত দিন যেখানে সাধারণ সৌন্দর্য্য দেখিতে, আজি প্রকৃতির শিরোভূষণ ক-

পিণী সেই স্ত্রীমূর্ত্তিতে স্বর্গীয় মহিমা, দৈববৈভব, লোকোত্তর মাধুর্য্য, অলৌকিক লাবণ্যলীলা প্রথম দেখিতে পাইবে। সেই সর্ব্বলোকসম্পূজনীয়া মোহিনীমূর্ত্তির সম্মুখে তোমার পুরুষসুলভ ঔদ্ধত্য, অহঙ্কার প্রভৃতি সমুদায় চলিয়া যাইবে, তোমার উন্নত মস্তক তোমার অজ্ঞাতসারে স্বতঃ অবনত হইবে স্ত্রী হও, পুরুষের সৌভ দেখিয়া তোমার অস্ফুটহৃদ... প্রোৎফুল্ল হইয়া উঠিবে; প্রেমপ্রীতি, স্বর্গশান্তি, ভূত এবং ভবিষ্যৎ একত্রে মিশিয়া তোমার নয়নসম্মুখে আশার সমোজ্জ্বল স্নিগ্ধকিরণরঞ্জিত সুন্দর ইন্দ্রচাপ রচনা করিবে।

আজি এই শুভদিবসে ভাবিজীবনের মধুর প্রারম্ভই তোমার নয়ন সম্মুখে ন্যস্ত করিলাম। ভবিষ্যৎগর্ভে পর্ব্বতাকারে তোমার জন্য যে কত পরীক্ষা—দুঃখ দারিদ্র, ভীতি আশঙ্কা, কত প্রলোভন—রূপগুণ, ধন সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার বিশদ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তোমার উৎসাহপূর্ণ, আবেগশালী নূতন হৃদয় অবসন্ন করিতে চাই না। বীচিবিক্ষিপ্তা কল্লোলিনীর ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া যে নাবিক বহিত্র পরিত্যাগ করিয়া, অদৃষ্টে নির্ভর করে, সে কাপুরুষ। অনিশ্চিতপ্রকৃতি ভাবি বিপদ স্মরণ করিয়া সুখের সময় অবসাদতমসাবৃত করিও না। অথচ যে স্বচ্ছ প্রসন্ন হৃদয় লইয়া আজি এ নূতন জীবনে প্রবেশ করিলে, সংসারের ঘূর্ণাবাতে পড়িয়া তাহা মালিন্যময় করিও না।

সোমরস ও তাহার সেবনবিধি।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ আলোচনা করিলে, "সোমরস" নামে এক প্রকার পদার্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের অতি প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতে, আর আধুনিক তন্ত্র ও পুরাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যে, "সোমরস" শব্দের ভূরি ব্যবহার দেখা যায়। এই সোমরস প্রাচীন ভারতে এরূপ আদৃত ও প্রচলিত ছিল যে, উপন্যাস লেখক, নাটককার, কবি এমন কি ইতিহাসবেত্তা ও আলঙ্কারিকেরা পর্য্যন্ত ইহার উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই সোমরস কি, এবং কোথায় পাওয়া যায় এ বিষয় লইয়া বহু দিন পর্য্যন্ত প্রত্নতত্ত্বজ্ঞসমাজে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, এবং কলিকাতা ও বোম্বায়ের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ভাষাবিদ্ পণ্ডিতেরা এবিষয়ে ৫।৭ বৎসর কাল ক্রমিক তর্ক বিতর্ক করেন, এবং এই অজ্ঞাত পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ার্থ বহুস্থান পর্য্যটন করেন।

সম্প্রতি কলিকাতার আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যেরা সোমরস সম্বন্ধে পুনরায় বাদানুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহা উক্ত সোসাইটির সাময়িক পত্রিকার * প্রত্যেক পৃষ্ঠাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এবং বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁহারা কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন, তাহা ভবিষ্যতের তমসাময়ী গুহায় নিহিত। সে যাহা হউক, আমরা বহু দিন হইতে বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা এবং নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, সোমরস সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, এই সুযোগে, বর্ত্তমান প্রস্তাবে, তাহা বিশেষ করিয়া প্রতিপাদ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুদিনের অপ্রতিহত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পর, সোমরস সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা বান্ধবের পাঠকগণ এবং আসিয়াটিক সোসাইটির সভ্যদিগের নিকট উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে, এই ভরসায় আমরা এ গুরুতর প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

সোমরস, আর্য্যঋষিদিগের একপ্রকার পানীয় দ্রব্য। ইহা সকল শ্রেণীর লোকদিগেরই সেব্য ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণই ইহা পান করিত। সংসারত্যাগী, যোগী, সন্ন্যাসীদিগেরও ইহা পান করিতে নিষেধ ছিল না, বরং যোগসাধনে ইহার ব্যবহার ছিল। যথা—

"যুগে যুগেঽপি কর্ত্তব্যো যোগিনো যোগসাধনে। পিবেৎ সোমরসং ভক্ত্যে আয়ুর্ম্মেধাবলপ্রদং॥" (শিবসংহিতা)

পূর্ব্ব কালে সোমরস যজ্ঞস্থলে ব্যবহৃত হইত। রও গৃহে পান করিবার .দবতা মন্দিরে, কোন পীঠ স্থানে, না হয যজ্ঞস্থলে ইহা পান করিতে হইত, তদ্ভিন্ন অন্যত্রে পান করিবার নিষিদ্ধ নিয়ম ছিল। যদি কেহ কোন স্থলে, সোমরস পান করিবার জন্য অভিলাষী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই স্থলে দেবারাধনা করিয়া সেই স্থানটিকে পবিত্র করিয়া লইতে হইত। অথবা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া লইতে হইত। যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য দেবোদ্দেশে প্রদান করা হইত, তাহার মধ্যে সোমরস প্রধান। অগ্রে সোমরস প্রদান না করিলে যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত না। সকল যজ্ঞেই যে সোমরস প্রদান করা হইত এমত নহে। কোন্ কোন্ যজ্ঞে দেওয়ার রীতি ছিল, তাহা পরে বলা হইতেছে।

আর্য্যদিগের মধ্যে নানা প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের রীতি প্রচলিত ছিল। তন্ত্রে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে ৬৭ প্রকার যজ্ঞ ছিল। সেই সকল যজ্ঞ আবার ১০৩ ভাগে বিভক্ত ছিল, তাহাদের নাম 'ব্রত'। এই ৬৭ প্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানের

* Journal of the Asiatic Society, Bengal.

জন্য বিশেষ বিশেষ বেদী ছিল। সেই সকল বেদীর আকার মোটে ৬ প্রকার, যথা, এককোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী, অষ্টকোণী, বৃত্তা এবং দন্তী। বেদীর আকার এই ছয় প্রকার। ইহার মধ্যে এককোণী, ত্রিকোণী, চতুষ্কোণী ও দন্তী এই ৪ প্রকার বেদী যে যে যজ্ঞে নির্ম্মিত হইত, তাহাতেই সোমরসের ব্যবহার ছিল। অন্য যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত না। বেদীর মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড থাকে। ব্রাহ্মণ (পুরোহিত) বেদীর এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি মধ্যে সোমরস নিক্ষেপ করিতেন। তদনন্তর সোমরসের পূজা ও সোমদেবতার আরাধনা করিবার অন্যান্য অনুষ্ঠান আরম্ভ হইত। যজ্ঞানুষ্ঠান শেষ হইলে, আর্য্যগণ সকলে মিলিয়া * সোমরস পান করিতেন। সোমরস একটি পাত্রে ফেলিয়া, তাহাতে বেদী মধ্যস্থ অগ্নিকুণ্ডের কিঞ্চিৎ ভস্মাবশেষ মিশ্রিত করা হইত, তাহার পরে তাহা পান করা হইত।

যজ্ঞের পুরোহিত প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড মধ্যে সোমরস নিক্ষিপ্ত করিয়া সোমদেবতার আরাধনা করিতেন, এবং অপরাপর দেবতার নামোল্লেখ করিতেন। কোন দেবতার উদ্দেশে যে উপাসনা করা হইত; তাহার অর্থ এইরূপ 'হে সোম! তুমি আমাদের রক্ষক, তুমি আমাদের প্রভু। তুমি যজ্ঞস্থলে দিব্য রথসহ উপস্থিত হও। আমরা সোমরস গ্রহণ করি।' ইত্যাদি। এই সকল ছন্দোবদ্ধ ঋক বা উপাসনার শ্লোক ভক্তিরসার্দ্রচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে গান করা হইত। উপগীয়মান স্বরগ্রামের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অতি শুদ্ধ স্বরসংযোগে উচ্চারণবৈষম্য সংঘটিত হইলে, তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রনষ্ট-শক্তি মনে করিতেন এবং তদ্ধেতু সোমরস পানে তাঁহাদের তৃপ্তি হইত না। * এই উপাসনার গানে তাঁহারা তিন প্রকার বৈদিক স্বর ব্যবহার করিতেন। তাহা এই—উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত। এখনকার উদারা, মুদারা ও তারাকে ইহাদের প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। উদাত্ত—নিগ্ঞ, অনুদাত্ত—ঋধ এবং স্বরিত—সা ও ম, এই গুলির সহিত ঐক্য হয়।' স্বরিত কখন কখন ষড়্জ ও পঞ্চমের সহিত ঐক্য হয়। এইরূপ একটি চিহ্ন (।) বেদের মন্ত্রের উপরে থাকিলে উদাত্ত সঙ্কেত বুঝিতে হইবে। এইরূপ একটি চিহ্ন (—) যদি বৈদিক মন্ত্রের উপরে থাকে তাহা হইলে স্বরিত এবং যদি নিম্নে থাকে তাহা হইলে অনুদাত্ত বুঝিতে হইবে। আবার এই গান করিবার সময় বাদ্যেরও প্রচলন ছিল। তখন যদিও বিশুদ্ধ বাদ্যের সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু ঋগ্বেদে দেখা যায় তৎকালীন মহর্ষিরা সোমরস আরাধনাকালীন এবং

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

* Muir's Sanskrit Text.

সোমরস পানকালীন পুলোকিত চিত্তে গীত বাদ্য করিতেন। বৈদিক বাদ্যের তাদের কিছু নমুনা আমরা দিতেছি।— যথা হা, হী হী হা; হা হী হী হী হী হা, হাং হীং বুহা। পম্ পপো পং পং, হং উং হূং, ইত্যাদি। এই প্রকার গীত বাদ্য করিতে করিতে আমোদে সোমরস পান করা হইত।

যাহা হউক, এক্ষণে, সোমরস জিনিষটা কি এবং কোথায় পাওয়া যায়, দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে নানা প্রকার মত ভেদ হইয়াছে। কেহ কেহ ইউরোপীয় কুলগ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া গতানুগতিক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। আবার কেহ কেহ বা একেবারে হাস্যকর উক্তাবলীর সৃষ্টি করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। যাহা হউক, সোমরসসম্বন্ধে কতিপয় সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের মত এ স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে আলোচনা করিলে বোধ হয় অযুক্তিসঙ্গত হইবে না।

পণ্ডিতবর সারউইলিয়ম জোন্স ও হোরেশ উইলশন সাহেব বলেন, সোমরস এক প্রকার বৃক্ষের পাতার রস। সুপ্রসিদ্ধ রাজস্থানইতিহাসলেখক টড্ সাহেব নির্দ্দেশ করেন যে, ইহা এক প্রকার বৃক্ষের মূলের রস *। মান্দ্রাজবাসী জনৈক তৈলাঙ্গী পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'গুড়ুচী' প্রাচীন কালে সোমরস বলিয়া অভিহিত হইত। আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধানে, বামুনহাটী অথবা ব্রহ্মশাক সোমলতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কাহারও মতে সোমরস ফলবিশেষের রস মাত্র। সুযোগ্য ইংলিশম্যান্ সম্পাদক বলেন, রক্তবর্ণের এক প্রকার লতা সোমলতা বলিয়া উল্লিখিত হয়। ঐ লতার রস স্নিগ্ধ, সুগন্ধ, এবং অম্লমধুর * অধ্যাপক গ্রীন সাহেব গ্রীসদেশীয় সূর্য্যলতার (Sunplant) সহিত এই সোমলতা ও সোমরসের তুলনা করিয়াছেন। এই রসে মাদকতা শক্তির বৃদ্ধি হয়, ইহা উত্তেজক এবং প্রচণ্ড সুরার (Strong wine) ন্যায় কার্য্য করে। † একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন, সোমরস কল্পিত দ্রব্য মাত্র! আর একজন মহাত্মা বলেন, সোমরস— চন্দ্র কিরণ!! বেদে লিখিত আছে, সোমলতার রস তৃপ্তিকর, মাদক, হর্ষজনক পুষ্টিকারক, রোগ নাশক এবং সুমিষ্ট। যথা—

* ভারতীয় গ্রন্থাবলি। ১ম খণ্ড। ১৮ পৃষ্ঠা।

* "The 'soma' plant of the Vedas was the Asclepias Acida of Roxburgh, now known as the twining plant with few leaves; and with clusters of small and fragrant flowers. It yields a mild, acid, milky juice, and grows in various parts of India" The Englishman, 23rd July, 1878. And also Vide "Lecture on the Religious sects of India" P 32. by R. N. Datta.

† Green's Vedic literature. V, I P 2.

(ক) প্রবোমিয়স্তু ইদং বোমৎসরা মা-দয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চ মুষদঃ।

(খ) শয়ঙ্কানো অমিহা বসুবিৎ পু-ষ্টিবর্দ্ধনঃ।

পণ্ডিত কালীকমল সার্ব্বভৌম ব লেন, "সোমলতা নামক লতাবিশেষের মূল হইতে সোমরস নির্গত হয়। ইহা দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত ও তরল। * * * ইহা রীতিমত সেবন করিলে, মনুষ্য লাবণ্যযুক্ত ও দীর্ঘজীবী হয়। এবং প্রচুর ক্ষমতা শালী ও পুস্টকায় হয়।" অধ্যাপক ওয়েবর কহেন, "রীতিমত ঔষধের ন্যায় সোমরস সেবন করিলে শরীর কন্দর্পের ন্যায় কান্তি ধারণ করে এবং শরীরে প্রভূত বল হয়। একবার সোমরস সেবন করিয়া এক দমে ৫।৬ ক্রোশ যাওয়া যায়।" * বেদ পাঠে জানা যায়, সোমরসের বর্ণ জলের ন্যায় তরল এবং দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়। বেদের "সন্তে পয়াংসি সমুযন্তু রাজা" এবং "রাজ্ঞো-মুতে বরুণস্য ব্রতানি বৃহদ্গাভেবং তব সোমধাম"— প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা ইহার দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়ত্ব এবং জলের ন্যায় তরলত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।

সোমরস যে সোমনামধেয় এক প্রকার লতার রস এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। এই লতা পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মিয়া থাকে। বেদে ও ইহা পার্ব্বতীয় বলিয়া কথিত আছে যথা;—"যৎসানোঃ সানুমারুহৎ ভূর্য্যা স্পষ্ট কর্ত্ত্বং। তদিন্দ্রোর্থং চেততি যুথেন বৃষ্ণি রেজতি।" এই সোমরস উজ্জ্বল (Sparkling) এবং দেখিতে সুন্দর। মহর্ষি বাল্মীকি, রাম চন্দ্রের রূপ বর্ণনার স্থলে বলিয়াছেন, 'সোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ।" অর্থাৎ সোমের ন্যায় দেখিতে সুন্দর। এতদ্দ্বারা সোমলতা ও সোমরসের সুন্দর শ্রীত্ব প্রতিপাদ্য হইতেছে। হরিবংশ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও এইরূপ উল্লেখ আছে। অথর্ব্ববেদে লিখিত আছে, স্বর্গে যেরূপ অমৃত, মর্ত্তে সেইরূপ সোমরস। যোগ শাস্ত্রে আছে, "পবনাভ্যাসযোগ সাধনা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, একবার সোমরস সেবন করিলে তদ্রূপ ফল পাওয়া যায়।"

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, সোমলতা বা সোমরস এখন আর পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। সোমাভাবে পার্থিবামৃতকে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।' এই পার্থিবামৃত কি দেখা উচিত। পার্থিবামৃত শব্দে পৃথিবীর অমৃত শাস্ত্রে, পার্থিবামৃত শব্দে জল বলিয়া লিখিত আছে। অমরকোষে এবং ঋগ্বেদে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—(ক) "পয়ঃ কিলালমমৃত মিত্যমরকোষঃ। (খ) অপ্-স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপ্সু তেজঃপ্রশস্ত-যেদেবা ভবতবাজিনঃ। ঋগ্বেদ। ১।২৩। ১৯ (গ) অপ্সুমে সোমো অব্রবীদন্ত বিশ্বানি ভেষজা অগ্নিঞ্চ বিশ্বশম্ভুবং আ-

* Vedio Indica, No IX. PP, 17-28.

পশ্চ বিশ্বভেষজঃ। ১। ২৩। ২০ঋগ্বেদ"

তবে, এত অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের পর সোমরস কি জল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল? ইহা বিশ্বাস করিতে বুদ্ধি প্রতিহত হয়, হৃদয় সঙ্কুচিত হয়। শাস্ত্রে, পার্থিবামৃত অর্থে জল বলিয়া উল্লেখ আছে কিন্তু সোমরস যে জল তাহা কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। সোমাভাবে জলের ব্যবহারের কথাও কোথাও দেখিনাই। অতএব এ মতটি বিশ্বাস্য বা সংযুক্তিসঙ্গত নহে।

জর্ম্মণ দেশীয় কতিপয় পণ্ডিত, Asci [illegible] Acidia কেই সোমলতা বলিয়া উল্লেখ করেন। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলিতে পারি না। অপর কেহ কেহ সোমলতাকে পুঁইশাক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সামবেদের ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে যে, সোমলতা পৃথিবীতে আর উৎপন্ন হয় না। এজন্য অন্য দ্রব্যকে ইহার প্রতিনিধি করিয়া যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিতে হয়। শ্রুতিগ্রন্থে সোমাভাবে পুতিকা (পুঁই) শাকের বিধি আছে। যথা—"সোমাভাবে পুতিকামভিষুনুয়াৎ।" ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে সোমাভাবে পুতিকাবিধানের অনেক শ্লোক আছে। অথর্ব্ববেদের একস্থলে 'পুতিকরঞ্জলতা' সোমলতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বেদে সোমলতার আকার যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পুঁইশাক বলিয়াই আপাততঃ বিশ্বাস জন্মে। পুতিকা শাকের যেরূপ তন্তু (আঁশ) থাকে সোমলতার তাহাই ছিল। ইহাকে সোমতন্তু কহে। যথা—'অপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বেভিরংশুভিঃ। ভবানঃ সুশ্রবস্তমঃসখাবৃধে।' (১১অধ্যায়। ১০ সূক্তঃ।) অধ্যাপক হাগ সাহেব পুনা হইতে যে সোমলতা আনিয়া ছিলেন, তাহার আকার পুতিকা শাকের সহিত অনেকটা ঐক্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহার আস্বাদ অতীব তিক্ত এবং দুর্গন্ধ যুক্ত। * অনেকে বলিয়াছেন ইহা প্রকৃত বৈদিককালীন সোমলতা নহে। †।

সে যাহাহউক, আমার দৃঢ়বিশ্বাস এই যে, সোমলতার আকার বন-পুঁই শাকের ন্যায়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি কতিপয় পণ্ডিতের সহিত বেলগাছিয়ায় গিয়াছিলাম; তথায় সোমরসের উল্লেখ হওয়াতে, বানিয়ালাল বাজি নামধেয় জনৈক পার্ব্বত্য দেশীয় মোহান্ত আমাদিগকে এক লতা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা আকৃতিতে কোমল পুতিকা শাকের মত। আমরা ৪। ৫ জনে উহা আস্বাদন করিয়া ছিলাম, তাহার স্বাদ ঈষৎ অম্ল মধুর বলিয়া বোধ হইল। উহার পত্র পুতিকা শাকের পাতার মত; কিন্তু তত বৃহৎ নহে। আমি, ভ্রম বশতঃ, উহাকে প্রথমে পুঁইশাক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। উহা পুঁইজাতীয় বটে,।

* Aid Br, Vol II P 439.

† Edinburgh Revew Vol LX, No IV

বন-পুঁইয়ের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। (*) ঐ মোহান্ত প্রতিদিন উহার রস প্রায় একছটাক পরিমাণে পান করেন, তাহাতে তাঁহার নেশা হয়। তিনি পূর্ব্বে গাঁজা, চরস, এবং অহিফেন সেবন করিতেন, কিন্তু এই রস সেবন করা অবধি তাঁহার এ সকলের আর প্রয়োজন হয় না। মোহান্ত আমাকে উহা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। আমি তাহা ভারতবর্ষীয় সুশিক্ষোন্নতি সভার (†) বিলাতস্থ পৃষ্টপোষক শ্রীযুক্ত মে স্বয়ার্থ ছইট্‌নি বড্‌ এবং কোম্পানীকে লণ্ডনে পাঠাইয়া ছিলাম। উঁহারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা বলিয়াছেন ইহা প্রকৃত বৈদিক কালীন সোমলতা বটে। (‡) সম্প্রতি পাণ্ডুয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী এদিনা মস্‌জিদের নিকট এক প্রকার লতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ লতা তীর্ব্বত দেশীয় এক প্রকার লতার সহিত ঐক্য হয়। তীর্ব্বত দেশীয় লোকেরা ঐ লতাকে বৈদিককালীন লতা বলিয়া বিশ্বাস করে। তীর্ব্বত দেশে ঐ লতার নাম " মানীর"। * তত্রত্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতেরা মানিরের যেরূপ রূপ ও গুণ বর্ণনা করেন, পাণ্ডুয়ার প্রাপ্য লতা অনেকাংশে তদ্রূপ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানীর জনৈক গার্ড উহা প্রাপ্ত হইয়া তদীয় রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সোমরসের ন্যায় প্রতীত হয়। ইহার স্বাদ অম্লমধুর। ইহা মাদক, ক্ষুৎ-পিপাসোদ্দীপক, উদরের পীড়ানাশক, বিষঘ্ন এবং তৃপ্তিজনক। ইউরোপীয়েরা ইহাকে Semita genia কহিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি উহা রীতিমত আস্বাদন এবং পরীক্ষা করিয়া উহাকে Genus monntee বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বানিয়া লাল বাক্তির প্রদর্শিত সোমরসের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক, সোমলতার আকার অনেকটা যে বনপুঁই শাকের মত সে বিষয়ে আমার কিছুই সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বকালে নানা প্রকার সোমলতা ছিল। এক্ষণে যতদূর অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখিয়াছি, এখনও ২৪ প্রকার সোমলতা পাওয়া যায়। অন্বেষণ করিলে ইহা মিলিতে পারে। এই ২৪ প্রকারের নাম এই,—অংশুমান, ভুজঙ্গমান, চন্দ্রমা, রাজতপ্রভা, দুর্ব্বাসীম, কনীয়াম, শ্বেতাক্ষ, কণকপ্রভা, প্রতনবাম,

* History of Thibet, by Colonel Rayne P 86, and Buddha in Thibet, P 27

† সোমপ্রকাশ। ৯ই আশ্বিন ১২৮৪।

‡ ভারতীয় গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা এবং Proceedings of the preliminary meeting of the I. E. Improvement Society, P 7

* History of Thibet, by Colonel Rayne, P 93.

তালবৃন্ত, করবীর, অংশবান, স্বয়ম্প্রভ, মহাসোম, গারুড়াহৃত, গায়ত্রাইষ্ট্রৈটুভ, পাঙ্ক্ত, জাগত, শাক্বর, অগ্নিষ্টোম, রৈবত, ত্রিপদীযুক্তা, গায়ত্রী, উড়ুপতি। এই সকল সোমলতার প্রত্যেকের ১৫টির অধিক পত্র হয় না। লতা ও আকারে বড় দীর্ঘ নহে কিন্তু বড় স্থূল ও সরস। "মহাসোম" নামক সোমলতার বিংশতিটি পত্র দেখা গিয়াছে। এই সকল লতার পাতা শুক্ল পক্ষে জন্মে এবং কৃষ্ণ পক্ষে পতিত হয়। অমাবস্যাতে সমুদায় পত্র নষ্ট হইয়া কেবল মাত্র লতাবশিষ্ট থাকে। এই সকল লতার তেজ শরৎকালে কিছু প্রখর হয়।

শাস্ত্রে আছে, হিমালয়, সহ্য, মাহেন্দ্র, মলয়, শ্রী, দেবগিরি, পারিপাত্র, বিন্ধ্য এবং বিতস্তা নাম্নী নদীর উত্তরে যে সকল পর্ব্বত আছে, তথায় সোমলতা পাওয়া যায়। সিন্ধু নামক মহানদে, কাশ্মীরের মানসসরোবর, দেবসুন্দ নামক হ্রদে সোমলতা প্রাপ্ত হইবার কথা অথর্ব্ব বেদে দেখা যায়। তন্ত্রে আছে, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে, বিশেষ মহাবনে কিম্বা কোন বনময় প্রদেশে ইহা পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদে আছে, ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে সোমলতা জন্মায়। পশ্চিম ভারতে সোমতীর্থ নামে একটি স্থানও প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তথায় অনুসন্ধান করিয়া সোমলতা পাওয়া যায় নাই। ফলতঃ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, সোমলতা জল এবং স্থল উভয় স্থানেই জন্মায়। (ক্রমশঃ)

ভারতে আর্য্যজাতি।

যে আর্য্যজাতির গৌরব-প্রভায় অদ্যাপি ভারত গৌরবান্বিত, যে আর্য্যজাতির বিদ্যা ও নীতিজ্ঞান জগৎপ্রথিত, যে আর্য্যজাতির বিন্দুমাত্র বিবরণ অদ্যাপি অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞের হৃদয়ে কৌতূহল-শিখা প্রদীপ্ত করে, যে আর্য্যজাতির তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের কণিকামাত্র উদ্ধারার্থ কত কত মহামনীষী জীবনের সার সময় অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, এবং যে আর্য্যজাতির সন্তান বলিয়া আমরা সংসারে চিরদিন সমাদৃত রহিয়াছি, সেই আর্য্যজাতি কোথা হইতে কিরূপে ভারতবর্ষে শুভাগমন করিলেন তাহা জানিতে কাহার না প্রবৃত্তি জন্মে? সেই প্রবৃত্তি কথঞ্চিৎ চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করাই উপস্থিত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রীয় বহুতর গ্রন্থে আর্য্য শব্দের উল্লেখ আছে। তৎসম্বন্ধে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আর্য্য এবং শূ-

দ্রেরা অনার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা, কাত্যায়ন-কৃত সূত্রের ভাষ্যে—

“ শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।”

এবম্বিধ বর্ণ-বিভাগ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, আর্য্যদিগের আগমনের পূর্ব্বে ভারতে যে সমস্ত জাতি বাস করিত, তন্মধ্যে শূদ্রেরাই প্রধান। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ইহার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিজিত ও বিদূরিত করেন; সম্ভবতঃ শূদ্রদিগের নিরীহতা বা অন্যগুণে বশীভূত হইয়া তাহাদিগকে হিন্দুসম্প্রদায় মধ্যে গ্রহণ করেন। সে যাহাহউক হিন্দুশাস্ত্রের ন্যায় অন্যান্য অনেক জাতির গ্রন্থাদিতে আর্য্যনামের উল্লেখ দেখা যায়, এবং ঐসমস্ত জাতিরাও আপনাদিগকে আর্য্যনামে পরিচিত করেন। হিন্দু, পারসীক, গ্রীক, রোমক, জর্ম্মণ, কেল্‌ট্‌ প্রভৃতি কয়েকটি জাতিকে আর্য্য-বংশোদ্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। উল্লিখিত জাতিসমূহের ভাষা পর্য্যালোচনা করিলে তন্মধ্যে কতকগুলি শব্দের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তদ্দৃষ্টে এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। ভাষাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের গবেষণাদ্বারা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, সংস্কৃত, আবস্তীক, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মণ প্রভৃতি কতিপয় ভাষা এক মূল ভাষা হইতে উৎপন্ন। যদিও ঐ মূল ভাষা অদ্যাপি বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি ঐ কয় ভাষার সাদৃশ্যদর্শনে উহাদিগকে একবীজোৎপন্ন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। অনেকে এরূপ কহিতে পারেন যে, সংস্কৃত হইতেই ঐ ভাষা সমস্তের উৎপত্তি হইয়াছে; তাহাহইলে অবশ্যই সকলে আপন আপন ভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে যত্নবান্ হইবে এবং পরিশেষে উদ্দেশ্যবিষয়ের সিদ্ধান্ত করা দুরূহ হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বোক্ত ভাষাগুলির পরস্পরের সৌসাদৃশ্য দর্শনে এক হইতে অন্যের উৎপত্তি প্রতীয়মান হয় না। যাঁহারা ঐ ভাষাগুলির সম্যক্ অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা নিঃসংশয় বুঝিতে পারেন যে, উহারা একই ভাষা, কেবল স্থানভেদে উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে। এসম্বন্ধে অধিক স্থানব্যয় বা অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই সুতরাং আমরা এবম্বিধ দুইটিমাত্র শব্দ উল্লেখ করিব।

সম্পর্কবাচক	সংখ্যাবাচক
সংস্কৃত— পিতৃ	সপ্তন্
লাটিন্—পাটর্	সেপ্টেম্
গ্রীক—পাটর্	হেপ্টা
জর্ম্মণ—ফাতের	সেপ্ত্
আবস্তীক * পৌতর	হপ্তন্

আর্য্যদিগের যে সময়ের কথা হইতেছে তখন তাঁহারা উচ্চ সভ্যতার আদর্শ ছিলেন না; কিন্তু মানব সমাজ যতই কেন

* পারসীকদিগের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের নাম অবস্তা। কেহ কেহ উহাকে জেন্দাবেস্তা বলেন। উহা যেরূপ ভাষায় লিখিত তাহা পারসীক ভাষা হইতে বহুল বিভিন্ন। অবস্তার ভাষা আবস্তীক বলিয়া উল্লিখিত হইল।

অসভ্য হউক না, ভাষা-সৃষ্টির প্রথমেই তাহাদের সম্পর্কসূচক ও সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োজন হইবে। এই কারণে আমরা সম্পর্ক ও সংখ্যা প্রতিপাদক দুইটি মাত্র শব্দের উল্লেখ করিলাম।

এতদ্রূপে ভাষার প্রকৃতি আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে, মূলে উক্ত জাতিসমূহ একস্থানে থাকিয়া এক ভাষায় কথোপকথন করিতেন। ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় স্থানের অসংকুলান জন্য তাঁহারা নানা দিগ্দেশে প্রস্থান করেন। স্থান পরিবর্ত্তন সহ, ঘটনাপরম্পরা যাঁহাদের প্রতি যাদৃশ অনুকূল হয়, তাঁহারা তাদৃশ জাতীয়োন্নতি সাধনে সমর্থ হন। জাতীয়উন্নতিসহ জাতীয়ভাষাও বিস্তর রূপান্তরিত হইয়া থাকে। অধুনা এই সমস্ত ভাষার যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, উহাই তাহার হেতু। যৎকালে প্রাচীন জাতি একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় একস্থানে বাস করিতেন, সে সময় তাঁহাদের ভাষার যে সকল শব্দের বহুল প্রয়োজন ছিল, অধুনা দেখা যায় তদ্রূপ শব্দ নিশ্চয়ই দূরদেশগত আর্য্যগণের ভাষাসমূহে সমভাবেই রহিয়াছে। সুতরাং শব্দবিদ্যার অপার মহিমাবলে* ইহা স্থির হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে আর্য্যজাতি একস্থানেই বাস করিতেন। এক্ষণে দেখা আবশ্যক সেই স্থান কোথায় সন্নিবিষ্ট ছিল।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, আসিয়াখণ্ডই মনুষ্যজাতির আদিম নিবাস স্থল। এখান হইতেই অন্যান্য খণ্ডে মনুষ্য অবতার হইয়াছে। যদি এক জাতি মনুষ্যই ইউরোপখণ্ডে গ্রীস, ইটালী, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশে এবং আসিয়াখণ্ডের পারস্য ও ভারতবর্ষে অবতারিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহারা এই সমস্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে বাস করিতেন। সে স্থান কোথায়? আর্য্যগণ আসিয়াখণ্ডের অন্তর্ভূত কোন শীতপ্রধান দেশে বাস করিতেন, তাহার সন্দেহ নাই। এখনও দূরদেশবাসী আর্য্যগণের ভাষায় শীতবাচক শব্দের সমধিক বাহুল্য ও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ঐ স্থান ভারতবর্ষের উত্তরদিকে সংস্থিত। কারণ, ভারতীয় বহুগ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, ভারতের পশ্চিমোত্তরদিক দিয়াই আর্য্যেরা এখানে আসিয়াছিলেন। ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে গ্রীক ও রোমকেরা উত্তরপূর্ব্ব দেশ হইতে গমন করিয়া গ্রীস ও ইটালী দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন * সুতরাং আর্য্যদিগের আদিম বাসস্থান নির্ণয় করিতে হইলে, আসিয়া মহাদেশে ভার-

* শব্দ-বিদ্যা বা ভাষাতত্ত্বের অসাধারণ চমৎকারিতা হৃদয়ঙ্গম করাইবার নিমিত্ত আমরা পাঠকগণকে Maxmuller's Lectures on the Scince of Languages নামক ২খণ্ড মনোহর পুস্তক অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

* Prichard's Physical History of mankind Vols III & VI দেখ।

তের উত্তর পশ্চিমস্থ এবং গ্রীস ইটালীর পূর্ব্বোত্তরস্থ কোন শীতপ্রধান স্থান নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। সম্ভবতঃ বেলুর্টাগ পর্ব্বতের পশ্চিমে ও অক্ষু নদীর প্রস্রবণের সন্নিধানে যে শীতপ্রধান ও উন্নত ভূভাগ দৃষ্ট হয়, তাহাই আর্য্যগণের আদিম নিবাসভূমি। প্রণিধানসহ ভূচিত্র দর্শন করিলেও একথা মনে উদয় হয়। সেই হিমানীপরিবৃত মানবকুলের আদিম বাসস্থান হইতে আর্য্যগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমশঃ দেশ দেশান্তরে অবস্থান করেন।

কোন্ পথ দিয়া আর্য্যেরা প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তাহাই এক্ষণে নির্ণয় করা বিধেয়। পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থে আইর্ম্যণ-বত্রজো নামে একস্থান সৃষ্টির প্রথম দেশ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ঐস্থান আমু ও সাইহুন নদী সন্নিহিত। আর্য্যেরা প্রথমে যে দেশে বাস করেন তাহাই সৃষ্ট স্থান মধ্যে প্রথম বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আর্য্যেরা ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন স্থানোদ্দেশে প্রস্থান করেন। উক্ত গ্রন্থে সেরূপ অনেক স্থানের নামোল্লেখ আছে। সেই গ্রন্থেই ভারতীয় অন্যান্য স্থানের প্রসঙ্গ করিবার পূর্ব্বে, হপ্তহিন্দু ও হরখ্ইতি নামক দুইটি ভারতবর্ষীয় স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। সপ্তসিন্ধু ও সরস্বতী আধুনিক হপ্তহিন্দু ও হরখ্ইতি নামদ্বয়ের রূপান্তর ভিন্ন কিছুই নহে। সুতরাং পঞ্জাব প্রদেশেই যে আর্য্যগণ প্রথম পদার্পণ করেন তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বেদে অন্যান্য স্থানের নামোল্লেখের পূর্ব্বে সপ্তসিন্ধু নাম পাওয়া যায়*। পঞ্জাবের পশ্চিমে গান্ধার† ও উত্তরে বাহ্লীক‡ দেশে প্রাচীন কালে হিন্দু সমাগম ছিল তাহার নিদর্শন আছে। অদ্যাপি হিন্দুকুশ পর্ব্বতে সিয়াপোশ নামে এক হিন্দুজাতি দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা আর্য্যগণের ভারতের উত্তরপশ্চিমদিক দিয়া প্রথমে পঞ্জাবে অধিবাস স্থাপন ঘটনা সুচারুরূপে সমর্থিত হইতেছে।

পঞ্জাবে আর্য্যসম্প্রদায় মধ্যে ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে ঘোরতর মতান্তর উপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য তাঁহাদের মধ্যে দারুণ কলহ ও বিচ্ছেদের আবির্ভাব হয়। পুরাণে ও কয়েকখানি বৈদিক ব্রাহ্মণে যে দেবাসুরের যুদ্ধপ্রসঙ্গ বর্ণিত আছে, তাহা আর্য্যগণের এই গৃহকলহ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কলহ

* সিন্ধু, তাহার পঞ্চ শাখা এবং সরস্বতী এই সপ্ত নদীর বিদ্যমানতা হেতু পঞ্জাবের সপ্তসিন্ধু বা হপ্তহিন্দু নাম হইয়াছে।

† গান্ধার অধুনা কাণ্ডাহার। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধাররাজ তনয়া গান্ধারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

‡ বাহ্লীক অধুনাতন বল্খ। এই দেশে শান্তনু রাজার ভ্রাতা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

জন্য কতকগুলি মতান্তরিত আর্য্য, ভারত ত্যাগ করিয়া, পারস্য দেশে গমন করেন; তাঁহারা পারসীক নামে খ্যাত। অবশিষ্ট আর্য্যেরা ক্রমশঃ ভারতবর্ষে বসতি বিস্তার করিয়া, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও বিদ্যার আলোচনায় ধন-ধান্যে পরিবৃত হইয়া সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করেন।

কালের কি অপরিসীম ক্ষমতা! প্রকৃতির কি বিস্ময়াবহ আবর্ত্তন! পরিবর্ত্তনের কি অমোঘ গতি! কোথায় গঙ্গা-যমুনা তটিনীদ্বয়ের লীলাভূমি আর্য্যাবর্ত্ত, কোথায় টাইবার-সলিলবিধৌত রোম রাজ্য! কোথায় চির-তুষারাবৃত অভ্রভেদী হিমাদ্রির মালভূমি, কোথায় গিরিবর আল্পস্-বিশোভিত জার্ম্মনি দেশ! কোথায় পুণ্য সলিল-সম্বেষ্টিত, জ্ঞানধর্ম্মনিকেতন পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্র, কোথায় বিলাস-আবাস-ভূমি প্রকৃতির প্রিয় বক্ষস্থল সিরাজ নগর! কি আশ্চর্য্য! কি বিস্ময়জনক! সুবিস্তীর্ণ বীচিমালা বিক্ষোভিত অনন্ত সাগর, সমুন্নত সুদূর বিস্তৃত ভূধর, দূরব্যাপী দুরন্ত মরুভূমি, ভয়াল জন্তু সমাকুল গহন কানন, কলনাদিনী স্রোতস্বতী, প্রকৃতির পরম রমণীয়তার ভাণ্ডার স্বরূপ মনোহর হ্রদ সমূহ আর্য্যজাতির অধুনাতন নিবাস-ভূমি সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ তৎসমস্তই একজাতীয় লোকের নিবাসস্থল। তত্রত্য অধিকাংশ মানবের শিরায় একই শোণিত প্রবাহিত। একই স্থান হইতে সেই মানবরুন্দ সঞ্চারিত। তাঁহারা একই ভাষায় কথোপকথন করিতেন, একই সামাজিক নিয়মে সঞ্চালিত হইতেন, একই রাজ-শাসনের অধীন ছিলেন, একইরূপ কার্য্যে সকলের আসক্তি ছিল। কিন্তু কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! অদ্য আর সে মানবগণ মধ্যে কয়েকটি শব্দের সাদৃশ্য ভিন্ন আর কিছুরই সাম্য নাই। আজ আমরা কেহ কাহাকে আপনার বলিয়া চিনি না। আজ্ আমরা পরস্পর পরস্পরকে পর হইতেও পর বলিয়া মনে করি। আজ্ আমাদের ধর্ম্ম, সমাজনিয়ম, রীতি, নীতি, সমস্তই বিজাতীয় পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন তাঁহাদের ভাষা শুনিলে আমরা পক্ষীর ভাষা মনে করিয়া স্থির নয়নে চাহিয়া থাকি, তাঁহাদের উন্নতি ভাবিলে স্তম্ভিত হই। আমাদের অধোগতি স্মরণ করিলে ব্যথিত হই। আজ পরস্পর আর্য্য-শোণিত-সমুৎপন্ন জাতি সমূহ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আজ্ তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি নাই, ভ্রাতৃভাব নাই। অধিক কথা কি, আমাদের বোম্বাই ও মান্দ্রাজস্থ পারসীক ভ্রাতৃগণের সহিত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; তাঁহারা তাহাই জানেন কই? আমরাই বা তাহা জানি কই? কিন্তু এ সকল জাতিতে স্থানের বিভিন্নতা ব্যতিত অন্য কোন পার্থক্য নাই, থাকাও উচিত নহে। হিন্দু, জর্ম্মণ, গ্রীক, পারসীক প্রভৃতি জাতি সমূহ একই জাতি। আমাদের সকলের পরস্পর চির কালের

নিমিত্ত ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ থাকিবার সম্পর্ক। আমাদের সম্পর্ক উচ্ছেদ করিবার নহে, অস্বীকার করিবার নহে, বিলুপ্ত হইবার নহে। তবে এ ভিন্নভাব কেন? আইস স্বদেশীয়গণ আমরা আমাদের বিদেশস্থ স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের সহিত মমতা সংস্থাপনে প্রযত্ন করি, তাঁহাদের সহিত মিশিয়া যাই, তাঁহাদিগকে আমাদের সহিত মিশাইয়া লই, আমাদিগের হর্ষে তাঁহাদিগকে হাসাই, তাঁহাদিগের বিপদে আমরা কাঁদি। আইস সকলে মিলিয়া আর্য্য নামে পুনরায় জগত মাতাইয়া তুলি,—বসুধা আমাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া শ্লাঘ্য মনে করুন। শ্রীদাঃ—

জয়পুর।

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের শাসনসময়াবধি একটি কুপ্রথার প্রচলন হইয়া আসিতেছে। তদনুসারে রাজধানী কি প্রধান নগরের নামেই রাজ্য বা প্রদেশের নামকরণ হইয়া থাকে। করদ বা মিত্ররাজ্যগুলি ইংরেজশাসনের সম্পূর্ণ অধীন না হইয়াও তাহাদের সংস্রবে ঐ কুপ্রথার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। রাজপুতানা প্রদেশে মাড়বার ও মিবার রাজ্য যথাক্রমে তত্তৎ প্রদেশের রাজধানী যোধপুর ও উদয়পুর নামে সর্ব্বসাধারণ সমীপে পরিচিত। জয়পুর নগরের নাম হইতে যে রাজ্যটিকে জয়পুর রাজ্য বলিয়া সকলে অবগত আছেন, তাহার প্রকৃত নাম ঢুণ্ডার। অম্বকেশ্বর মহাদেবের নাম হইতে উহার আর একটি নাম অম্বর হইয়াছে। ফলতঃ রাজপুতগণের মধ্যে ঢুণ্ডার ও অম্বর নামই সমধিক প্রসিদ্ধ।

ঢুণ্ডার বা জয়পুর মিবাররাজ্য সদৃশ প্রাচীন নহে সত্য, কিন্তু মানসম্ভ্রম সম্বন্ধে তদপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। উভয় রাজ্যের অধিনায়কই সূর্য্যবংশাবতংশ রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের বংশজাত। লববংশীয় নরপতিবর্গ মিবার রাজ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে অধিকার বিস্তার করিয়া বাস করেন এবং কুশবংশীয় নৃপতি বিশেষদ্বারা ঢুণ্ডার রাজ্য সংস্থাপিত হইয়া অদ্যাপি কালের উপর রাজত্ব করিতেছে।

রাজপুতকুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থানুসারে নিরূপিত হইতেছে যে কুশবংশীয় নৃপতিবিশেষ পৈতৃক রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোননদীর তটে রোটস্ নামে এক দুর্গ সংস্থাপন করিয়া বাস করেন। কিন্তু কোন্ সময়ে ঐ দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ঐ দুর্গে কতিপয়

পুরুষ পরম্পরা বাসের পর ৩৫১ সম্বৎসরে (খৃঃ ২৯৫) কুশসন্তানগণের মধ্যে মন * নামে জনৈক প্রসিদ্ধ নামা ভূপতি নিষধ নামে এক নগর সংস্থাপন করেন, অধুনা ঐ নগর নরবার নামে প্রসিদ্ধ। ঐপ্রদেশে এরূপ কিম্বদন্তীও প্রচলিত আছে যে, কুশসন্তানগণ কর্ত্তৃক রোটস্ দুর্গ এবং নিষধ নগর সংস্থাপনের মধ্যবর্ত্তী কালে তাহারা আর দুইটি নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমটির নাম লাহার এবং দ্বিতীয়টির নাম গোয়ালিয়র। এই কিম্বদন্তী নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এক জনের বহু পরিবার কখনই চিরদিন একস্থানে একত্রে বাস করিতে পারে না। তন্মধ্যে কাহারও স্বতন্ত্র বাসের ইচ্ছা হইলেই তিনি স্থানান্তর অনুসন্ধান করিবেন ইহাতে বিচিত্র কি? সে যাহা হউক, কোন্ ব্যক্তি দ্বারা লাহার ও গোয়ালিয়র সংস্থাপিত হয়, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। নিষধ নগরে নলরাজ হইতে ত্রয়োস্ত্রিংশ পুরুষ পাল উপাধি ধারণ পূর্ব্বক সুখে বাস করেন। কোন্ নরপতি এই নূতন উপাধি স্বীয় নামে সংযোজিত করেন, তাহা কোন ইতিবৃত্তে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। * কিন্তু কুশসন্তানগণ কচ্বহ † বংশ নামে বিখ্যাত। কচ্বহেরা প্রতি বৎসর মহাসমারোহে সূর্য্যের আরাধনা করিয়া থাকে। নিয়মিত দিবসে তাহারা অষ্ট-অশ্ব-সংযোজিত রথে সূর্য্যমূর্ত্তি আরোহণ করাইয়া নগর মধ্যে অতি সমারোহ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে।

নলরাজ হইতে ত্রয়োস্ত্রিংশ পুরুষ নরপতি সোরা সিংহ একটি অপগণ্ড পুত্র সন্তান রাখিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই শিশুকে বঞ্চনা করিয়া নরবার রাজসিংহাসন অপহরণ করিলেন। সোরাসিংহের মহিষী পুত্রের ভাবি অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহাকে মস্তকে লইয়া অতি দীনবেশে নগর হইতে

* সংস্কৃত ভাষায় নলরাজ ও তদীয় মহিষী দময়ন্তীর যে অপূর্ব্ব উপাখ্যান প্রচারিত আছে, আকবর বাদসাহের আজ্ঞানুসারে আবুল ফজলের ভ্রাতা ফৈজি ঐ উপাখ্যান পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। বার্লিন নিবাসী পণ্ডিতাগ্রগণ্য বপ্ ঐ অনুবাদ দৃষ্টে ঐ অপূর্ব্ব উপাখ্যান ইউরোপে প্রথম প্রচার করেন। সংস্কৃতানুরাগী ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ তাহার পর মূলগ্রন্থ প্রাপ্ত হন।

* লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল টড বলেন, অতি প্রাচীন রাজপুত জাতীয়েরা পাল উপাধি দ্বারা অভিহিত হইতেন।

† কচ্ছপ হইতে 'কচ্বহ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। কুশসন্তান দিগের মধ্যে কোন্ প্রাচীন পুরুষ কচ্ছপের সংস্রবাপন্ন হইয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। টড কহেন অজমীরের রাজপুতেরা ঐ নামে বিশেষ বিখ্যাত। বোধ হয় বিবাহ সূত্রে ঐ নাম অম্বকেশ্বরে সংলগ্ন হইয়া থাকিবে।

বহির্গত হইলেন। রাজমহিষী এইরূপ দীনভাবে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত বোধ হওয়ায় খোগাং নগরের নিকট পথপ্রান্তে শিশু সন্তান রক্ষা করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণমানসে ফল মূল আহরণে চেষ্টিত হইলেন। ইত্যবসরে এক কাল সর্প আসিয়া বালকের শিরে ফণা বিস্তরণ পূর্ব্বক ছত্রবৎ আচ্ছাদন করিয়াছে। রাজমহিষী হঠাৎ আসিয়া এই ভীষণ অবস্থা দর্শনে ভীতিসংবলিত চিৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। এই ব্যাপার এক ব্রাহ্মণেরও নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। তিনি ইহাকে কোনমতে দুর্লক্ষণ মনে করিলেন না। তিনি ভয়ার্ত্তা শিশুজননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন " কল্যাণি! এই ব্যাপারকে দুর্নিমিত্ত মনে করিয়া ভীত হইও না। এ সুলক্ষণ সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ইহাকে সম্পূর্ণ সুলক্ষণ মনে করিয়া পুলকিত হওয়া উচিত। এই লক্ষণ দর্শনে প্রতীতি হইতেছে যে, ভবিষ্যতে এই বালক রাজা ও তুমি রাজমাতা হইবে।* " মহিষী কহিলেন " উপস্থিত বিপদে আমি যার পর নাই ব্যাকুল হইয়াছি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছি, ভবিষ্যতের ভাবনায় আমার কি হইবে। আপাততঃ প্রাণ রক্ষার কোন উপায় দেখিতেছি না " দয়ার্দ্র-চিত্ত ব্রাহ্মণ, মহিষীর এবম্বিধ কাতর বচন শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উঁহাকে খোগাং নগরের পথ দেখাইয়া দিলেন। রাজমহিলা পুত্রসহ খোগাং নগরে উপনীত হইয়া পথিমধ্যে তত্রত্য রাজমহিষীর পরিচারিকার সাক্ষাৎ পাইয়া তৎসঙ্গে রাজবাটীতে উপনীত হইলেন এবং আপনার অত্যন্ত হীনাবস্থা জ্ঞাত করিয়া তথায় দাসী

* যাহার মস্তকে সর্পে ছত্রধারণ করে সে রাজা হয়, অনেকেরই এরূপ একটি সংস্কার বদ্ধমূল আছে। এই শুভলক্ষণের কিছুই মূল পাওয়া যায় না। অনুমান হয় যখন বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দালয়ে রাখিতে যাইতেছিলেন সেই সময় যে পাতাল হইতে অনন্ত দেব আসিয়া তাঁহার মস্তকে ফণা বিস্তরণ পূর্ব্বক ছত্রধারণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি এই লক্ষণের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। বনবিষ্ণুপুরের রাজাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ একটি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। এ প্রদেশের অনেক শ্রীমন্ত লোক সম্বন্ধেও ঐ রূপ গল্প প্রচলিত আছে। নাটোরের রাজা ও নড়াইলের রতন বাবুদের সম্বন্ধেও অনেক অসম্ভব কথা শুনা গিয়াছে। মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য ও নিতান্ত অবিশ্বসনীয় ব্যাপারঘটিত পরিণাম শুভ ঘটনা সন্দর্শনে এরূপ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। নক্ষত্রপাত দর্শনে অশুভ, ভেকে সর্পগ্রাস করিতেছে তদ্দর্শনে শুভ প্রভৃতি ব্যাপার সমূহে যে শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায়, সর্পের ছত্র ধারণে রাজসিংহাসন লাভ সেই শাস্ত্রেরই পত্রান্তরে অঙ্কিত বলিয়া বিবেচিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব নহে।

ঘৃত্তি অবলম্বনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রলুপ্দি নামক অসভ্য মীনা জাতীয় এক রাজা খোগংএর রাজসিংহাসনের শোভা সম্পাদন করিতেছিলেন। সেই অসভ্য মীনারাজার গৃহে সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

একদা মীনারাজের পাচক অনুপস্থিত থাকায় ঐ রাজপুতমহিলা পাক কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং মীনারাজ সেই সুপক্ব দ্রব্যাদি আহার করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া পাচিকাকে নিজ সমীপে আহ্বান করত তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। রাজমহিষী মীনারাজ সমীপে কিছুই গোপন করিলেন না। তিনি তাঁহার দুরবস্থার সকল কথা প্রকাশ করিয়া কহিলেন। মীনারাজ সেই পরিচয়ে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং তদবধি নরবার রাজমহিষীও তৎপুত্রকে ভগিনী ও ভাগিনেয়রূপে সযত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই বালকের নাম চোল রায়। বালক বয়োবৃদ্ধিসহকারে নিজ সদ্ব্যবহার দ্বারা মীনারাজ ও অপরাপর পৌরজনের তৃপ্তিসাধন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে তুয়ারবংশীয় নৃপতিবিশেষ উপবিষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজবর্গ ঐ তুয়ার বংশীয় দিল্লীশ্বরকে রাজাধিরাজ বলিয়া পূজা করিতেন, এবং তাঁহার তুষ্টির জন্য অনেকে কর প্রদানও করিতেন। মীনা রাজও যথাযোগ্য কর প্রদানপূর্ব্বক সুখে রাজ্য ভোগ করিতেন। একদা মীনারাজ স্বয়ং দিল্লী গমনে অসমর্থ হওয়ায় রাজকর প্রদানের জন্য প্রিয়তম চোল রায়কে প্রেরণ করিলেন।

মীনারাজ কি অশুভক্ষণেই কচ্ছবহ যুবক চোল রায়কে দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন! নিমেষের জন্যও তাঁহার মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় নাই যে, কিছু দিন পরে ঐ যুবককর্ত্তৃক তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। তিনি দুগ্ধ দিয়া কাল সর্প পোষণ করিয়াছিলেন! তিনি অমৃতভ্রমে কালকূট পান করিয়াছিলেন!

কচ্ছবহ যুবক একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীনগরে মীনারাজের প্রতিনিধিস্বরূপ বাস করেন। এই সময়ে তিনি খোগংএর সিংহাসনের প্রতি লোলুপ হন। মীনারাজ যে তাঁহাকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন তাহা একবারে বিস্মৃত হইয়া, তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কতকগুলি স্বজাতীয় উদ্ধতস্বভাব সহচর সংগ্রহ করেন। এই পররাজ্যাপহারক দস্যু চোল রায় সেই সকল অনুচর সমভিব্যাহারে খোগং নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। চোল রায়ের দলবল দেখিয়াও মীনারাজের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। সৎকর্ম্মের সহচর সদাচার মিলিয়া উঠে

না, কিন্তু দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে লোকের অভাব নাই। মীনারাজের কুলাচার্য্য আ-সিয়া অকৃতজ্ঞ চোল রায়ের মন্ত্রী হইল। তাহারই—সেই মহাপাষণ্ডেরই—মন্ত্রণায় দিবালীর দিন সেই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার সংকল্প স্থির হইল। প্রাচীন প্রথানুসারে রলুন্‌সিরাজ দিবালীপর্ব্বোপলক্ষে স্বগণসমভিব্যাহারে এক সরোবরে জল-ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি ভ্রমেও জা-নিতে পারেন নাই যে তাঁহার জন্মের মত জলক্রীড়া শেষ হইবার সময় উপস্থিত হই-য়াছে। এদিকে উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া অকৃতজ্ঞ কচ্‌বহ যুবক স্বগণ-সমভিব্যাহারে ঐ সরোবরে সমুপস্থিত হইলেন এবং হ-ঠাৎ আক্রমণ পূর্ব্বক মীনারাজকে সবংশে নির্ব্বংশ করিয়া খোগাং নগর অধিকার করিলেন। বিশ্বাসঘাতক কুলাচার্য্যও তাঁ-হার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। "যে ব্যক্তি একজন উপকারকের প্রতি অবি-শ্বাসী হইতে পারে, সে অপরের নিকট কোন অংশেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।" এই কথা বলিয়া চোল রায় স্বহস্তে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। আমরা বলি কুলাচার্য্য মহাশয়ের উপযুক্ত পুরস্কার হইয়াছিল। তিনি যেমন নরাধম, তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে পরিণামে বিপদের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। সহস্র সৎকর্ম্মেও এ কলঙ্ক-টীকা অপনীত হইবার নহে। চোলরায় এবম্প্রকারে কলঙ্ক-ডালি শিরে ধারণ ক-রিয়া ঢুণ্ডার রাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। ঢুণ্ডারের অধিকাংশ স্থান প্রধান মীনাজা-তীয় অধ্যক্ষের অধীন ছিল, খোগাং পতনে সমগ্র রাজ্যের মূলভিত্তি কম্পিত হইয়া উঠিল।

বর্ত্তমান জয়পুর নগরের প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে বানগঙ্গা নদীতটে দে-ওসা নগরে একজন বগুজর বংশীয় রাজ-পুত রাজা বাস করিতেন। তাঁহার এক-মাত্র দুহিতা ছিল, চোলরায় তাঁহার পাণি-গ্রহণ প্রার্থনায় তথায় উপস্থিত হইলেন। দেওসারাজ এই বলিয়া চোল রায়ের প্রা-র্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, 'আমরা উভয়েই সূর্য্যবংশীয়, এবং অদ্যাপি এক পুরুষ অতিক্রান্ত হয় নাই। অতএব এ বিবাহ শাস্ত্রনিষিদ্ধ। আমি এরূপ শা-স্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম অনুমোদন করিতে পারি না'। * পরিশেষে বিচার দ্বারা শাস্ত্র বি-

* বগুজর বংশীয়েরা রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র লবের বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। বগুজর কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে রাম হইতে বিক্রম পর্য্যন্ত ছাপ্পান্ন পুরুষ এবং নল হ-ইতে চোল রায় পর্য্যন্ত তেত্রিশ পুরুষ ব-লিয়া লিখিত আছে। পূর্ব্বে লিখিত হ-ইয়াছে, ৩৫১ সংবৎ অর্থাৎ বিক্রমের ৩৫১ বৎসর পরে নলরাজ নিষধ নগর প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষণে দেখা উচিত যে বিক্রম হইতে নল পর্য্যন্ত কয় পুরুষ হইতে পারে। যদি প্রত্যেক রাজার রাজত্ব কালের গড়্‌পড়্‌তা বাইশ বৎসর ধরা যায় (এই রূপই প্রায় সমস্ত রাজ্যে ধরা হইয়া থাকে)

মোধিতার অপনয়ন হইলে দেওসাধিপতি চোল রায়ের সহিত আপনার রূপলাবণ্যবতী কন্যার বিবাহ দিলেন, এবং পুত্র সন্তানের অভাবপ্রযুক্ত জামাতাকে রাজ্য পর্য্যন্ত সমর্পণ করিলেন। এক্ষণে চোল রায় খোগাং ও দেওসা উভয় সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। সুতরাং তাঁহার দলবলও অত্যন্ত প্রবল হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যলাভ লালসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই সময়ে মীনাজাতীয় সেরো সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ নাথুরাও মৌচ নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া সুখে রাজ্য করিতেন। তৎপ্রতি চোল রায়ের লোভ পড়িল। দলবলসহ মৌচ নগর আক্রমণ ক[রিয়া] জয়ী হইলেন, এবং খোগাং অপেক্ষা মৌচ নগরের সমধিক শোভা দর্শনে [তথায়] রাজপাট সংস্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব্বপুরুষ পুরুষ-প্রধান রামচন্দ্রের নামে ঐ নগরের নাম রামগড রাখিলেন। এক্ষণে চোল রায় চুণ্ডার রাজ্যের মধ্যে খোগাং, দেওসা ও মৌচপ্রদেশের অধিকারী হইলেন।

ইহার পর চোলরায় আজমীরাধিপতির রূপলাবণ্যবতী দুহিতা মরোণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পত্নী এ সময়ে জীবিতা ছিলেন কিনা তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। আমরা তাঁহার গর্ভস্থ কোন সন্তানের ও পরিচয় পাই নাই। একদা চোল রায় মরোণী মহিলাসহ জম্বাহী-মাতা দেবীর পূজাবন্দনাদি করিতে গমন করিয়া ছিলেন। মীনাজাতিদিগের তাঁহার উপর জাতক্রোধ ছিল তাহারা উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া একাদশ সহস্র সৈন্য সমবেত করিয়াছিল। তাহারা সকলে প্রত্যাগমন কালে চোল রায়কে আক্রমণ করিল। তাঁহার সহিত অধিক সৈন্যসামন্ত ছিলনা, তথাপি পলায়নপরাঙ্মুখ হইয়া রাজপুতবীর্য্য শত্রুদলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। শত্রুশোণিতে সমরাঙ্গন প্লাবিত করিয়া অবশেষে তাহাদের হস্তেই জীবনলীলা সমাপন করিলেন। মরোণী স্বামীশোকে নিতান্ত ক্লান্তা হইয়া অবশিষ্ট সহচরগণ সমভিব্যাহারে স্বদেশে পলায়ন করিলেন। তৎকালে তিনি অন্তর্ব্বত্নী ছিলেন। কনখল নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চুণ্ডারদেশের অনেক অংশ মীনাদিগের হস্ত হইতে অপহরণ করেন। তাঁহার পুত্র মৈদল রাও পিতৃদৃষ্টান্তানুসারে চুণ্ডারের অনেক অংশ হস্তান্তর করেন। মীনাজাতীর প্রধান সম্প্রদায়ের নাম সুসাবত. ঐ সুসাবতসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ভট্টুরাও অম্বরে বাস করিতেন, তিনিই মীনাজাতীর সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। মৈদলরাও তাঁ-

তাহাহইলে ষোড়শ পুরুষ মাত্র ব্যবধান দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ৫৬+১৬+৩৩=১০৫ পুরুষ হইল। রাম হইতে চোল রায় পর্য্যন্ত একশত পাঁচ পুরুষ ব্রগুভর.বংশে বিবাহ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

হাকে পরাজিত করিয়া অম্বর অধিকার করেন এবং মীনাজাতীয় নন্দল সম্প্রদায়কে পরাভূত করিয়া গাটুঁঘাটী প্রদেশ নিজ অধিকারে সংযোজিত করিলেন।

মৈদনবাও পরলোক গমন করিলে পর তদীয়পুত্র হুনদেব সিংহাসনে আরোহন করিলেন। তিনিও পিতৃপুরুষদিগের দৃষ্টান্তানুসারে অনেক মীনাসম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করিলেন। তদীয় পুত্র কুন্তলদেব রাজধানীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া ছিলেন। তিনি ভট্টবর প্রদেশের চোহান বংশীয় নরপতির কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষে তথায় গমন করিতে উদ্যত হইলে তাহার মীনা প্রজারা একবাক্যে কহিল যে অধিকারের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে নহবৎ প্রভৃতি রাজচিহ্ন তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিতে হইবে। কুন্তলদেব এতদ্বাক্যে অস্বীকৃত হইলে একটি সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে মীনা জাতীর সমগ্র ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই সময় হইতে সমগ্র ঢুণ্ডার রাজ্য মধ্যে চোলবাসের বংশীয়দিগের আর দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। (ক্রমশঃ।)

অমৃতে গরল।

জগতের নিয়ম অতি অদ্ভুত। যাহা যত আবশ্যকীয় সংসারে তাহার তত অনাদর, আর যাহা যত অপ্রয়োজনীয় তাহার মূল্য ও আদর তত অধিক। মৃত্তিকা ভৃণ লৌহ এবং হীরক, কাচ ও মূল্যবান প্রস্তর তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। আমরা মুহূর্ত্ত জন্য মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিতে পারি না, ভূমি আমাদের আধার, অবলম্বন ও চিরসঙ্গী। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া মানব গণ আজীবন ভূমিতেই বিচরণ করে, গৃহ নির্ম্মাণ হইতে আরম্ভ করিয়া আহার্য্য বস্তুর উৎপাদনাদি জীবন ধারণোপযোগী সমস্তই মৃত্তিকায় সম্পন্ন হয়, অথচ মৃত্তিকার কত অনাদর। ভুবনীয় বস্তু সকলের উপমেয় 'মাটি বা কাদা' অনাদৃত পদার্থ 'লোষ্ট্র'! প্রকৃতি প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্তিকাকে পদ মর্দ্দিত ও অনাদৃত হইবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। লৌহ আর একটি উপকারী বস্তু। যে গৃহে বসিয়া আছি তাহা প্রস্তুত করিতে, যে অন্নে শরীর রক্ষা করিতেছি তাহা ভূমি হইতে উৎপাদন করিতে, যাহাতে আত্মরক্ষা হয় এমন অস্ত্র গঠনে, এমন কি যে লেখনীটি হস্তে লইয়া লিখিতেছি, যে বাক্সটির উপর কাগজ রাখিয়াছি, যে কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছি এ সমস্ত বস্তু প্রয়োজনোপযোগী করিতে লৌহই প্রধান সাধন। অথচ লৌহের মূল্য অল্প, লৌহ

অপরিস্কৃত ও অনাদৃত। কুরূপ পুরুষ 'লোহার কার্ত্তিক!' কঠিন হৃদয় 'লৌহ হৃদয়।' এইরূপ তৃণ ও আমাদের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের অবলম্বন হইয়া ও অনাদৃত ও অবমানিত হইয়া আছে। তৃণ এত সামান্য যে যাহা আমরা সামান্য বোধ করি তা-তাহাই তৃণ। আবার অন্যদিকে হীরকাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। হীরক দুষ্প্রাপ্য ও বহু মূল্য। বাহিক সৌন্দর্য্য ভিন্ন তাহার গুণ নাই, কাচ কাটা ভিন্ন কার্য্য নাই; অথচ সম্রাটগণ পরম যত্নে তাহা মস্তকে ধারণ করেন। কাচ এবং মরকতাদি প্রস্তরের ও সেই অবস্থা।

অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর অনাদর দেখিয়া চিন্তাশীল চিত্ত ব্যথিত হয়, এইমাত্র। তাহাতে সমস্ত জগতের ক্লেশ হয় না।- কিন্তু অমৃতে গরল উৎপাদন হইলে তাহাতে পৃথিবীর সকলেরই ক্ষোভ ও পরিতাপের কারণ হয়। কবিগণ প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের সৌন্দর্য্যে ও সুগন্ধে মোহিত হইয়া সরল হৃদয়া গুণবতী ললনার হসিত মুখশ্রীর সহিত তুলনা করেন, আবার বৃক্ষে ও বৃন্তে কণ্টক নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় পরিতপ্ত হয়। সৌদামিনীর ভুবনমোহিনী রূপরাশি মেঘ মধ্যে লীন হইলে, পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত দেখিলে, অথবা সবুজ শোভিত ক্ষেত্র সকল নৈদাঘ তাপে দগ্ধ ও হতশ্রী হইয়া গেলে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হয়। প্রাবৃটের পূর্ণ সরোবর হইতে জল কমিয়া গেলে তিনি মনে কষ্ট অনুভব করেন, শিশিরে বৃক্ষ সকল পত্রহীন হইলে তাঁহার মন ক্লিষ্ট হয়। গাঢ় অন্ধকার রজনীর অথবা গভীর গিরিগহ্বরের গম্ভীর ভাব যখন তাঁহার হৃদয়কে উন্নত চিন্তায় নিমগ্ন করে, তখন তিনি দূর নিকুঞ্জের কোকিল কুজনে কর্ণপাত করিতে অনিচ্ছুক হন, এবং প্রকৃতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থায় নূতন নূতন সুখ ও বিবিধ প্রকার ক্লেশ অনুভব করেন। তিনি কবি, বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ উভয়ই তাঁহার ক্রীড়ার নিকেতন। তাঁহার চিন্তা ও ভাব সকল সামান্য বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কাব্যের সাহায্য না লইয়া কবির প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া, এই গদ্যময় পৃথিবীর কার্য্যকলাপের প্রত্যেক অধ্যায়ে পদ্যময় মহাকাব্য অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ, অনেক আমোদজনক ও দুঃখ জনক বিষয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে একথা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই সুখাগার সংসারামৃতে কত গরল আছে তাহার পরিমাণ করিয়া উঠা কঠিন। কিন্তু ভ্রান্ত মানব আজীবন সে গরলই অমৃত বলিয়া সেবন করে।

দম্পতী অপত্য লালসায় সর্ব্বদা ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। দয়াময় পরমেশ্বর সদয় হইয়া একটি পুত্র সন্তান প্রদান করিলেন। বালকটি এক দুই তিন দিন করিয়া বাড়িতে লাগিল। তাহার শান্তোজ্জ্বল রূপরাশি, সুধাময়ী দৃষ্টি এবং

বিশ্ববিমোহন সহাস্য বদন জনক জননীকে প্রফুল্ল করিতে লাগিল। প্রস্ফুটোন্মুখ পঙ্কজের মনোহারিণী শোভার ন্যায় শোভমান বদনকমলে, সুকোমল পলাসপুষ্পের পলাসবৎ রক্তিমাভ অধরে যখন মৃদু মধুর আধ আধ মা, বা প্রভৃতি সুধাকণা প্রকাশ পাইতে লাগিল তখন তাহার ভাগ্যবতী জননী ও সৌভাগ্যশালী জনক যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন তাহা অভিনব কুমারলাভকারী ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন; আর ঈশ্বর যাহাদিগকে সেই অপার্থীব রত্নে বঞ্চিত করিয়াছেন কল্পনার অতুল্য তুলীতে সেই চিত্র চিত্রিত করিলে তাঁহারা আরও অধিক বুঝিতে পারেন। সেই পার্থিব স্বর্গ, সেই নন্দন কানন, সেই জীবন-পারিজাত তাঁহাদের জীবনের অমৃতসিন্ধু,—অনন্ত, স্রোতময় এবং নিত্য। কিন্তু হায়! সেই অমৃতসমুদ্র মথিত হইয়া যে গরল উঠিতে পারে সংসারসার মানবগণের তাহা কি মনে হয়? নির্দ্দয় কালকীট তাঁহাদের হৃদয়নিহীত ঐ কুসুমটির বৃন্ত ছিন্ন করিলে তাঁহাদের যে কি অবস্থা হইবে তাহা কি তাঁহারা স্মরণ করেন? লোকে মক্ষিকার বৃথা দোষ দেয়, মক্ষিকা অমৃতভাণ্ডে অন্ধের ন্যায় প্রবেশ করিয়া লোভজন্য আত্মজীবন বিনাশ করে, মানবগণ কি তাহা করে না? সংসার সেই অমৃতভাণ্ড, ইহাতে যে প্রবেশ করিয়াছে তাহারই জীবন মোহে পর্য্যবসিত হইবে।

আবার দেখ, সেই তনয়টি বড় হইতে লাগিল। জ্ঞান ও ধর্ম্মে তাহার আস্থা উন্নত হইল। সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপন জনক জননীর সেবা করিতে লাগিল। তাঁহাদের হৃদয়ে কেমন সুখ। 'লালভাবিত' ও 'পুত্রপণ্ডিত' উভয়ই অমৃত। কিন্তু অমৃতেও গরল আছে। হঠাৎ তাহার হৃদয়ে দুষ্প্রবৃত্তি ও দুরাশার সঞ্চার হইল। পিতৃভক্তি হৃদয়ে আর স্থান পায়না, কৃতজ্ঞতার ভাব আর মনে হয় না। এই রূপে, পাপাত্মা আরংজিব যখন নিশীথ সময়ে প্রজাবৎসল শান্ত স্বভাব ধার্ম্মিক সম্রাট আপন জনক বৃদ্ধ সাজেহানকে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের জন্য কারারুদ্ধ করিয়াছিল তখন কি পিতৃহৃদয়ের অমৃতসমুদ্রে গরল উত্থিত হয় নাই? যখন ভ্রান্তবুদ্ধি উদ্ধতস্বভাব পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞা পালন জন্য, দয়া, ধর্ম্ম, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, মমতা বিসর্জ্জন দিয়া আপন জননীর শিরে কুঠারাঘাত করিয়াছিল; যখন পাপপরায়ণ রোমসম্রাট অজাতশ্মশ্রু অনাগতবুদ্ধি বালক রাজ্যলালসায় আপন জননীর শিরচ্ছেদ করিয়াছিল তখন কি অমৃতে গরল প্রকাশ পায় নাই? যেমন প্রদীপের এক পিঠ আলো, তেমনই জগতের একদিকে অমৃত অন্য দিকে গরল। এই কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাওয়া অসাধ্য। বালক বালিকাগণ পিতা মাতার স্নেহসাগরে ভাসমান হইয়া যে অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে তাহাও সর্ব্বদা অবিকৃত নয়। জগ-

তের এই অখণ্ডনীয় নিয়মের সত্যতাপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ কতশত বালক বালিকা যে অসময়ে সংসারানলের অসহ্য তাপ তাপিত হইয়াছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বিমাতার বিপরীত মন্ত্রণার ভক্তিভাজন জনকের আজ্ঞাক্রমে নব যৌবনের প্রথম সময়, সুখের প্রভাবকাল, শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্য্যা জানকীর সহিত মহারণ্যে যাপন করিলেন। যে পিতা জ্ঞানোপদেশ প্রদান পুর্ব্বক তনয়ের হৃদয় কন্দর আলোকিত করিবেন, ধর্ম্মবিষয় শিক্ষাদান করিয়া পার্থিব অমৃত পান করাইবেন তিনি কত সময়ে আপন সন্তানদিগকে দুরাশামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এবং অসৎবিষয়ে শিক্ষাদান করিয়া তাহাদের সুখামৃতে গরল উৎপাদন করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে দুর্য্যোধনাদির পতন এবং হস্তীনার রাজবংশ বিনাশ এ সমস্তই ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রণার বিষময় ফল। সংসার এমনই আশ্চর্য্যস্থান যে ইহাতে জননী কর্ত্তৃক পুত্রহত্যাও অনেক সময় প্রত্যক্ষ হয়।

বাল্যকাল অজ্ঞানাবস্থায় অতিবাহিত হয়। যদি বল " বালক সুখ দুঃখ কিছুই বুঝিতে পারে না, ক্ষুধাপাইলে ক্রন্দন করে, নতুবা অন্যের দুঃখের সময় ও হাসিতে থাকে। সেই সর্ব্বাপেক্ষা সুখী " তাহা হইলে মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ থাকে না। অস্তগমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায় বৃদ্ধের জ্ঞান অপেক্ষাকৃত স্থির, শান্ত এবং সুন্দর হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া এবং রক্তিমাক্ত মেঘমিশ্র কিরণ মালারন্যায় সেই অভিজ্ঞতা চিন্তামিশ্র বলিয়া সুখকর নহে। মানব জীবনে যদি সুখের সময় থাকে তবে সে যৌবনকাল। যৌবনই মানব জীবনের অমৃত। যখন জ্ঞানতৃষ্ণা প্রবল থাকে, মনোবৃত্তি গুলি বিকাশ প্রাপ্ত হয়, মধ্যাহ্নের প্রকৃতির ন্যায় জীবনের চতুষ্পার্শ্ব উজ্জ্বল বোধ হয় সেই সময়ই সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময়। শরীর বলিষ্ঠ ও কার্য্যক্ষম, মন সতেজ ও প্রফুল্ল, আশা অনন্ত, সকলই মনোহর, সুতরাং মানব জীবনে যৌবন সুখের কাল। যুবক যাহা মনে করে তাহাই করিতে পারে, অসাধ্য সাধন করিতে পারে সুতরাং সে সুখী, তাহার জীবন অমৃতময়।

কিন্তু যে কবি প্রমিথিয়সের ও ইপিমিথিয়সের সহিত মানবজীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখময় করিয়াছেন, যিনি আদমের স্ত্রী ইভের প্রলোভনে আদমের সহিত পৃথিবীস্থ সকলের জীবনের পাপ ও দুঃখ আনয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানিতেন যৌবনামৃতেও গরল আছে। যেখানে যত সুখ সেখানে তত দুঃখ, যত হাসি তত কান্না, অমৃত যত গরলও তত। যৌবনে সৎপ্রবৃত্তি সতেজ হয় সত্য, কিন্তু কুপ্রবৃত্তি নিদ্রিত থাকে না। পাপপথ সহজ, সেদিকের আকর্ষণও অধিক। এই জন্য যৌবনে অধিকাংশ লোকের চিত্ত কলুষিত হয়। গ্রিসের রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত

পেরিক্লিশ এল্‌সিবাইডেস নামক একটি রূপবান ও বুদ্ধিমান বালককে প্রতিপালন করেন । তাঁহাকে শিক্ষিত করিতে সক্রেটিশের বিজ্ঞান বুদ্ধি ও তাঁহার রাজনীতি শাস্ত্র উভয় মিলিত হইয়াছিল । এল্‌সিবাইডেসের ন্যায় বীর সদ্বক্তা, সুশ্রী, সুচতুর পুরুষ গ্রীসে আর ছিল না । তিনি যেখানে যাইতেন সেইখানেই দেবোপম পূজালাভ করিতেন । তাহার সুখ সরোবর পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল । দেশশুদ্ধ সকলে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিল । কিন্তু সে সুখের সাগরে তরঙ্গ বাঁধিল, সে চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইল, সে সুখতরণী ডুবিয়া গেল । যে বুদ্ধি সুপথে ছিল তাহা কুপথে ধাবিত হইল ; তিনি আপন দেশের হিতব্রত পরিত্যাগ করিয়া স্বজাতীয় সকলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন । পরিশেষে সেই গৌরবও পাপময় জীবন, কলঙ্কিত পূর্ণচন্দ্র কি ফ্রিয়ার ক্ষুদ্র পল্লীতে হৃদয়বিদারিণী অবস্থায় পর্য্যবসিত হইল । আথেন্সবাসী টাইমন যে ভাবে মনুষ্যগণের বন্ধু হইয়াও পরিশেষে তাহাদের শত্রু হইয়াছিলেন, তাহাও কাহারও অবিদিত নাই । বাইরণের জীবন আর একটি দৃষ্টান্ত । এইরূপে মানবজীবনের বসন্ত কালেও দুঃখশিশিরসম্পাত সম্ভবপর । সেই পবিত্র অমৃতেও গরল উঠে ।

বৃদ্ধ পুত্র কন্যাদি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে যে কিছু সুখ কল্পনা করা যায় সকলই সম্ভোগ করিলেন । সম্মুখে যোগ্য পুত্র তাঁহার জীবনের অবলম্বস্বরূপ, তাঁহার সমস্ত আশার সজীব প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ । কিন্তু সহসা সেই সুখের আকাশে কাল মেঘ উঠিয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া, মৃত্যু ভীষণবেশে শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দণ্ডচালনা করিতে লাগিল । পূর্ব্ব স্মৃতি অভ্রান্ত দর্পণের ন্যায় জীবনের অনুষ্ঠিত পাপকার্য্য গুলি একটি একটি করিয়া নয়নের সম্মুখে উপস্থিত করিতে লাগিল । ওঃ । কি শোচনীয় অবস্থা । জীবনের সহায়, চিরবিশ্বাসী স্মৃতিশক্তির কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা, কি ভয়ঙ্কর কার্য্য । যে জীবন এতকাল শারদীয় রজনীর ন্যায় শরৎসখীর কৌমুদী সম্ভোগ করিতেছিল, নিদাঘের পবনমাধুর্য্যে, বসন্তের কুসুমসুষমায় প্রীত হইতেছিল তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল । তাহার জীবনামৃত গরলময় হইল । 'উল্‌সি' 'ক্রমোয়েল' 'ধৃতরাষ্ট্র' প্রভৃতির পরিণাম এইরূপই হইয়াছিল ।

সমুদ্র মধ্যদিয়া অর্ণবারোহণে গমন সময়ে অনুকূল বায়ুতে যেরূপ সহায়তা করে এই সংসার সমুদ্রে প্রণয়িনী সহধর্ম্মিণীর পক্ষে অনুকূল স্থিরপ্রসাদ স্বামী ও তদ্রূপ । প্রাণেশ্বর সরল ও সদয় হইলে স্ত্রীর যে কত সুখ তাহা প্রতিকূল স্বামির সতী স্ত্রী ভিন্ন অন্যের বুদ্ধিগত হইবার নয় । যাহার মর্ম্মস্থলে অসদ্ভাবজনিত ক্লেশ অনুভূত হইয়াছে সে ভিন্ন অন্যে কেমন

করিয়া বুঝিবে? যে চিরকাল অনুকূল স্বামীর স্নেহ-সুখ অনুভব করে, স্বামী প্রতিকূল হইলে যে তাহার কত ক্লেশ হইত সে তাহা বুঝিতে পারে না। সুখীর সুখ বুঝিতে দুঃখীর কল্পনাই উপযুক্ত মধ্যস্থ।

যে পুণ্যশীল মহাত্মা সুন্দরী সতী সহধর্ম্মিণীর সারল্যশোভিত হৃদয়রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি প্রিয়বাদিনী ও প্রিয়কারিণী প্রণয়িনীর শরীরের ও মনের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত থাকেন, যাঁহার সুখ বিশুদ্ধ ও হৃদয় পবিত্র, তাঁহার কি দেবজনকমনীয় অবস্থা। প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর অবিরামবাহিনী ধারাসকল তমালতালীবিরাজিত নবলতাপরিবেষ্টিত নিভৃত নিকুঞ্জ প্রফুল্ল করিয়া যেমন তরতর নাদে প্রবাহিত হয়, সেই ললনার প্রণয়ধারা প্রণয়কান্তের শান্তি নিকেতন হৃদয় তেমনই স্নিগ্ধ ও উৎফুল্ল করিয়া অবিরামধারায় বহিতে থাকে। প্রকৃত দাম্পত্যপ্রণয় অপার্থিব মহারত্ন। সেইরত্ন রাজার গৃহেও দুর্লভ, অথচ তাহাতে সময়ে সময়ে অতি সামান্য পর্ণকুটীরও আলোকিত হয়। জায়া পতি উভয়ে উভয়ের সর্ব্বস্ব, উভয়ে উভয়ের শিরোরত্ন। "তত্তস্য কিমপিদ্রব্যং যোহিহি যস্য প্রিয়োজনঃ।" যখন নবীন প্রণয়ের প্রমত্ত করমাধুর্য্য নবপরিণীত দম্পতীকে পৃথিবীতে স্বর্গসুখ প্রদান করে, যখন স্বাতিনক্ষত্রের বারিবিন্দুবৎ সামান্য কথা গুলিও পরস্পরের নিকট প্রত্যেক লক্ষ মূল্যবান করিয়া তুলে, তখন কি অনির্ব্বচনীয় সুখ! প্রিয়তমার শরীর স্পর্শে প্রেমবিহ্বল রামচন্দ্র যেমন বলিয়াছিলেন—

"বিনিশ্চেতুং শক্যোন সুখমিতিবা দুঃখমিতিবা
প্রবোধং নিদ্রাবা কিমু বিষবিসর্পং কিমুমদং।
তবস্পর্শে স্পর্শে মমহি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ।"

পবিত্র প্রণয়ী অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে সেইরূপ ভাব সর্ব্বদাই অনুভব করেন।

"অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যোরসঃ।
কালেনাবরণত্যয়াৎ পরিণতে যৎস্নেহসারেস্থিতং
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎপ্রাপ্যতে।"

এই দেবদুর্লভ প্রণয় কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। প্রণয়ীযুগলের শরীর ভিন্ন হইয়া ও মনের মিলনে দুইকে কেমন এক করিয়া ফেলে! পরস্পরের অস্তিত্ব কেমন পরস্পরে লীন! যেমন তারসংযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের একটি তার করস্পৃষ্ট হইলে সমীপস্থ অপরটিও ধ্বনিত হইয়া উঠে, শোক, দুঃখ, সুখ, সম্ভোগ, হর্ষ, বিষাদ, আমোদ, প্রমোদ প্রভৃতি সেইরূপ উভয়ের হৃদয় এক ভাবে যুগপৎ ব্যাপ্ত করে। বিশ্রা-

তের গতি, চক্ষুর নিমেষ, কল্পনার রথ কিছুই তত দ্রুত নয়। এরূপ সুখের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে কাহার স্বর্গ লাভের বাসনা হয়? পার্থিবসুখের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া কে আর অন্য বিষয় মনে করে? যখন প্রণয়ের গম্ভীর নদী প্রশান্তভাবে প্রবাহিত হয়, তখন সৈকতস্থ চিন্তাকণা সকল কেন না বিধৌত ও বিদূরিত হইবে? সেই আতটপূর্ণা কল্লোলিনীর সৌম্যমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কে তাঁহায় তটাভিঘাতিনী মনে করে?

কিন্তু মনুষ্যের দুর্ভাগ্যক্রমে সে নদীতেও তরঙ্গ আছে, সে আকাশেও বজ্র আছে, সে অমৃতেও গরল আছে।

মহারাজ রামচন্দ্র পার্থিব সমস্ত সুখের অধিকারী হইয়াও আপন প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পত্নীর বিরহযন্ত্রণায় কত দগ্ধবিদগ্ধ হইয়াছিলেন, রোমাধিরাজ টাইটস্‌ও লোকরঞ্জনানুরোধে প্রিয়া ইহুদিতনয়াকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া অপরিসীম কষ্ট পাইয়াছিলেন।

প্রণয়ের রম্যকাননের পবিত্রপুষ্প সুন্দর হইলেও অনিত্য; সুগন্ধি হইলেও কণ্টকযুক্ত, মধুময় হইলেও বিষমিশ্র। সন্দেহ ও ঈর্ষার বায়ুতে অনবরতঃ আন্দোলিত এবং বিরহাদি নির্ম্মম কীট সকলের ভীষণ দংশনে জর্জ্জরিত হইয়া সেই কুসুমগুলি অকালে শুষ্ক হইয়া যায়। আবিলার্ডের জন্য সমস্ত সুখ উৎসর্গ করিয়া ইলাইজার কি অবস্থা হইয়াছিল। অথেলোর হৃদয়শশী ডেসিডিমোনা কিরূপে অস্তমিত হইয়াছিল, এবং রোমিও ও জুলিয়েট্‌ কিরূপ অবস্থায় জীবনের অবসান করেন পাঠক মনে করিয়া দেখুন। অমৃতের প্রতিবিন্দুই গরলমিশ্র।

মৈসরললনা ক্লিয়োপেট্রার পঙ্কিলজীবনসরোবরের অচিরস্থায়ী সুখকমল শীঘ্রই পর্য্যুষিত হইয়াছিল; রাজ্ঞী মেরীও আপাতমধুর পরিণামবিষে জীবন উৎসর্গ করিয়া পৃথিবীর নিকট অকালে বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। একদিকে পবিত্র আদর্শ পতিব্রতা পদ্মিনী প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, অন্যদিকে সেরখাঁ আফগানের সুন্দরী ললনা স্বামীবধের কারণ হইয়া বিলাসবাসনা চরিতার্থ করিলেন। কিন্তু যে যেরূপ ভাবেই অমৃতপান করুন না কেন পরিণামবিষ সকলের ভাগ্যেই ঘটিল।

দৃষ্টান্তবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যে সকল শোচনীয় অবস্থা প্রতিদিন আমাদের নয়নগোচর হইতেছে, তাহাতে অমৃতে গরল কে না দেখিতে পান? বালবিধবার বারিশূন্য মরুময়জীবনে সুখবারির অভাবে হৃদয়ভেদী ত্রাহি ত্রাহি শব্দে কাহার না চিত্ত ব্যথিত হয়। সেই অতুল্য বেলপুষ্প নিদাঘরবির প্রচণ্ডকিরণে শুষ্ক দেখিয়া কে না ক্লেশ অনুভব করে। জীবনের সুখপ্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া যে সমস্ত হতভাগা যুবক উন্মত্তবৎ দেশে দেশে বিচরণ করে, তাহাদের সুখময় অতীতজীবনের তুলনায় সেই ভয়াবহ সময় কি গরলময় নয়?

কালের কঠোরশাসনে জীবনবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেলে প্রণয়ীযুগলমধ্যে যে জীবিত থাকে তাহার অবস্থা যত কষ্টকর, উভয়ে জীবিত থাকার সময় একে অন্যকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও অনাদৃত হইলে তাহা হইতেও অধিক কষ্ট। সে যন্ত্রণা অসহ্য,—ভীষণ নরকাগ্নি। শিখগুরু নানক আপন প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সেই হতভাগিনীর হৃদয়ে যত না কষ্ট হইয়াছিল, এণ্টনিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অক্টেভিয়ার কষ্ট তদপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। হেলেনের জগদ্বিখ্যাত রূপমাধুরীতে মেনিলসের জীবন যে পরিমাণে মধুময় হইয়াছিল, পেরিসের আচরণে তাহার সহিত তুলনায় শতগুণাধিক ক্লেশ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। জীবনের সমস্ত সুখ উৎসর্গ করিয়া যাহাকে আপন বলিয়া উপাসনা করা যায়, যে অভীষ্ট দেবতার অনুগ্রহের করে আত্মসমর্পণ করিয়াও তৃপ্তি জন্মেনা এবং যাহার প্রসাদ লাভ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়, সে অকারণে অনাদর করিয়া অন্যের হইলে, উঃ কি ভয়ানক পরিতাপের বিষয় হয়!

"হায়! মরমের কথা আমার স্নেহের লতা
পতিভাবে অন্যজনে প্রাণনাথ বলিল
মরমের ব্যথা মম মরমেই রহিল।"

সংসারের এই অমৃতময় অংশের এক পার্শ্বে এইরূপ ভয়ানক গরল, অন্য পার্শ্বেও হলাহল।

"সখি! কি কব মরম কথা।
প্রণয় ভাবিয়া পাষাণ চাপিয়া
মরমে পাইনু ব্যথা।
কুসুম কলিকা জিনিয়া বালিকা
ছিলাম যখন সই
প্রণয় কেমন জানি নাই আমি
শৈশব আমোদ বই।
মধুকর ভ্রমে বিকাশিনু দল
ভাসিয়া যৌবন জলে
নিদারুণ কীট পশিয়া মরমে
শুকাল বিকচ দলে।
সখি! যায় প্রাণ যায় দংশন জ্বালায়
বাঁচিনে পরাণে আর
জীবন মৃণাল এই ছুরিকায়
কাটিব করেছি সার।"

দুই পার্শ্বে বিষ, মধ্যস্থলে যে অমৃত তাহা নির্ব্বিঘ্নে কে কতক্ষণ পান করিতে পায়? হতাশের আক্ষেপ, বিরহীর বিলাপ, নিরাশ প্রণয়ের আর্ত্তনাদ, বিধবার মর্ম্মঘাতি শোকবাক্য, অনাদৃত প্রণয়ীর পরিণাম, এ সমস্তই হলাহল। কোন্ সৌভাগ্যশীল পুরুষ অথবা সৌভাগ্যশালিনী রমণী এই সমস্ত যন্ত্রণার একটি দ্বারাও পীড়িত না হইয়া সুখে জীবন যাপন করিতে পারেন? দূর হইতে এই রাজ্য শান্তি নিকেতন বোধ হয় সত্য, কিন্তু ঈর্ষা, দ্বেষ, অসন্তুষ্টি, সন্দেহ, ভয়, বিশ্বাসঘাতকতা কলহ প্রভৃতিতে এ রাজ্য [illegible] স্থল, যে ক্ষণেকের জন্যও [illegible] বিশুদ্ধ শান্তি সুখ সম্ভোগ [illegible] হলাহল।

অন্তরের জ্বালা নিবারণ করিতে সৎবন্ধুর আশ্রয় লইলাম। ঝটিকার সময় নৌকা যেমন ‘কোল’ প্রাপ্তে নিরাপদ হয়, প্রবল বাত্যায় আন্দোলিত সংসার সাগরে বন্ধুর আশ্রয়ও তেমনই নিরাপদ স্থান। যখন হৃদয় নানা কারণে উত্যক্ত ও উত্তপ্ত, তখন মৃদুমন্দসমীরণবাহি পুষ্প সৌরভের মধুরতার এবং মলয়ানিলের শৈত্যে বন্ধুর বচনপরম্পরা হৃদয় স্নিগ্ধ করিল। মাতা যাহা পারেন নাই, পিতা যাহা করেন নাই, নিরুপম ভ্রাতৃস্নেহের মধুময় ভাবেও যাহা সাধিত হয় নাই, প্রণয়িনীর প্রণয়োপহারেও যাহা লাভ করা যায় নাই, বন্ধুর সুধাময় বচন মাধুর্য্যে তাহাই সম্পাদিত হইল। সে সুকোমল বাহু যুগলের উষ্ণভাবের সুশীতল আলিঙ্গনে শরীর শীতল হইয়া গেল। “ন রত্নান্বিষ্যতং হৃণাং, নখলু প্রেমচ হ সুহৃজ্জনে।” হৃদয় সখার প্রেমালিঙ্গন জগতে অতুল্য পদার্থ। সুহৃদের তুলনা নাই। চক্ষু যাহাকে সুন্দর দেখে, যাহাকে প্রিয়ভাষী জ্ঞানে কর্ণ সেই বচন সুধা সতৃষ্ণভাবে পান করে, হৃদয় যাঁহার হৃদয়ের অনুপমেয় মধুর চিত্র আগ্রহের সহিত ধারণ করে, সে কতদূর রমণীয় পদার্থ। বন্ধুর অনাদরও মধুময়।

“[illegible], [illegible], দেখায় না মনোহর
[illegible] যদিও কর্কশ
[illegible] বন্ধুই মধুর।”

যে অকপট প্রকৃত বন্ধু আত্মপর ভাব ক্ষণেকের জন্যও হৃদয়ে ধারণ না করিয়া সুহৃদ্‌কে অভিন্ন পরমাত্মবৎ মনে করেন এই পৃথিবীতে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি স্বর্গবাসী। মর্ত্ত্য লোকে তাদৃশ্যকার কদাচিৎ সম্ভবে। যে সৌভাগ্যশালী পুরুষ সেই সুখ লাভ করেন, তিনিও দেব।

মনুষ্যের কপালদোষে সে মধুও বিষমিশ্র। বীরকুলাগ্রগণ্য জুলিয়াস সিজরের পবিত্র বক্ষঃস্থল তাঁহার আশ্রিত এবং তাঁহার অনুগ্রহে প্রতিপালিত ব্রুটস্ যখন শাণিত শস্ত্র বিদীর্ণ করিয়াছিল; নিশীথ সময়ে আপন গৃহে অতিথি ভাবে উপস্থিত নিদ্রিত স্বীয় প্রভু ডনকান্‌কে যখন দুরাচার ম্যাকবেথ্ অতি নৃশংসের ন্যায় হত্যা করিয়াছিল; যখন যুনানের বীরকুঞ্জর কেশরী নিতান্ত নিরুপায় হইয়া আত্ম সমর্পণ করিলে সেই কর্দ্দমনিপতিত কেশরীকে চিরদিনের জন্য কোন দুরাচার স্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়াছিল, তখন কি সে অমৃতে গরল উঠে নাই? মির জাফরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করায় অদূরদর্শী সিরাজের পতন হইল; আরংজিবের প্রতি সর্ব্বথা সন্দেহশূন্য সুতরাং অসতর্ক থাকায় তাঁহার ভ্রাতৃগণ অকালে কাল সদনে গমন করিলেন।

ভ্রাতৃ স্নেহ ও ভ্রাতৃবৎসলতা অমৃতের সরোবর হইলেও তাহা হইতেও গরল উত্থিত হয়। শ্রীরামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণের প্রতি অপরিসীম বাৎসল্য প্রদর্শন করিয়াও যখন লঙ্কাসমরাবসানে গৃহে গমন করিয়া-

ছিলেন, যখন সেই দক্ষিণ হস্ত সদৃশ, জীবনের অবলম্বন পরমোপকারী ভ্রাতার সাহায্য পূর্ব্বের ন্যায় আর আবশ্যকীয় রহিল না তখন তাঁহাকে বর্জ্জন করিয়া এই বিশুদ্ধ সুধায়ও বিষ উৎপাদন করিয়াছিলেন।

মানবগণের অন্য একটি সুখের কারণ রাজার অনুগ্রহ ও রাজভক্তি। রাজার প্রতি প্রজার যত ভক্তি হইবে এবং প্রজার প্রতি রাজার যতই দয়া প্রকাশ হইতে থাকিবে ততই সেই সম্বন্ধ সুখকর হইবে। ধর্ম্মময় যুধিষ্ঠিরের রাজ্যশাসনসময়ে প্রজাগণ অতিশয় সুখে সময় যাপন করিয়াছিল বলিয়া সেই পূত সময়ের কথা এখনও সকলের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। আকবর ও সাজেহান বাদসাহের শাসন সময়ের উৎকৃষ্ট অংশের সহিত কোন্ ভূপতি না নিজের শাসনকাল বিনিময় করিতে বাসনা করেন? লর্ডক্যানিং মহোদয়ের সময়টি কেনা ভক্তির সহিত স্মরণ করে? আবার ঐ সমস্ত সুখের সময়ের সঙ্গে জঙ্গীস্, তৈমুর, নাদীর, আমেদ প্রভৃতির এবং ভয়ানক বিপ্লব বিদ্রোহ অরাজকতা প্রভৃতির তুলনা করিয়া দেখ। শেষের অংশ গরল, প্রথমাংশ অমৃত। যে সময়ে উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল ফরাসি জনসাধারণের মস্তিষ্ক শূন্য মস্তকের আলোড়নে এবং ভ্রান্তি-বুদ্ধির পরিচালনায় সমস্ত ইয়োরোপ কম্পিত হইল, সমস্ত পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল, যখন ফরাসি সম্রাট ষোড়শ লুইর মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল, ফরাসির রাজসিংহাসন রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গেল তখন কি রাজা প্রজার মিলন সুখরূপ অমৃতে গরল উঠে নাই? বিশ্বাস সেই অমৃতের জীবন। রাজা প্রজাকে বিশ্বাস না করিলে সেই অমৃত উভয়ের মধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে না। অন্যদিকে প্রজা রাজাকে ভক্তি না করিলে সেই অমৃত কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। উভয়ের চেষ্টায় উৎপাদিত সুধাকণা যেমন মধুর উভয়ের অপ্রণয়ে তৎসমুদয় আবার সেই পরিমাণে হলাহল।

এই রূপে দেখা যাইতে পারে যে, যাহা যত আদর ও আগ্রহের সামগ্রী তাহাতে তত অসুখ উৎপাদন করে। প্রথমে বলা হইয়াছে যে, আবশ্যকীয় বস্তুর জগতে অনাদর, এক্ষণে দেখা গেল যাহার আদর আছে তাহাতে সাময়িক সুখ হইলেও অসুখ উৎপাদন করে। সুখপ্রিয় স্বাদুবস্তুগুলিন তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত লইয়া প্রয়োজন কি? আঁধার থাকিলেই আলো আছে, দুঃখ থাকিলেই সুখ আছে, একথা স্বীকার করিতেই হইবে। অদৃষ্টচক্রের নেমির আবর্ত্তনে মানবভাগ্যও ভাল মন্দ দুই অবস্থায়ই উপনীত হয়। সংসারের এক [illegible] ভাসিতেছে; জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা, স-

মস্ত অসুখ বিস্মৃত হইয়া সেই অবিরামবাহি সুখস্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া অনন্ত অভিমুখে গমণ করিতেছে, অপর পার্শ্বে তেমনই আবার ভীষণ ও ভীষণতর শ্মশান সমূহ জগৎ আঁধার আঁধার আঁধার করিয়া মৃতের হৃদয়েও যেন ভীতি উৎপাদন করিতেছে। একস্থানে নবপ্রসূত বালকের কল্যাণার্থ মাঙ্গল্য বাদ্য বাজিতেছে, নবদম্পতীর পরিণয় জন্য আমোদে, আনন্দমিশ্র কোলাহলে দশদিক উল্লসিত ও ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে; আবার অন্যস্থানে পুত্রশোকাতুরা জননীর হৃদয়বিদারক শোকসূচক ক্রন্দনধ্বনিতে অথবা নববৈধব্যবিদগ্ধবালিকার হাহাকার শব্দে সংসার উদাস করিয়া উঠাইতেছে। কোন স্থলে প্রণয়ের সুখময়মিলনপ্রতীক্ষায় সুখের দিবাস্বপ্নে দিনযামিনীতে ইতর বিশেষ না করিয়া প্রণয়ীগণ সময় উদ্যাপন করিতেছে, অন্যত্র নিরাশ প্রণয়ের হতাশ শব্দে অথবা অনাদৃত অবমানিত ও কলঙ্কিত প্রণয়ের পঙ্কিল পরিণামে কাহারও জীবন ঘৃণায় অবসাদিত হইতেছে। একদিকে আশা মৃদুমন্দ পাদক্ষেপে স্বর্গীয় বিদ্যাধরীর ন্যায় মধুর হাসি হাসিয়া তালে তালে নৃত্য করিতেছেন, পুলকবিস্ফারিত নয়নের মোহিনী ভঙ্গিতে সকলের মন মোহন করিতেছেন, অন্যদিকে কপোল দেশে হস্তার্পণ করিয়া আকাশস্তব্ধনয়নে নিরাশার শীর্ণ বিশীর্ণ ধূসরিত কলেবর সকলের মনে ভীতি উৎপাদন করিতেছে। একদিকে প্রকৃতির প্রিয়তম প্রদেশ সকল জাতি, জুতি, বকুল, মালতী, গোলাপ, পঙ্কজ প্রভৃতি মনোহর কুসুম শয্যায় সুশোভিত আছে, পুংস্কোকিলের মধুর কূজনে শ্যামা বুলবুলের মোহন ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক উৎফুল্ল করিতেছে, অন্যদিকে সাহারার ভীষণ মরুভূমিতে জল পিপাসায় ত্রাহি ত্রাহি শব্দে হত ভাগ্য পথিক আর্ত্তনাদ করিতেছে। নিদাঘের নির্ম্মল দিবা ঝটিকায় বিশ্রী করিতেছে, শরতের সুধার কৌমুদী কালমেঘে ঢাকিয়া ফেলিতেছে। রজনী প্রভাত হইতেছে দিবাভাগ আবার তমসীরজনীতে লীন হইতেছে। সংসারে চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অমৃত কণারও অভাব নাই, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে হলাহলও প্রচুর রহিয়াছে। ছায়া যেমন বস্তুর অনুগামী দুঃখও তেমনই সুখের অনুগামী। যে অর্ব্বাচীন ব্যক্তি এই পরীক্ষা ভূমি সংসার ক্ষেত্রে অ[illegible]ত ভাবে বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগের বাসনা করে তাহার চিত্ত কখনও সুখী হইতে পারে না। যাহা কখনও হইবার নয় এরূপ বিষয়ে আশা করিয়া জীবন শান্তিহীন করিলে পাপ ব্যতীত পুণ্য লাভ হয় না, তৃষ্ণা বৃদ্ধি ব্যতীত তাহার সমতা হয় না। যদি সুধাপান করিতে বাসনা থাকে তবে সুদর্শন চক্র দেখিয়া ভীত হইওনা, তাহা হইলে

"সুধা সুরগণ ভোগ্য
অসুরের পরিশ্রম সার
বিকসিত তামরসে অলিগণ উড়ে বসে

ভেক ভাগো কেবল চিৎকার।”

এই কবিতাটি সার্থক হইবে,—চিৎকার করিয়া জীবন ভেকবৎ অতিবাহিত করিতে হইবে। যদি অমৃতপান করিতে অভিলাষ থাকে তবে গরলপানে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত হও। এই সংসারে সুধাপায়ী ধৈর্য্যশীল মহাপুরুষ মাত্রই নীলকণ্ঠ!

শ্রীব্র—

জীবনপ্রভাত।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পৃথুরাণের দুর্গ।

“চলেছে চাহিয়া দেখ,
যোদ্ধা, যোদ্ধা এক এক
কাল পরাজয় করি দেবমূর্ত্তি ধরিয়া।
* * * *
জন্মিবে পুরুষগণ,
বীর যোদ্ধা অগণন,
রাখিবে ভারত নাম ক্ষিতিপৃষ্ঠে আঁকিয়া।”
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬৬৬ খৃঃ অব্দের বসন্তকালে পঞ্চশত অশ্বারোহী ও এক সহস্র পদাতিক মাত্র লইয়া শিবজী দিল্লীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপিত করিয়াছেন, সেনাগণ বিশ্রাম করিতেছে শিবজী চিন্তিত মনে এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিতেছেন। দিল্লী আসিয়া কি ভাল করিয়াছেন? মুসলমানেরা অধীনতা স্বীকার করা কি বীরোচিত কার্য্য হইয়াছে? এখনও কি প্রত্যাবর্ত্তনের উপায় নাই? এইরূপ সহস্র চিন্তা শিবজীর মহৎ হৃদয় আলোড়িত করিতেছে। যোদ্ধার মুখমণ্ডলও গম্ভীর ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত,—বিপদকালে, যুদ্ধকালেও কেহ শিবজীর মুখমণ্ডল এরূপ চিন্তাঙ্কিত দেখে নাই।

শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে কেবল তাঁহার তেজস্বী উগ্রস্বভাব নয় বৎসরের বালক শম্ভুজী ভ্রমণ করিতেছেন, এক একবার পিতার গম্ভীর মুখমণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, পিতার হৃদয়ের ভাব কতক কতক বুঝিতে পারিতেছিলেন।

রঘুনাথপন্থ ন্যায়শাস্ত্রী নামক শিবজীর পুরাতন মন্ত্রী কিছু পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিলেন।

দুইজনে অনেকক্ষণ ভ্রমণ করিতেছিলেন। শিবজীর হৃদয় ভীষণ চিন্তায় বাতিব্যস্ত ও উৎক্ষিপ্ত। অনেকক্ষণ পর তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

‘ন্যায়শাস্ত্রী আপনি কখনও দিল্লীতে আসিয়াছিলেন।’

রঘুনাথ। ‘ বাল্যকালে দিল্লীনগর দেখিয়াছিলাম।’

শিব। ‘ তবে সম্মুখে ঐ বহু বিস্তীর্ণ প্রাচীরের নাম কি দেখা যাইতেছে বলিতে পারেন। আপনি অনন্যমনা হইয়া ঐ দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন কি জন্য ?’

রঘুনাথ। ‘ মহারাজ। ভারতবর্ষের শেষ হিন্দুরাজা পৃথুরায়ের দুর্গ প্রাচীর দেখা যাইতেছে।’

শিবজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ‘ হায়! এই সে পৃথুরায়ের দুর্গ। এই স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই স্থানে তিনি একবার ঘোরীকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হা! ন্যায়শাস্ত্রী।

‘ সেদিন ঐ প্রাচীরের প্রত্যেক স্তম্ভ হইতে বিজয়পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল ঐ যজ্ঞভূমিস্থলে প্রশস্তনগর বিজয়বাদ্য শব্দিত হইয়াছিল, সমরবিজয়ী হিন্দুসেনার কোলাহলে গগনমার্গ বিদীর্ণ হইয়াছিল। সে দিন, হিমালয় হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত হিন্দুবীরগণ সবল হস্তে স্বাধীনতা রক্ষা করিত,—হিন্দুললনাগণ উল্লাসে স্বাধীনতা গান গাইত! কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সেদিন গত হইয়াছে, ঐ পুরাতন দুর্গের নিকট পৃথুরায় অন্যায় সমরে হত হইলেন, পুণ্য ভারতভূমি অন্ধকারে আবৃত হইল! দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুসুম বসন্তে আবার দেখা যায়, ভারতের গৌরব দিন কি আর দেখা দিবে না? একদিন ভরসা করিয়াছিলাম, সেই গৌরবের দিন আবার আসিবে, সে আশা কি ফলবতী হইবে?’

শিবজী অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন; তাঁহার হৃদয় চিন্তায় আন্দোলিত হইতেছিল। অনেকক্ষণ পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, ‘ দেবদেব মহাদেব! যে দিন যবনগণ জয়লাভ করিল, সে দিন তোমার হস্তে প্রচণ্ড ত্রিশূল নিশ্চেষ্ট বা নিদ্রিত ছিল? সংহারক! কেন ধর্ম্মবিনাশিদিগকে সংহার করিলে না?’

রঘুনাথ। ‘ কে বলিবে, কেন? যাহারা হিন্দুরাজ্য বিনাশ করিলেন, তাঁহারা হিন্দু-দেবমণ্ডলীর ও অবমাননা করিতে ত্রুটী করেন নাই;—সেই ভীষণপাতকের প্রমাণ অক্ষয় প্রস্তরে খোদিত আছে, সে পাপের প্রতিশোধ এখনও হয় নাই।’

কম্পিতস্বরে শিবজী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ ন্যায়শাস্ত্রি! আপনার কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কোথায় সে প্রমাণ খোদিত আছে?’

রঘুনাথ, ‘ সন্নিকটে ’ এই বলিয়া অনতিদূরে একটি পুরাতন প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমন্দিরে শিবজীকে লইয়া গেলেন, বলিলেন, চারিদিক অবলোকন করুন।’

শিবজী। ‘দেখিতেছি মধ্যে প্রাঙ্গন, চারিদিকে সুন্দর প্রস্তরস্তম্ভসার! একটি সুন্দর দেবমন্দির ছিল,—কালে ভগ্ন হইয়াছে। দেবের অবমাননা-চিহ্ন কোথায় খোদিত আছে?’

রঘুনাথ। ' তীক্ষ্নদৃষ্টি করুন, এই সুন্দর স্তম্ভসারের একটি স্তম্ভ ভগ্ন হয় নাই, —তাহার উপর অঙ্কিত দেবমূর্ত্তিগুলিও ভগ্ন হয় নাই, কিন্তু নিরীক্ষণ করুন, একটী মূর্ত্তির ও মুখমণ্ডল দৃষ্ট হইবে না। কালে স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিত, ধর্ম্ম-বিদ্বেষী যবনেরা স্তম্ভগুলি রাখিয়াছে কিন্তু সহস্র দেবমূর্ত্তির মধ্যে প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখমণ্ডল মাত্র স্বহস্তে ভগ্ন করিয়াছে! বাসনা, যে দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া চিরকাল দেখিতে পাইবে, যবনগণ হিন্দুদেবের অবমাননা করিয়াছেন,—যত দিন এই অক্ষয় স্তম্ভসার থাকিবে, তত দিন জগতে হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা ঘোষণা করিবে।

" অদ্যাপি সেই পুরাতন মন্দিরের সুন্দর স্তম্ভসার বিদ্যমান রহিয়াছে, অদ্যাপি প্রতিস্তম্ভে বহু দেবমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে,—প্রত্যেক মূর্ত্তির মুখমণ্ডল বিকৃত বা ভগ্ন, প্রথম মুসলমান আক্রমণকারীদিগের ভীষণ ধর্ম্ম-বিদ্বেষের পরিচয় দিতেছে!"

শিবজীর স্বভাবতঃই হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় ভক্তি ছিল, এই স্তম্ভসার দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল। রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী আরও বলিতে লাগিলেন,—

" এ দিকে হিন্দুর অবমাননা, অন্য দিকে যবনের গৌরব! এই যে সম্মুখে উন্নত স্তম্ভ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, এটী কুতবমিনার, কুতবদ্দীনের বিজয় হিন্দুদিগের পরাজয় জগৎমণ্ডলে ঘোষণা করিতেছে! এই দেখুন আলটমশ্ প্রভৃতি যবন রাজাদিগের গোরস্থানের উপর কিরূপ উন্নত সুন্দর প্রস্তর হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে; এই একটী মসজীদ্ প্রস্তুত হইতেছিল, ঐ পুরাতন হিন্দু-দেবালয় ভগ্ন হইয়া উহারই প্রস্তর দ্বারা মসজীদ্ উঠিতেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এইরূপ। সকল স্থানে পরাভূত হিন্দুদিগের গৌরবচিহ্ন একে একে বিলীন হইতেছে, তাহার উপর বিজয়ী যবনের গৌরবস্তম্ভ উত্থিত হইতেছে। এই কুতবমিনারের উপর আরোহণ করুন, মসজীদ্, গোরস্থানের পরে গোরস্থান,—দূরে দিল্লীর অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য প্রাসাদ ও হর্ম্ম্যাবলী লক্ষিত হইবে কিন্তু পুরাকালের হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপুরীতুল্য ইন্দ্রপ্রস্থ বিলীন হইয়াছে,—তাহার একটী স্তম্ভ বা একটী মন্দিরও নয়নগোচর হইবে না।"

নিঃশব্দে শিবজী ও শম্ভুজী ও রঘুনাথপন্থ কুতবমিনারের উপর উঠিলেন,—সেরূপ উন্নত স্তম্ভ বোধ হয় জগতে আর নাই। নিঃশব্দে পূর্ণহৃদয়ে শিবজী চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন;—এই স্থানে কি জগৎবিখ্যাত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল, এস্থানে কি প্রাতঃস্মরণীয় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃসহ বাস করিয়াছিলেন,—এস্থানে কি সেই পুণ্যকালে সেই পুণ্যশ্লোক রাজন্য করিয়া সসাগরা ধরায় আর্য্য-গৌরব বি-

স্থান করিয়াছিলেন, মহর্ষি বেদব্যাস কি এই স্থানে অধিবাস করিতেন? ভীষ্মাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুন, ভারতের অতুল বীরবৃন্দ কি ইহাঁরই নিকট আপনার বীর্য্য প্রকাশ করিয়া অক্ষয় যশোলাভ করিয়াছেন,—কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, ভারতের প্রাতঃস্মরণীয়া ললনাগণ কি এই স্থান পবিত্র করিয়াছিলেন?—শিবজীর বাক্‌শক্তি রোধ হইল, দুই নয়ন দিয়া জল বহিতে লাগিল,—গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিলেন,—

'দেবতুল্য পূর্ব্বপুরুষগণ! আপনাদিগকে প্রণাম করি। আমাদের বাহু বলশূন্য, আমাদের নয়ন তিমিরাবৃত, আমাদের হৃদয় ক্ষীণ। ঐ নীল নভোমণ্ডল হইতে প্রসন্ন হইয়া আলোক দান করুন,—যেন হিন্দুনাম পুনর্ব্বার উন্নত করিতে পারি,—নচেৎ সেই উদ্যমেই যেন মৃত্যু হয়। এ জীবনে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই!'

শম্ভুজীর হৃদয় ও পূর্ণ হইল, তাঁহারও নয়ন হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

শিবজী চারিদিক দেখিতে লাগিলেন, ছয় শত বৎসরাবধি মুসলমানগণ রাজ্য করিয়াছেন, তাঁহার চিহ্ন যেন সেই স্থানে অঙ্কিত রহিয়াছে! অসংখ্য মস্‌জীদ্, অসংখ্য মুসলমান সম্রাটের গোরস্থান, অথবা অসংখ্য ভগ্ন ও চূর্ণ প্রাসাদের অবশিষ্টাংশ সেই কুতব মনার হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত ছয় ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া দেখা যাইতেছে। করাল কাল, হিন্দু ও যবনের মধ্যে বিভিন্নতা জানে না,—শত শত বৎসরে সহস্র সহস্র মানবকীটে যে সমস্ত হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করে, হেলায় ভূমিসাৎ করিয়া যায়।

সেদিক হইতে নয়ন ফিরাইয়া শিবজী পুনরায় সেই পৃথ্বুর দুর্গ প্রাচীরের দিকে দেখিলেন, অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া রঘুনাথের দিকে ফিরিয়া কহিলেন—

'ন্যায়শাস্ত্রী! বাল্যকালে কঙ্কণ প্রদেশের কথা শুনিতাম, পৃথুরায়ের বিষয় যে যে কথা শুনিতাম, অদ্য যেন তাহা নয়নে দেখিতেছি। বোধ হইতেছে যেন ঐ ভগ্ন দুর্গ প্রাসাদপূর্ণ, বহুজনাকীর্ণ, পতাকা ও তোরণ-শোভিত একটি বিস্তীর্ণ নগর! যেন রাজসভায় পাত্রমিত্রবেষ্টিত হইয়া রাজা বসিয়া আছেন—বাহিরে যত দূর দেখা যায়,— পথে, ঘাটে, বাটীতে প্রাঙ্গনে, নদী-তীরে নাগরিকগণ আনন্দে উৎসব করিতেছে। যেন বহুবিস্তীর্ণ বাজারে ক্রয়বিক্রয় হইতেছে,—উদ্যানে লোকে আনন্দে নৃত্যগীত করিতেছে, সরোবর হইতে ললনাগণ কলস ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছে, প্রাসাদ সম্মুখে সেনাগণ সসজ্জ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, অশ্ব, হস্তী, রথ দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও বাদ্যকর সানন্দে বাদ্য করিতেছে। যেন প্রভাতের সূর্য্য এই অপরূপ দৃশ্যের উপর সুন্দর রশ্মি বর্ষণ করিতেছেন,—যেন এমত সময়ে মহাম্মদঘোরির দূত রাজসভায় প্রবেশ করিল।

'অন্যান্য কথার পর দূত বলিল, 'মহারাজ! মহম্মদ ঘোর আপনার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ মাত্র লইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত আছেন তাহাতে আপনার কি মত?'

'মহানুভব চোহান্ উত্তর করিলেন—

'যবে সূর্য্যদেব আকাশে অন্য একটি সূর্য্যকে স্থান দিবেন,—পৃথুরায সেই দিন স্বীয় রাজ্যে অন্য রাজাকে স্থান দিবেন।' রাজবাক্য শ্রবণে জয় জয় নাদে সেই প্রশস্ত প্রাসাদ শব্দিত হইল,—জয় জয় নাদে প্রশস্ত নগর পরিপূরিত হইল!

'দূত পুনরায় বলিল 'মহারাজ! আপনার শ্বশুর মহাশয় মহম্মদ ঘোরের সহিত সন্ধি করিয়াছেন,—আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমান ও রাঠোর সৈন্য একত্রিত দেখিতে পাইবেন।'

'পৃথুরায উত্তর করিলেন, 'শ্বশুর মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাইবেন ও বলিবেন, আমিও স্বয়ং যাইতেছি,—অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিব!'

'অবিলম্বে চোহান সৈন্য ঐ প্রশস্ত দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল,—তেরৌরীর যুদ্ধে যবন ও রাঠোর সৈন্য পৃথুরায়ের সম্মুখে, বায়ুতাড়িত ধূলিবৎ উড়িয়া গেল,—আহত ঘোরী কষ্টে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।'

অনেক পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'রঘুনাথ! সে দিন আমাদের গিয়াছে; কিন্তু তথাপি এস্থানে দণ্ডায়মান হইলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্মরণ করিলে স্বপ্নের ন্যায় নব নব আশা মনে উদয় হয়। এই বিশাল কীর্ত্তিক্ষেত্র চিরদিন তিমিরাবৃত থাকিবে না, ভারতের পূর্ব্বদিন এখনও উদিত হইতে পারে। জগদীশ্বর রুগ্নকে আরোগ্য দান করেন, দুর্ব্বলকে বলদান করেন, জীর্ণ পদদলিত ভারতসন্তানকে তিনিই উন্নত করিতে পারেন।'

নিঃশব্দে সকলে কুতবমিনার হইতে অবতীর্ণ হইলেন, নিঃশব্দে শিবিরাভিমুখে যাইলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

রামসিংহ।

'বাপের সদৃশ বীর, সমান সমান'

কাশীরাম দাস।

শিবজী ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজী শিবিরে উপবেশন করিয়া আছেন এমত সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া বলিলেন,—

'মহারাজ জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ অন্য একজন সৈনিক সহিত সম্রাট-আদেশে মহারাজকে দিল্লীতে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। উভয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন।

শিব। 'সাদরে লইয়া আইস।'

উগ্রস্বভাব শম্ভুজী বলিলেন, 'পিতঃ,

আপনাকে আহ্বান করিতে আরংজীব কেবল দুইজন মাত্র দূত পাঠাইয়াছেন? এ অবমাননা সহ্য করিবেন?'

শিবজীও আরংজীবকৃত এই অবমাননায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু স ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। ক্ষণেক পরই রামসিংহ শিবিরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুত্রযুবক পিতার ন্যায় তেজস্বী ও বীর, পিতার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী যুবকের মুখমণ্ডল দেখিয়াই তাঁহার উদার ও অকপট চরিত্র বুঝিলেন, তথাপি আরংজীবের কোন কু-অভিসন্ধি আছে কি না, দিল্লী প্রবেশে বিপদ আছে কি না, কথাচ্ছলে জানিবার প্রয়াস করিলেন। রামসিংহ পিতার নিকট শিবজীর বীর্য্য ও প্রতাপের কথা অনেক শুনিয়াছেন, সবিস্ময় নয়নে মহারাষ্ট্র বীর পুরুষের দিকে অবলোকন করিলেন। শিবজী রামসিংহকে আলিঙ্গন ও যথোচিত সম্মানপুরঃসর অভ্যর্থনা করিলেন। ক্ষণেক পর রামসিংহ কহিলেন—

'মহারাজকে পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই, কিন্তু পিতার নিকট আপনার যশোবার্ত্তা বিস্তর শুনিয়াছি, অদ্য আপনার ন্যায় স্বদেশপ্রিয় ধর্ম্মপরায়ণ বীরপুরুষকে দেখিয়া আমার নয়ন সার্থক হইল।'

শিব। 'আমারও অদ্য পরম সৌভাগ্য। আপনার পিতার তুল্য বিচক্ষণ, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যপ্রিয় বীরপুরুষ রাজস্থানেও বিরল, দিল্লী আগমনের সময় যে তাঁহার পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল ইহা সুলক্ষণ সন্দেহ নাই।'

রাম। 'মহাশয় দিল্লী আগমন করিতেছেন শুনিয়াই সম্রাট আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, কখন্ নগর প্রবেশ করিতে অভিলাষ করেন?'

শিব। 'প্রবেশ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?' শিবজী তীক্ষ্ণ নয়নে রামসিংহের দিকে চাহিতেছিলেন।

অকপট স্বরে রামসিংহ উত্তর করিলেন—

'আমার বিবেচনায় এইক্ষণই প্রবেশ করা বিধেয়, বিলম্ব হইলে বায়ু উত্তপ্ত হইবে, গ্রীষ্ম দুঃসহনীয় হইবে।'

রামসিংহের সরল উত্তর শুনিয়া শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

'সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনি দিল্লীতে অধুনা বাস করিতেছেন, আপনার নিকট কোনও সংবাদ অবিদিত নাই, আমার পক্ষে দিল্লীপ্রবেশ কতদূর বুদ্ধির কার্য্য তাহা আপনি অবশ্যই জানেন।'

উদারচেতা রামসিংহ এতক্ষণ পর শিবজীর মনোগত ভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—

'ক্ষমা করুন, আমি আপনার উদ্দেশ্য পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। আমি আপনার অবস্থায় হইলে চিরকাল পর্ব্বতে

বাস করিতাম, নিজের অসির উপর নির্ভর করিতাম, অসির তুল্য প্রকৃত বন্ধু আর নাই। কিন্তু এ বিষয় অজ্ঞমাত্র,—পিতা আপনাকে যখন দিল্লী আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন তখন আপনি আসিয়া ভালই করিয়াছেন। তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত তাঁহার পরামর্শ কখনও ব্যর্থ হয় না।’

শিবজী বুঝিলেন দিল্লীতে তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার জন্য কোনও কল্পনা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে রামসিংহ তাহা জানেন না। তখন পুনরায় বলিলেন—

•

‘ হাঁ আপনার পিতাই আমাকে আসিতে পরামর্শ দিয়াছেন,—আমার আসিবার সময় তিনি আরও বাক্য দান করিয়াছেন, তাহাও বোধ হয় আপনি অবগত আছেন।’

রামসিংহ.—‘ আছি। দিল্লী আগমনে আপনার কোনও বিপদ হইবে না, কোনও অনিষ্ট হইবে না, সে বিষয়ে তিনি আপনাকে বাক্যদান করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি আমাকেও আদেশ করিয়াছেন।’

শিব। ‘তাহাতে আপনার কি মত ?’

রাম। ‘পিতার আদেশ অবশ্য পালনীয়, রাজপুতের বাক্য লঙ্ঘন না হয়,—পিতার বাক্য যাহাতে লঙ্ঘন না হয়, আপনি নিরাপদে স্বদেশে যাইতে পারেন, সে বিষয়ে দাসের যত্নের কোনও ক্রটী হইবে না।’

শিবজীর মন নিরুদ্বেগ হইল। আর সন্দেহ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—

‘তবে আপনারই পরামর্শ গ্রহণ করিব; বিলম্ব করিলে বাদ্সা উত্তপ্ত হইবে, চলুন এইক্ষণেই দিল্লী প্রবেশ করি।’

অচিরে সকলে দিল্লীর অভিমুখে চলিলেন।

সমস্ত পথ পুরাতন মুসলমান প্রাসাদের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। প্রথম মুসলমানেরা দিল্লী জয় করিয়া পৃথুরায়ের পুরাতন দুর্গের নিকট আপনাদিগের রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রথম সম্রাটদিগের মস্জীদ, প্রাসাদ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট সেই স্থানে দৃষ্ট হয়। কালক্রমে নূতন নূতন সম্রাট আরও উত্তরে নূতন নূতন প্রাসাদ ও রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন, ক্রমে নগর উত্তরাভিমুখে চলিল। শিবজী যাইতে যাইতে কত প্রাসাদ কত মসজীদ ও মিনার, কত স্তম্ভ ও সমাধি-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলেন, তাহা গণনা করিতে পারিলেন না। রামসিংহ শিবজীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ও নানা স্থানের পরিচয় দিতে লাগিলেন, উভয়ে উভয়ের গুণের পরিচয় পাইলেন, উভয়ের মধ্যে অচিরে সৌহৃদ্য জন্মিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিবজী স্থির করিলেন, যদি দিল্লীতে কোনও বিপদ হয়, একজন প্রকৃত বন্ধু পাইব।

পথিমধ্যে লোদীবংশীয় সম্রাটদিগের

প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির সকল দৃষ্ট হইল, প্রত্যেক রাজার কবরের উপর এক একটী গম্বুজ ও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। আফগাণদিগের গৌরবসূর্য্য যখন অস্তমিত হয়, তখন এই স্থানে দিল্লী ছিল, পরে আরও উত্তরে সরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর হুমাউনের প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির। তাহার পরে "চৌষট্‌খম্বা" অর্থাৎ শ্বেত-প্রস্তর-বিনির্ম্মিত চতুঃষষ্টি স্তম্ভযুক্ত প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। তাহার পশ্চাতে অসংখ্য গোরস্থান। পুরাতন দুর্গ হইতে আধুনিক দিল্লী পর্য্যন্ত আসিতে আসিতে শিবজীর বোধ হইল যেন সেই পথেই ভারতবর্ষের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। এক একটি প্রাসাদ বা অট্টালিকা সেই ইতিহাসের এক একটি পত্র, এক একটি গোরস্থান এক একটি অক্ষর, করাল কাল সেই ইতিহাসলেখক; নচেৎ এরূপ অক্ষরে ইতিহাস কেন লিখিত হইবে?

শিবজী আরও আসিতে লাগিলেন। দিল্লীর প্রাচীরের নিকটে আসিলে রামসিংহ সগর্ব্বে একটি মন্দির দেখাইয়া বলিলেন,—

'রাজন্, ঐ যে মন্দির দেখিতেছেন,—পিতা জ্যোতিষ গণনার্থ ঐ মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন; বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা ঐ মন্দিরে আসিয়া রজনীতে নক্ষত্র গণনা করেন।'

শিব। 'আপনার পিতা যেরূপ বিজ্ঞ, জগতে এরূপ সর্ব্বগুণসম্পন্ন লোক অতি বিরল; শুনিয়াছি পুণ্য কাশীধামেও তিনি ঐরূপ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।'

রাম। '[illegible] আজ্ঞা করিলেন সত্য।' অচিরে দিল্লীর প্রাচীরের ভিতর সকলে [illegible] রিলেন।

[illegible] রবার সময় শিবজীর ঈষৎ হৃদ্‌কম্প হইল,—তিনি অশ্ব থামাইলেন। একবার পশ্চাৎ দিকে চাহিলেন, একবার [illegible] স্বাধীন আছি, পরক্ষণেই বন্দী হইতে পারি!' তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মপরায়ণ জয়সিংহের নিকট যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল, জয়সিংহের পুত্রের উদার মুখমণ্ডল দেখিলেন,—ভবানীর নাম লইলেন ও নিজ কোষে 'ভবানী' নামক অসিকে মনে মনে স্মরণ করিয়া দিল্লী দ্বারে প্রবেশ করিলেন।

স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা সেই মুহূর্ত্তে বন্দী হইলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীনগর।

"ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা
নাচিছে নর্ত্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে
গায়ক; নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী—
খল খল খল হাসি মধুর অধরে!

কেহ বা সুরতে রত কেহ শীধুপানে।
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাঁথা ফুলফলে
গৃহাগ্রে উড়িছে ধ্বজ; বাতায়নে বাতী;
জনস্রোতঃ রাজপথে বহিছে কল্লোলে।"
মধুসূদন দত্ত।

দিল্লী অদ্য—নোহর বেশ ধারণ করিয়াছে। আরংজীব স্বয়ং ... প্রিয় ছিলেন না, কিন্তু রাজকার্য্যনির্ব্বাহার্থ সময়ে সময়ে জাঁকজমক আবশ্যক, তাহা বিশেষরূপে জানিতেন। অদ্য শিবজী দরিদ্র মহারাষ্ট্রদেশ হইতে বিপুল অর্থশালী মোগল রাজধানীতে আসিয়াছেন; মোগলদিগের ক্ষমতা সম্পত্তি ও অর্থের প্রাচুর্য্য দেখিলে শিবজী আপন হীনতা বুঝিতে পারিবেন, মোগলদিগের সহিত যুদ্ধের অসম্ভাবিতা বুঝিতে পারিবেন, এই উদ্দেশ্যে আরংজীব অদ্য প্রচুর জাঁকজমকের আদেশ দিয়াছিলেন। সম্রাটের আদেশে দিল্লীনগরী উৎসবের দিনে কুলললনার ন্যায় অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করিয়াছে!

শিবজী ও রামসিংহ একত্রে রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। পথ দিয়া অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক গমনাগমন করিতেছে, নগর লোকারণ্য হইয়াছে। বণিকগণ বাজারে দোকানে বহুমূল্য পণ্যদ্রব্য রাশি করিয়া রাখিয়াছে; উৎকৃষ্ট বস্ত্র, বহুমূল্য স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার, অপূর্ব্ব খাদ্য সামগ্রী, অপর্য্যাপ্ত গৃহানুকরণ দ্রব্য দেখিতে দেখিতে শিবজী রাজপথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। কোথাও গৃহের উপর দিয়া নিশান উড়িতেছে, কোথাও সুপরিচ্ছদ গৃহস্থেরা বারান্দায় বসিয়া রহিয়াছে, কোথাও বা গবাক্ষ দিয়া কুলকামিনীগণ প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র যোদ্ধাকে দেখিতেছে। পথে অসংখ্য শকট, শিবিকা হস্তী ও অশ্ব; রাজা মনসবদার, সেখ, আমীর ও ওমরাহগণ গমনাগমন করিতেছেন; অশ্বারোহীগণ তীব্রবেগে যেন নগর কাঁপাইয়া যাইতেছে; সুন্দর অলঙ্কার ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া শুণ্ড নাড়িতে নাড়িতে গজেন্দ্রগমনে গজেন্দ্রগণ চলিয়া যাইতেছে; হুহুঙ্কার শব্দে শিবিকাবাহকগণ যেন আরোহীর পদমর্য্যাদা চীৎকার শব্দের দ্বারা প্রচার করিয়া চলিয়া যাইতেছে। শিবজী এরূপ নগর কখনও দেখেন নাই, কোথায় পুনা বা রায়গড়! যাইতে যাইতে রামসিংহ দূরে তিনটি শ্বেত গম্বুজ দেখাইয়া বলিলেন—

'ঐ দেখুন জুম্মা মসজীদ্! সম্রাট শাহজিহান জগতের অর্থ একত্র করিয়া ঐ উন্নত প্রশস্ত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন—শুনিয়াছি ওরূপ মসজীদ্ জগতে আর নাই।' শিবজী বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে দেখিলেন রক্তবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বিস্তীর্ণ স্থান ব্যাপিয়া মসজীদের প্রাচীর দেখা যাইতেছে, তাহার উপর সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত তিনটি গম্বুজ ও দুই দিকে দুই মিনার যেন গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে।

এই অপরূপ মসজীদের সম্মুখেই রাজ-

প্রাসাদ ও দুর্গের বিস্তীর্ণ রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাচীর দৃষ্ট হইল। দুর্গের পশ্চাতে যমুনা নদী, সম্মুখে দুর্গ ও মস্জীদের মধ্যে, বিস্তীর্ণ রাজপথ শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য। সেই স্থানের ন্যায় আর একটি স্থান ভারতবর্ষে ছিল না, জগতে ছিল কি না, সন্দেহ। দুর্গের প্রাচীরের উপর সহস্র নিশান বায়ুপথে উড়িতেছে, যেন জগতে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও গৌরব প্রকাশ করিতেছে! দুর্গদ্বারে একজন প্রধান মনসবদারের প্রশস্ত শিবির; মনসবদার দুর্গদ্বার রক্ষা করিতেছেন। সম্মুখে সেনা রেখায় রেখায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বন্দুকের কিরিচশ্রেণী সূর্য্যালোকে ঝকঝক করিতেছে, প্রত্যেক কিরিচ হইতে রক্তবস্ত্রের নিশান বায়ুমার্গে উড়িতেছে। দুর্গ সম্মুখে অসংখ্য লোক অসংখ্য প্রকার দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিতে আসিয়াছে, দুর্গপ্রাচীর হইতে মসজীদপ্রাচীর পর্য্যন্ত ও উত্তর দক্ষিণে যতদূর পথ দেখা যায় সমস্ত শব্দপূর্ণ ও লোকারণ্য! অশ্বারোহী, গজারোহী বা শিবিকারোহী ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পদাভিষিক্ত পুরুষ বহুলোকসমন্বিত হইয়া বহু সমারোহে সর্ব্বদাই দুর্গদ্বার দিয়া ভিতর বা বাহিরে আসিতেছেন। তাঁহাদিগের পরিচ্ছদ-শোভায় নয়ন ঝলসিত হইতেছে, লোকের কলরবে কর্ণ বিদীর্ণ হইতেছে! সকল শব্দকে নিমগ্ন করিয়া মধ্যে মধ্যে শিবিরের মধ্য হইতে কামানের শব্দ নগর কম্পিত করিতেছে ও রাজাধিরাজ আলমগীর অর্থাৎ জগতের অধিপতির ক্ষমতাবার্ত্তা জগৎসংসারে প্রচার করিতেছে!

বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে ক্ষণেক এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শিবজী রামসিংহের সহিত দুর্গদ্বার অতিক্রম করিয়া দুর্গ প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশ করিয়া শিবজী যাহা দেখিলেন তাহাতে বিস্মিত হইলেন। চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ "কারখানায়" অসংখ্য শিল্পকারগণ রাজ-ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে,—অপূর্ব স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত বস্ত্র, মলমল্ মসলিন বা ছিট,—বহুমূল্য গালিচা, চন্দ্রাতপ, তাম্বু বা পরদা, সুন্দর পরিধেয়, উষ্ণীষ, শাল, বা গাত্রাবরণ, অপরূপ স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিমাণিক্যের বেগম-পরিধেয় অলঙ্কার, সুন্দর চিত্র, সুন্দর কারুকার্য্য, সুন্দর কাষ্ঠ বা শ্বেত প্রস্তরের গৃহানুকরণ দ্রব্য, রাশি রাশি নীল, পীত, রক্তবর্ণ বা হরিদ্বর্ণ প্রস্তরের নানারূপ খেলনা দ্রব্য, কত বর্ণনা করিব! ভারতবর্ষে যত অপূর্ব্ব শিল্পকার ছিল, সম্রাট-আদেশে তাহারা মাসিক বেতন পাইয়া প্রতিদিন দুর্গে কার্য্য করিতে আসিত। সম্রাট রাজকার্য্যার্থ বা নিজ প্রয়োজনের জন্য যে কোন বস্তু আবশ্যক বোধ করিতেন, বিলাসিনী বেগমগণ যতরূপ অপূর্ব্ব 'ফরমায়েশ' করিতেন, প্রাসাদবাসিদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন হইত, সমস্ত এই স্থানে প্রস্তুত হইত।

শিবজী এ সমস্ত দেখিবার সময় পাইলেন না। অসংখ্য লোকের মধ্য দিয়া "দেওয়ান আম" নামক উন্নত প্রশস্ত রক্তবর্ণ প্রস্তর-বিনির্ম্মিত প্রাসাদের নিকট আসিলেন। সম্রাট সচরাচর এই স্থানেই সভা অধিবেশন করেন,—কিন্তু অদ্য যেন শিবজীকে প্রাসাদের সমস্ত গৌরব দেখাইবার জন্যই,—আরও ভিতরে সুন্দর শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত, নানারূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত জগতে অতুল্য "দেওয়ান খাস" নামক প্রাসাদে সভা অধিবেশন করিয়াছিলেন। শিবজী সেই স্থানে যাইলেন, দেখিলেন প্রাসাদের ভিতর রত্নমাণিক্য-বিনির্ম্মিত সূর্য্যরশ্মি প্রতিঘাতী ময়ূরসিংহাসনের উপর সম্রাট আরংজীব উপবেশন করিয়া আছেন, সম্রাটের চারিদিকে রৌপ্যবিনির্ম্মিত রেল,তাহার সম্মুখে ভারতবর্ষের অগ্রগণ্য রাজা, মনসবদার, ওমরাহ ও বীরপুরুষ এবং অসংখ্য লোক নিঃশব্দে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। রামসিংহ শিবজীর পরিচয় দান করিয়া রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

শিবজী অদ্য দিল্লীনগরের অসাধারণ শোভা দেখিয়াই আরংজীবের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে রাজসদনে আসিয়া সেই বিষয় আরও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। যিনি বিংশতি বৎসর তুমুল যুদ্ধ করিয়া আপনার ও স্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সম্প্রতি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া যুদ্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, যিনি এতদূর স্বীকার করিয়া মহারাষ্ট্রদেশ হইতে সম্রাটকে দর্শন করিতে দিল্লী পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, সম্রাট্ তাঁহাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন? সামান্য সেনাপতিকেও ইহা অপেক্ষা সম্মান করিতেন, শিবজী অদ্য একজন সামান্য কর্ম্মচারীর ন্যায় নম্রভাবে রাজ-সদনে দণ্ডায়মান! শিবজীর ধমনীতে উষ্ণ শোণিত বহিতে লাগিল,—কিন্তু এক্ষণে নিরুপায়! সামান্য রাজকর্ম্মচারীর ন্যায় সম্রাটকে 'তসলীম' করিয়া রীতিমত 'নজর' দান করিলেন। আরংজীবের দূর উদ্দেশ্য সাধন হইল,—জগৎ সংসার জানিল, শিবজী জানিল, শিবজী ও আরংজীব সমকক্ষ নহেন, দাসের প্রভুর সহিত, ক্ষীণের বলিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করা মূর্খতা।

এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ আরংজীব 'নজর' গ্রহণ করিয়া কোন বিশেষ সমাদর না, করিয়া শিবজীকে 'পাঁচ হাজারী' অর্থাৎ পঞ্চ সহস্র সেনার সেনাপতিদিগের মধ্যে স্থান দিলেন। শিবজীর নয়ন তখন অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হইল, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,তিনি ওষ্ঠের উপর দন্তস্থাপন করিলেন, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন শিবজী পাঁচ হাজারী? সম্রাট্ যখন মহারাষ্ট্রে যাইবেন, দেখিবেন শিবজীর অধীনে কত পাঁচ হাজারী আছে! দেখিবেন, তাহারা দুর্ব্বল হস্তে অসিধারণ করে না।" শিবজীর পার্শ্বস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ

এই কথা শুনিতে পাইল, সম্রাটের কাণে এ কথা উঠিল।

অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদন হইলে সভা ভঙ্গ হইল। সম্রাট গাত্রো-ত্থান করিয়া পার্শ্বস্থ উচ্চ শ্বেত-প্রস্তরবি-নির্ম্মিত বেগম মহলে গেলেন, নদীর স্রো-তের ন্যায় দুর্গ হইতে অসংখ্য লোকস্রোত নির্গত হইতে লাগিল, যে যাহার আবাস স্থানে যাইল, সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ দি-ল্লীনগরেঅচিরে লোকস্রোত লীন হইয়া গেল।

শিবজীর আবাসের জন্য একটি বাটি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; রোষে, অভিমানে স-ন্ধ্যার সময় শিবজী সেই বাটিতে আসি-লেন, একাকী বসিয়া চিন্তা করিতে লা-গিলেন।

ক্ষণেক পর রাজসদন হইতে সংবাদ আসিল যে অদ্য সম্রাটের সম্মুখে শিবজী যে কথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সম্রাট তাহা শুনিয়াছেন। সম্রাট শিবজীকে অন্য দণ্ড দিতে ইচ্ছা করেন না, কিন্তু ভ-বিষ্যতে শিবজী রাজসাক্ষাৎ পাইবেন না, রাজসভায় স্থান পাইবেন না।

শিবজী বুঝিলেন,ভবিষ্যৎ আকাশ মেঘা-চ্ছন্ন হইতেছে; ব্যাধে যেরূপ সিংহকে ধরি-বার জন্য জালপাতে, ক্রুর দুষ্টবুদ্ধি আরং-জীব সেইরূপ ধীরে ধীরে শিবজীকে বন্দী করিবার জন্য মন্ত্রণাজাল পাতিতেছেন! এ জাল বিদীর্ণ করিয়া কি পুনরায় স্বা-ধীনতা লাভ করিব? পুনরায় নীরবে প্রায় এক দণ্ডকাল চিন্তা করিতে লাগি-লেন।

শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহি-লেন, "হা সীতাপতি গোস্বামিন্! দ্বিজ-প্রবর! চির যুদ্ধের পরামর্শ তুমিই দিয়া-ছিলে,—তখন তোমার পরামর্শ গ্রাহ্য ক-রিলাম না, তোমার গরীয়সী কথা এখনও আমার কর্ণে শব্দিত হইতেছে!—আরং-জীব! সাবধান! শিবজী এ পর্য্যন্ত তো-মার নিকট সত্য পালন করিয়াছে,—তা-হার সহিত অসত্য বা খল আচরণ করিও না, কেননা শিবজীও সে বিদ্যায় শিশু নহেন। যদি কর, ভবানী সাক্ষী থাকুন, মহারাষ্ট্রদেশে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত ক-রিব, তাহাতে এই সুন্দর দিল্লীনগর, এই বিপুল মুসলমান সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া যা-ইবে!'

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিশীথে আগন্তুক।

"কে তুমি——————
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ!"

মধুসূদন দত্ত।

কয়েক দিনের মধ্যে শিবজী আরং-জীবের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন; শিবজী আর স্বদেশে না যাইতে পারেন, চিরকাল দিল্লীতে বন্দী হইয়া থাকেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কখনও স্বাধীন না হয়, এই আরংজীবের উদ্দেশ্য! শিবজী সম্রা-

টের এই কপটাচরণে যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ গোপন করিয়া দিল্লী হইতে প্রস্থানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্ত ন্যায়শাস্ত্রী সর্ব্বদা শিবজীর সহিত এই বিষয় আলোচনা করিতেন, ও নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিতেন।

অনেক যুক্তি করিয়া উভয়ে স্থির করিলেন যে প্রথমে দেশ প্রত্যাগমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা বিধেয়,—অনুমতি না দিলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে।

ন্যায়শাস্ত্রী পণ্ডিতপ্রবর, ও বাক্পটুতায় অগ্রগণ্য, তিনি শিবজীর আবেদন রাজ-সদনে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন—

আবেদন পত্রে শিবজী যে যে কারণে দিল্লীতে আগমন করিয়াছিলেন তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিত হইল। শিবজী মোগল সৈন্যের সহায়তা করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, আরংজীব যে যে বিষয় অঙ্গীকার করিয়া শিবজীকে দিল্লীতে আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাও স্পষ্টাক্ষরে দর্শিত হইল। তাহার পর শিবজী প্রার্থনা করিলেন যে, 'আমি যে কার্য্য সাধন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছি তাহা এখনও সাধন করিতে প্রস্তুত আছি, বিজয়পুর ও গোলকণ্ডা-রাজ্য সম্রাটের অধীনে আনিতে যতদূর সাধ্য সাহায্য করিব। অথবা যদি সম্রাট আমার সহায়তা গ্রহণ না করেন, অনুমতি দিন আমি নিজের জায়গীরে প্রত্যাবর্ত্তন করি, কেন না হিন্দুস্থানের জল বায়ু আমার পক্ষে ও আমার সঙ্গীয় সেনার পক্ষে যৎপরোনাস্তি অস্বাস্থ্যকর, এদেশে আমাদের থাকা সম্ভব নহে।' রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী এইরূপ আবেদন পত্র সম্রাটসদনে উপস্থিত করিলেন, সম্রাট উত্তর পাঠাইলেন, উত্তরে নানা কথা লিখা আছে কিন্তু শিবজীর প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি নাই। শিবজী স্পষ্ট বুঝিলেন তাঁহাকে চিরবন্দী করাই সম্রাটের একমাত্র উদ্দেশ্য। তখন দিন দিন পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

উপরি উক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর এক দিন সন্ধ্যার সময় শিবজী গবাক্ষপার্শ্বে চিন্তিতভাবে উপবেশন করিয়া আছেন। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নাই, রাজপথ দিয়া লোকের স্রোত এখনও অবিরত বহিয়া যাইতেছে। কত দেশের লোক কতরূপ পরিচ্ছদে কত কার্য্যে এই রাজধানীতে আসিয়াছে! দিল্লী অসংখ্য সৈনিকের বাসস্থান, সর্ব্বদাই প্রশস্ত পথ দিয়া দুই এক জন সৈনিক যাইতে দেখা যাইতেছে। কখন কখন দুই এক জন শ্বেতাঙ্গ মোগল সদর্পে যাইতেছেন, অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ শত শত দেশীয় হিন্দু বা মুসলমান সর্ব্বদাই ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে, দুই এক জন কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রীও কখন কখন দেখা যাইতেছে। পারস্য আ-

রব,তাতার ও তুরস্ক দেশ হইতে বণিক বা মসাফের এই সমৃদ্ধ নগরীতে গমনাগমন করিতেছে, মুসলমান বা হিন্দু সেনাপতি রাজা বা মনসবদার বহুলোকসমন্বিত হইয়া মহাসমারোহে হস্তী বা অশ্ব বা শিবিকায় আরোহণ করিয়া যাইতেছেন, তদপেক্ষা উচ্চরবে বিক্রেতাগণ আপন আপন পণ্য দ্রব্য মস্তকে লইয়া চীৎকার করিতেছে, এতদ্ভিন্ন সহস্র অন্যান্য লোক সহস্র কার্য্যে জলের স্রোতের ন্যায় যাতায়াত করিতেছে!

ক্রমে এই জনস্রোত হ্রাস পাইতে লাগিল। দিল্লীর অসংখ্য দোকানদার আপন আপন দোকান বন্ধ করিতে লাগিল। নগরের অনন্ত কলরব যেন ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইল, দুই একটী বাটীর গবাক্ষ ভিতর হইতে দীপশিখা দেখা যাইতে লাগিল, অনন্ত হর্ম্ম্যশ্রেণীর মধ্যে দূরস্থ অট্টালিকাগুলি ক্রমে অন্ধকারে আবৃত হইতে লাগিল। আকাশে দুই একটী তারা দেখা দিল, পশ্চিমদিকে রক্তিমাচ্ছটা আর নাই, শিবজী পূর্ব্বদিকে চাহিলেন;—দিল্লীর উন্নত প্রাচীর, তাহার পর শান্ত বিস্তীর্ণ দিগন্তপ্রবাহিনী যমুনা নদী সায়ংকালের নিস্তব্ধতায় অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া যাইতেছে!

সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে জুম্মা মসজীদ হইতে আজানের পবিত্র শব্দ উত্থিত হইল, যেন সে গম্ভীর শব্দ ধীরে ধীরে চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ধীরে ধীরে মানবের মন আকর্ষণ করিয়া গগনে উত্থিত হইতে লাগিল! শিবজী মুসলমান-ধর্ম্ম-বিদ্বেষী, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও স্তব্ধ হইয়া সেই সায়ংকালীন সুদূর উচ্চারিত গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অন্ধকারে পুনরায় চাহিলেন, কেবল জুম্মা মসজীদের শ্বেতপ্রস্তর-বিনির্ম্মিত গম্বুজ সুনীল আকাশপটে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, কেবল প্রাসাদের রক্তবর্ণ উন্নত প্রাচীর যেন দূরে পর্ব্বতশ্রেণীর মত দৃষ্ট হইতেছে! এতদ্ভিন্ন সমস্ত নগর অন্ধকারে আচ্ছাদিত, নৈশ নিস্তব্ধতায় স্তব্ধ!

রজনী গভীর হইল, কিন্তু শিবজীর চিন্তাসূত্র এখনও ছিন্ন হইল না। অদ্য পূর্ব্ব কথা একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতেছিল। বাল্যকালের সুহৃদ্বর্গ, বাল্যকালের আশা, ভরসা, উদ্যম;—সাহসী উন্নতচরিত্র পিতা শাহজী, পিতৃতুল্য বাল্যসুহৃদ্ দাদাজী কানাইদেব, গরীয়সী মাতা জীজী!—যিনি মহারাষ্ট্রের জয়ের ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়াছিলেন, যিনি বীরমাতার ন্যায় বালককে বীরকার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন, বিপদে আশ্বাস দিয়াছেন, আহবে উৎসাহ দিয়াছেন!

তাহার পর যৌবনের উন্নত আশা, ভীষণ কার্য্য-পরম্পরা, দুর্গ-বিজয়, দেশ-বিজয়, রাজ্য-বিজয়, বিপদের পর বিপদ্, যুদ্ধের পর যুদ্ধ, অপূর্ব্ব জয়লাভ, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, দুর্দ্দমনীয় উচ্চাভিলাষ! বিংশ বৎসর পর্য্যালোচনা করিলেন, প্রতি বৎ-

সব অপূর্ব্ব বিজয়ে বা অসমসাহসী কার্য্যে অঙ্কিত ও সমুজ্জ্বল!

সে কার্য্য-পরম্পরা কি ব্যর্থ? সে আশা কি মায়াবিনী?—না এখনও ভবিষ্যৎ-আকাশে গৌরব-নক্ষত্র লীন রহিয়াছে, এখনও ভারতবর্ষে যবন রাজ্যের অবসান হইবে, হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তির মস্তকের উপর রাজচ্ছত্র উন্মীলিত হইবে?

এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এরূপ সময়ে দ্বিপ্রহর রজনীর ঘণ্টা বাজিল, রাজপ্রাসাদের নাগরাখানা হইতে সে শব্দ উত্থিত হইয়া সমস্ত বিস্তীর্ণ নগর ব্যাপ্ত হইল, নৈশ নিস্তব্ধতার গম্ভীর শব্দ বহুদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হইল।

আকাশগর্ভে সে শব্দ এখনও লীন হয় নাই, এরূপ সময়ে শিবজী উন্মীলিত গবাক্ষদ্বারে একটি দীর্ঘ মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার আকাশ-পটে যেন দীর্ঘ-নিশ্চেষ্ট প্রতিকৃতি!

বিস্মিত হইয়া শিবজী দণ্ডায়মান হইলেন, সেই আকৃতির প্রতি তীব্রদৃষ্টি করিলেন, কোষ হইতে অসি অর্দ্ধেক বহির্গত করিলেন। অপরিচিত আগন্তুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, লক্ষ্য না করিয়া, ধীরে ধীরে গবাক্ষ ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, ধীরে ধীরে ললাট ও ভ্রূযুগলের উপর হইতে নৈশ শিশির মোচন করিলেন।

শিবজী তীক্ষ্ণ-নয়নে দেখিলেন, আগন্তুকের মস্তকে জটাজুট, শরীরে বিভূতি; হস্তে বা কোষে অসি বা ছুরিকা বা কোন ও প্রকার অস্ত্র নাই;—তবে আগন্তুক শিবজীকে হত্যা করিবার জন্য সম্রাট-প্রেরিত চর নহে। তবে আগন্তুক কে?

তীক্ষ্ণনয়নে অন্ধকার ঘরের ভিতরও শিবজীকে লক্ষ্য করিয়া আগন্তুক বলিলেন,—

'মহারাজের জয় হউক!'

অন্ধকারে আগন্তুকের আকৃতি দেখিয়া শিবজী তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠশব্দ শ্রবণমাত্র চিনিতে পারিলেন। জগতে প্রকৃত বন্ধু অতি বিরল, বিপদের সময়, চিন্তার সময় এরূপ বন্ধুকে পাইলে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজী সীতাপতি গোস্বামীকে প্রণাম ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া নিকটে বসাইলেন, একটি দীপ জ্বালিলেন, পরে অতিশয় উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

'বন্ধুপ্রবর! রায়গড়ের সংবাদ কি? আপনি তথা হইতে কবে কিরূপে আসিলেন? এতদূরেই বা কি প্রয়োজনে আসিলেন, ও অদ্য নিশীথে সহসা গবাক্ষদ্বার দিয়া আসিবারই বা অর্থ কি?'

সীতাপতি উত্তর করিলেন, 'মহারাজ! রায়গড়ের সংবাদ সমস্ত কুশল; আপনি যে সচীব প্রবরের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছেন তাহাতে অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এ বিষয় আমি বিশেষ জানি না, কেন না আপনি রায়-

গড পরিত্যাগ করিবার পরে অধিক কাল আমি তথায় ছিলাম না। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছিলাম, আমার কঠোর ব্রত সাধনার্থে আমাকে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতে হয়—সেই প্রয়োজনেই মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শনার্থ দিল্লী আসিয়াছি। প্রভুর সহিত যখন সাক্ষাৎ করি তখনই আমার সৌভাগ্য, দিবাই কি,নিশাই কি?'

শিব। 'তথাপি কোনও বিশেষ কারণ না থাকিলে গবাক্ষ দিয়া দ্বিপ্রহর নিশীথে আসিতেন না। কি কারণ প্রকাশ করিয়া বলুন।'

সীতা। 'নিবেদন করিতেছি। কিন্তু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করি প্রভু আসিয়া অবধি কুশলে আছেন?'

শিব। 'শারীরিক কুশলে আছি,—শত্রুমধ্যে মনের কুশল কোথায়?'

সীতা। 'প্রভুর সহিত ত সম্রাটের সন্ধিই আছে, আপনার শত্রু কোথায়?'

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'সর্পের সহিত ভেকের সহিত সন্ধি কতক্ষণ স্থায়ী? সীতাপতি। আপনি অবশ্যই সমস্ত অবগত আছেন আর আমাকে লজ্জা দিবেন না। যদি রায়গড়ে আপনার বীরোপযোগী পরামর্শ শুনিতাম তাহা হইলে কঙ্কণদেশের ভীষণ পর্ব্বত ও উপত্যকার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের জন্য অদ্যাপি ও যুদ্ধ করিতে পরিতাম, খল সম্রাটের কথায় বিশ্বাস করিয়া জালার মধ্যে পড়িতাম না,—দিল্লীনগরে বন্দী হইতাম না।'

সীতা। 'প্রভু আত্মতিরস্কার করিবেন না, মনুষ্য মাত্রই ভ্রান্তির অধীন, এ জগৎ ভ্রমপরিপূর্ণ। বিশেষ এ বিষয়ে আপনার দোষ মাত্র নাই, আপনি সন্ধিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সদাচরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক এ স্থানে আসিয়াছেন, তিনি অসদাচরণ ও কপটাচরণে দোষী, জগদীশ্বর অবশ্য তাঁহার সমুচিত দণ্ড দিবেন। প্রভু! খনতার ক্ষয় নাই,—অদ্য আরংজীব যে পাপ করিয়া আপনাকে রুদ্ধ করিবার আশা করিয়াছেন সেই পাপে সবংশে নিধন হইবেন। মহরাজ। আপনি রায়গড়ে যে কথা বলিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রদেশে সে কথা এখনও কেহ বিস্মরণ হয় নাই;—আরংজীব যদি কপটাচরণ করেন তবে মহারাষ্ট্রদেশে যে যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হইবে, সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাইবে!'

উৎসাহে, উল্লাসে শিবজীর নয়ন জ্বলিতে লাগিল, তিনি বলিলেন,—

'সীতাপতি! সে ভরসা এখন ও লোপ হয় নাই। এখনও আরংজীব দেখিবেন মহারাষ্ট্রজীবন লোপ পায় নাই! কিন্তু হায়! যে সময়ে আমার বীরাগ্রগণ্য সৈন্যেরা মোগলদিগের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হইবে, সে সময়ে আমি কি দূর দিল্লীনগরে নিশ্চেষ্ট বন্দী স্বরূপ থাকিব?'

সীতা। 'যবে গগনসঞ্চারী বায়ুকে আরংজীব জালদ্বারা রুদ্ধ করিতে পারি-

বেন, তখন আপনাকে বন্দী রাখিতে পারিবেন, তাহার পূর্ব্বে নহে।'

শিবজী ঈষৎ হাস্য করিলেন; পরে ধীরে ধীরে বলিলেন 'তবে বোধ করি আপনি কোন পলায়নের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এরূপ গুপ্তভাবে অদ্য রজনীতে আমার গৃহে আসিয়াছেন।'

সীতা। 'প্রভু তীক্ষ্ণবুদ্ধি, প্রভুর নিকট কিছুই গোপন রাখিতে পারি এরূপ সম্ভাবনা নাই।'

শিব। 'সে উপায় কি?'

সীতা। 'অন্ধকার রজনীতে প্রভু অনায়াসে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারেন। দিল্লীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, কিন্তু পূর্ব্বদিকে একস্থানে সেই প্রাচীরে লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করা মহারাষ্ট্রীয় বীরের অসাধ্য নহে। অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র তরীতে অষ্টজন বাহক আছে নিমেষ মধ্যে মথুরায় পঁহুছিবেন। তথায় প্রভুর অনেক বন্ধু আছে, অনেক হিন্দু-দেবালয়ে অনেক ধর্ম্মাত্মা পুরোহিত আছেন, তথা হইতে প্রভু অনায়াসে স্বদেশে যাইতে পারিবেন।'

শিব। 'আমি আপনার উদ্যোগে যথেষ্ট বাধিত হইলাম, আপনি যে প্রকৃত বন্ধু তাহার আর একটি নিদর্শন পাইলাম। কিন্তু মনে করুন প্রাচীর উল্লঙ্ঘনের সময় কেহ আমাকে দেখিতে পাইল, তখন পলায়ন দুঃসাধ্য,—আরংজীব হস্তে নিশ্চয় মৃত্যু।'

সীতা। 'প্রাচীরের যে স্থানে লৌহশলাকা দেওয়া আছে তাহার অনতিদূরে আপনার সেনার মধ্যে দশজন খড়্গহস্তে ছদ্মবেশে লুক্কায়িত আছে। যদি কেহ প্রভুকে দেখিতে পায় বা গতিরোধ করে, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।'

শিব। 'ভাল, নৌকায় গমন কালে তীরস্থ কোন প্রহরী যদি সন্দেহ প্রযুক্ত নৌকা ধরিতে চাহে?'

সীতা। 'অষ্টজন নৌকাবাহক ছদ্মবেশী আপনারই অষ্টজন যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর বর্ম্মাচ্ছাদিত, তূণ পরিপূর্ণ। সহসা নৌকা কেহ রোধ করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা নাই।'

শিব। 'মথুরায় পহুছিয়া যদি প্রকৃত বন্ধু না পাই?"

সীতা। 'আপনার পেশওয়ার ভগিনীপতি মথুরায় আছেন, তিনি আপনার চির-পরিচিত ও বিশ্বস্ত তাহা আপনিই জানেন। আমি অদ্য তাঁহার নিকট হইতে আসিতেছি, তিনি সমস্ত প্রস্তুত রাখিয়াছেন, তাঁহার পত্র পাঠ করুন।'

বস্ত্রের ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শিবজীর হস্তে দিলেন। শিবজী ঈষৎ হাস্য করিয়া পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন—

'আপনি পাঠ করিয়া শুনান।' সীতাপতি লজ্জিত হইলেন, তাঁহার তখন স্ম-

রণ হইল যে শিবজী আপন নাম লিখিতেও জানিতেন না, কখনও লেখাপড়া শিখেন নাই।'

সীতাপতি পত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন। যাহা যাহা আবশ্যক, মুরেশ্বরের কুটুম্ব সমস্ত স্থির করিয়াছেন পত্রে বিস্তীর্ণ লিখা আছে। শুনিয়া শিবজী বলিলেন—

'গোস্বামিন্! আপনার সমস্ত জীবন যাগযজ্ঞে অতিবাহিত হইয়াছে কখনই বোধ হয় না, শিবজীর প্রধান মন্ত্রীও আপনার অপেক্ষা সুন্দররূপে উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিত না। কিন্তু এখনও একটি কথা আছে। আমি পলাইলে আমার পুত্র কোথায় থাকিবে, আমার বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ পন্ত, প্রিয় সুহৃদ্ অন্নজী মালশ্রী,—আমার সেনাগণ কোথায় থাকিবে? ইহারা কিরূপে আরংজীবের কোপ হইতে পরিত্রাণ পাইবে?'

সীতা। 'আপনার পুত্র, প্রিয় সুহৃদ্ ও মন্ত্রীবর আপনার সহিত অদ্য রজনীতেই যাইতে পারে;—আপনার সেনাগণ দিল্লীতে থাকিলে হানি নাই,—আরংজীব তাহাদিগকে লইয়া কি করিবেন, অগত্যা ছাড়িয়া দিবেন।'

শিব। 'সীতাপতি! আপনি আরংজীবকে জানেন না; তিনি ভ্রাতৃদিগকে বধ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।'

সীতা। 'যদি আপনার সেনাগণের উপর কঠোর আদেশ দেন, কোন্ মহারাষ্ট্র এরূপ ভীরু যে আপনার নিরাপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উল্লাসের সহিত প্রাণ বিসর্জ্জন না করিবে?'

শিবজী ক্ষণেক নীরবে চিন্তা করিলেন। পরে মৃদু মৃদু ধীরে ধীরে বলিলেন—

'গোস্বামিন্! আমি আপনার চেষ্টা আপনার উদ্যোগের জন্য আপনার নিকট চিরবাধিত হইলাম, কিন্তু শিবজী তাহার বিশ্বস্ত ও চিরপালিত ভৃত্যদিগকে বিপদে রাখিয়া আপনার উদ্ধার চাহে না; এরূপ ভীরুতার কার্য্য কখনও করিবে না। সীতাপতি! অন্য উপায় উদ্ভাবন করুন, নচেৎ চেষ্টা ত্যাগ করুন!'

সীতা। 'অন্য উপায় নাই।'

শিব। 'তবে সময় দিন, শিবজীর এই প্রথম বিপদ নহে, উপায় উদ্ভাবনে কখনও পরাঙ্মুখ হয় নাই।'

সীতা। 'সময় নাই। অদ্য রজনীতে প্রভু পলায়ন করুন; নতুবা কল্য আপনার পলায়ন নিষিদ্ধ!'

শিব। 'আপনি কোন্ যোগবলে এরূপ জানিলেন জানি না, কিন্তু আপনার গণনা যদি যথার্থ ও হয় তথাপি শিবজীর অন্য উত্তর নাই;—শিবজী আশ্রিত প্রতিপালিত লোককে বিপদে রাখিয়া আত্মপরিত্রাণ করিবে না। গোস্বামিন্! এ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে।'

সীতা। 'প্রভু! বিশ্বাসঘাতকের শাস্তিদান করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, আরংজী-

বকে শাস্তি দান করুন,—সেইদূর মহারাষ্ট্র দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করুন, তথা হইতে সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরতরঙ্গ প্রবাহিত করুন, অচিরে আরংজীবের সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইবে, অচিরে এই পাপপূর্ণ সাম্রাজ্য অতল জলে মগ্ন হইবে।'

শিব। 'সীতাপতি! যিনি জগতের রাজা তিনি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিবেন, আমার কথা অবধারণা করুন, তাহার অধিক বিলম্ব নাই;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না।'

সীতা। 'প্রভু! এখনও এ প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করুন, এখনও বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন; কল্য বিবেচনার সময় থাকিবে না,—কল্য আপনি বন্দী।'

শিব। 'তাহাই হউক;—শিবজী আশ্রিতকে ত্যাগ করিবে না, শিবজীর প্রতিজ্ঞা অবিচলিত।'

সীতা। 'তবে আদেশ দিন, আমি বিদায় হই।' অতিশয় ক্ষীণ দুঃখের স্বরে সীতাপতি এই কথাগুলি বলিলেন। শিবজী চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার নয়নে জলবিন্দু।

তখন সস্নেহে সীতাপতির হস্ত ধরিয়া বলিলেন—"গোস্বামিন্! দোষ গ্রহণ করিবেন না; আপনার যত্ন, আপনার চেষ্টা, আপনার ভালবাসা আমি জীবন থাকিতে ভুলিব না; রায়গড়ে আপনার বীর পরামর্শ, দিল্লীতে আমার উদ্ধারার্থ আপনার এতদূর উদ্যোগ চিরকাল আমার হৃদয়ে জাগরিত থাকিবে। বিদায় কি জন্য? যতদিন দিল্লীতে থাকিবেন আমার এই অট্টালিকায় থাকুন, এস্থানে আমার বিপদ আছে, আপনার নাই।'

সীতা। 'প্রভু! আপনার মিষ্টবাক্যে যথোচিত পুরস্কৃত হইলাম; জগদীশ্বর জানেন আপনার সঙ্গে থাকা ভিন্ন আমার আর অন্য অভিলাষ নাই; কিন্তু আমার ব্রত অলঙ্ঘনীয়, ব্রত সাধনের জন্য নানাস্থানে নানাকার্য্যে যাইতে হয়, এখানে অবস্থিতি অসম্ভব।'

শিব। 'এ কি অসাধারণ ব্রত জানি না। কিন্তু দিবসে এক দিনও আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম না; রজনীযোগে অন্ধকারে এইরূপ রক্তচন্দনাবৃত হইয়া জটা ধারণ করিয়া এক এক বার দেখা দেন, দুই একটি বাক্যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত করেন, পুনরায় কোথায় চলিয়া যান আর দেখিতে পাই না! সীতাপতি! এ কি কঠোর ব্রত ধারণ করিয়াছেন?'

সীতা। 'সমস্ত এক্ষণে কিরূপে বিস্তার করিয়া বলিব, সাধনের একটি অঙ্গ এই যে, দিবসে রাজদর্শন নিষিদ্ধ!'

শিব। 'ভাল এ ব্রত কি উদ্দেশ্যে ধারণ করিয়াছেন?'

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া সীতাপতি বলিলেন,—'আমার ললাটে একটি অমঙ্গল লিখন আছে,—আমার ইষ্টদেবতা, যাঁহাকে আমি বাল্যকাল হইতে প্রাণের সহিত পূজা করিয়াছি, যাঁহার নাম জপ

করিয়া জীবন দিতে আমি আনন্দ বোধ করিব, বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট! সেই অসন্তোষ খণ্ডনার্থ এই ব্রত ধারণ করিয়াছি।'

শিব। 'এ অমঙ্গল কে গণনা করিয়া আপনাকে জানাইল? কেবা আপনাকে অমঙ্গল খণ্ডনার্থ এ ব্রত ধারণ করিতে বলিল?'

সীতা। 'কার্য্যবশতঃ আমি স্বয়ংই প্রথমটি জানিতে পারিলাম; ঈশানী-মন্দিরে একজন সতী সাধ্বী যোগিনী আমাকে এই ব্রত ধারণ করিবার আদেশ করিয়াছেন। যদি সফল হই, তবে সে ভগিনীসম স্নেহময়ীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিব; যদি কৃতার্থ না হই তবে এ অকিঞ্চিৎকর জীবন ত্যাগ করিব। যাঁহার সন্তোষার্থ জীবনধারণ করিতেছি, তিনি অসন্তুষ্ট থাকিলে এ জীবনে আবশ্যক কি?'

শিবজী দেখিলেন, গোস্বামীর নয়নে জলবিন্দু,—তাঁহার নিজের চক্ষুও শুষ্ক রহিল না; বলিলেন—

'সীতাপতি! যাহা বলিলেন যথার্থ; যাহার জন্য প্রাণপণ করি তাঁহার তিরস্কার, তাঁহার অসন্তোষ অপেক্ষা জগতে মর্ম্মভেদী দুঃখ আর নাই।'

সীতা। 'প্রভু কি এ যাতনা কখনও ভোগ করিয়াছেন'?

শিব। 'জগদীশ্বর আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি একজন নির্দ্দোষী বীরপুরুষকে এই যাতনা দিয়াছি;—সে বালকের কথা মনে হইলে এখনও আমার সময়ে সময়ে হৃদয়ে বেদনা হয়।'

প্রায় উদ্বেগ-রুদ্ধকণ্ঠে সীতাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—'তাঁহার নাম কি?'

শিবজী বলিলেন, 'রঘুনাথজী হাবেলদার।'

শিবজী বলিলেন, 'রঘুনাথজী হাবেলদার।' ঘরের দীপ সহসা নির্ব্বাণ হইল।

শিবজী প্রদীপ জ্বালিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় অতি কষ্টোচ্চারিত স্বরে সীতাপতি বলিলেন, 'দীপ অনাবশ্যক,—বলুন,—শ্রবণ করিতেছি।'

শিব। 'আর কি বলিব। তিন বৎসর অতীত হইয়াছে সেই বালকবেশী পুরুষ আমার নিকট আইসে ও সৈনিকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। তাহার বদনমণ্ডল উদার। সীতাপতি! আপনারই ন্যায় তাহার উন্নত ললাট ও উজ্জ্বল নয়ন ছিল। বালকের বয়স আপনা অপেক্ষা অল্প; আপনার ন্যায় বুদ্ধির প্রখরতা ছিল না, কিন্তু সেই উন্নত হৃদয়ে আপনার ন্যায়ই দুর্দ্দমনীয় বীরত্ব ও অকুতোভয়তা সর্ব্বদা বিরাজ করিত! আপনার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ যখন দেখি,—আপনার পরিষ্কার কণ্ঠস্বর যখন শুনি, আপনার বীরোচিত বিক্রম যখন আলোচনা করি, সেই বালকের কথা তখনই হৃদয়ে জাগরিত হয়!'

'তাহার পর?'

'সেই বালককে যে দিন প্রথম দেখি-

লাম, সেই দিন প্রকৃত বীর বলিয়া চিনি-লাম; সেই দিন আমার নিজের একখানি অসি তাহাকে দান করিলাম;—রঘুনাথ সে অসির অবমাননা করে নাই। বিপদের সময় সর্ব্বদা আমার ছায়ার ন্যায় নিকটে থাকিত, যুদ্ধের সময় দুর্দ্দমনীয় তেজে শত্রু-রেখা ভেদ করিয়া মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া সিংহনাদে অগ্রসর হইত! এখনও বোধ হয় তাহার সেই বীর আকৃতি সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সেই উজ্জ্বল নয়ন, আমি দেখিতে পাইতেছি।

'তাহার পর।'

'এক যুদ্ধে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিল, অন্য এক যুদ্ধে তাহারই বিক্রমে দুর্গ জয় হইয়াছিল, কত যুদ্ধে আপন অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল!'

'তাহার পর'

'আর জিজ্ঞাসা করেন কি জন্য; আমি একদিন ভ্রমে পতিত হইয়া সেই চিরবিশ্বাসী অনুচরকে অবমাননা করিয়া কার্য্য হইতে দূর করিয়া দিলাম; শেষ পর্য্যন্তও রঘুনাথ একটিও কর্কশ কথা উচ্চারণ করে নাই; যাইবার সময়ও আমারদিকে মস্তক নত করিয়া চলিয়া গেল।' শিবজীর কণ্ঠরুদ্ধ হইল, নয়ন দিয়া অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কেহ কথা কহিতে পারিলেন না; অনেকক্ষণ পরে সীতাপতি বলিলেন—

'আক্ষেপের কারণ কি? দোষীর দণ্ডই রাজধর্ম্ম।'

'শিব। 'দোষী! রঘুনাথের উন্নত চরিত্রে দোষ স্পর্শে না, আমি কি কুক্ষণে ভ্রান্ত হইলাম, জানি না। রঘুনাথের যুদ্ধস্থানে আসিতে বিলম্ব হইয়াছিল, আমি তাহাকে বিদ্রোহী মনে করিলাম। মহানুভব জয়সিংহ পরে এ বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—জানিয়াছেন যে তাঁহার একজন পুরোহিতের নিকট রঘুনাথ যুদ্ধপূর্ব্বে আশীর্ব্বাদ লইতে গিয়াছিল, সেই জন্যই বিলম্ব হইয়াছিল। নির্দ্দোষীকে আমি অবমাননা করিয়াছিলাম, শুনিয়াছি সেই অবমাননায় রঘুনাথ প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে সে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, আমি তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়াছি।'

শিবজীর কথা সাঙ্গ হইল; তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; অনেকক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলেন—'সীতাপতি।' কোনও উত্তর পাইলেন না। কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন,—সীতাপতি ঘরের মধ্যে নাই! সীতাপতি গোস্বামী সহসা অদৃশ্য হইলেন কি জন্য? সীতাপতি গোস্বামী কে?

জীর্ণোদ্ধার ।

অর্থাৎ ।

প্রাচীন আর্য্যজাতির জ্ঞান সমালোচনা ।

সলিল ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুরাতন আর্য্যদিগের জ্ঞানানুসন্ধান মানসে আমরা ' জীর্ণোদ্ধার ' ইত্যভিধেয় মুকুটার্পণ করিয়া একটি প্রস্তাব আরম্ভ করি । * নানা কারণে প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ করিতে পারি নাই । সম্প্রতি তাহার পুনরারম্ভ করিলাম ।

তৎকালে উহা কি পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল, তাহার আংশিক পরিচয় প্রদান করিতেছি ; ফল, প্রস্তাবপাঠের পূর্ব্বে পাঠকবর্গ একবার সেই প্রস্তাবটি দেখিয়া লইবেন ইহা আমাদিগের অনুরোধ । দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে এরূপ আকারের অর্থাৎ খণ্ড প্রস্তাব বলিয়া অধৈর্য্য বা অবধীরণার বশ হইবেন না ।

বৃষ্টির কারণ, মেঘের স্তর ও স্তরীভূত মেঘের নাম ঐরাবত, এই সকল বিষয় পূর্ব্ব প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে । ' মেঘস্যোপরি যো মেঘঃ স ঐরাবত উচ্যতে ' এই শাস্ত্র বচন দ্বারা জানা যাইতেছে যে ঐরাবত হস্তির জল বর্ষণ আর স্তরীভূত মেঘের জল বর্ষণ অভিন্ন কথা । হস্তি শব্দটি স্তরীভূত মেঘের রূপক মাত্র । জলবর্ষণকারী তাদৃশ মেঘেরই রূপক নাম ঐরাবত, অপর নাম ' অভ্রমাতঙ্গ ।'

' জলানামাকরোর্ণবঃ '—জল মাত্রেরই প্রধান আকর সমুদ্র । ভূ—বাষ্প ও সামুদ্রিক জল সূর্য্যকিরণ দ্বারা বাষ্পীভূত ও মেঘরূপে পরিণত হইয়া কালে বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হয়, এই ব্যাপার তৎকালীয় কোন আর্য্যেরই অজ্ঞাত ছিল না ।

তরল পদার্থ মাত্রেই নিম্নগামী ; সুতরাং পর্ব্বতাদি উচ্চস্থানের প্রবিষ্ট জলরাশি একত্রিত হইয়া নিম্নে প্রধাবিত হয় বলিয়া তাহাদিগের নাম ' নিম্নগা ।' প্রবাহের অল্পত্ব ও ঘনত্ব অনুসারে কেহ নদ কেহ নদী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে ।

ইহা মনে করিবেন না যে বৃষ্টির জলই নদ নদীর একমাত্র কারণ । কোন কোন নদী, উৎস-প্রবাহ দ্বারাও উৎপন্ন

* ১২৮৩ শালের কর্ত্তিক । অগ্রহায়ণ মাসের বান্ধব দেখ ।—

হইয়া থাকে। যেসকল জল, পৃথিবীর অন্তরাকর্ষণ শক্তি দ্বারা অভ্যন্তর-প্রবিষ্ট না হইয়া ছিদ্রময় পথে সর্ব্বদা স্রবিত হয়, তাহাই কোন বিশেষ ছিদ্র দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইলে উৎস নামে অভিহিত হয়। এই উৎস কোন স্থানে ফোয়ারার ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভূমিতে পুনঃপতিত হইয়া নিম্নে গমন করে, কোথাও বা কুণ্ডরূপে পরিণত হইয়া তথা হইতে অধোগমন করে। পরন্তু যেস্থানে উৎস উৎপন্ন হয়, সেই স্থানটিই নদীর যোনি অর্থাৎ উৎপত্তি ভূমি। নদীসকল যেস্থানে প্রথম উৎপন্না হয়, সে স্থানে তাহার আয়তন অতি অল্প থাকে। ক্রমে অগ্রসারিণী হইয়া অন্যান্য প্রবাহের সংযোগ ও কোমল মৃত্তিকার ভেদ হেতু বিপুল বিস্তারতা লাভ করে।

কোন কোন নদী পথিমধ্যে অন্তর্হিতা হইয়া কিয়দ্দূর গমনকরতঃ পুনরায় প্রকাশ্য প্রবাহে আত্মশরীর প্রকাশ করে। পুরাকালের আর্য্যেরা এইরূপ নদীকে ' অন্তর্বাহিনী ' এবং যেস্থান দিয়া উহারা প্রবাহিত হয় সেই স্থানগুলিকে ' বিনশন ' আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ইয়ুরোপীয় ভূতত্ত্ববেত্তারা বলিয়া থাকেন, যে নদী পথিমধ্যে নিম্নে কোমল মৃত্তিকা ও উপরে অতি দৃঢ় পর্ব্বতখণ্ড প্রাপ্ত হয়, সেই সকল নদীই তৎস্থানে নিম্নস্থ কোমল মৃত্তিকা ধৌত করিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভাগ দিয়া প্রবাহিত হয়।

পুরাতন আর্য্যেরা যখন বিশেষ বিশেষ প্রবাহের নামকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রবাহের উপর নদী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ' যে জলপ্রবাহ উচ্চস্থান হইতে নির্গত হইয়া অষ্ট সহস্র ধনু অর্থাৎ অন্যূন দুই ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত হইতেছে তাহারা নদী। এতদপেক্ষা ন্যূন প্রবেশগামী প্রবাহ, নদী নামের যোগ্য নহে। '

নদী সমূহের গতি সরল নহে। ভূমির দৃঢ়তা ও তরল পদার্থের স্বভাব অনুসারে নদী সকলের গতি সর্পের ন্যায় কুটিল হইয়া থাকে। স্রবন্তী সমূহের গতি যদি কুটিল না হইত, তাহা হইলে তাহাদের বেগের এরূপ প্রাখর্য্য জন্মিত যে তদ্দ্বারা দেশের বহুতর অনিষ্ট সংঘটিত হইত।

বর্ত্তমানকালীয় দ্বৈপায়ন পুরুষেরা নদী সকলের বিশেষ বর্ণনার নিমিত্ত তদীয় প্রবাহের গতি বিশেষকে তিন প্রকারে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এক পার্ব্বত্যাংশ —ইহা পর্ব্বত তটে পরিবেষ্টিত ও সমধিক বেগ বিশিষ্ট; দ্বিতীয় মধ্যাংশ—ইহা সমভূমি স্থিত মধ্য বেগ বিশিষ্ট ও সর্পের ন্যায় কুটিলগামী। তৃতীয় সঙ্গমাংস—ইহা লঘু বেগান্বিত এবং গম্যস্থান সকল কোমল মৃত্তিকা বিশিষ্ট হওয়ায় তাহারা সঙ্গম কালে প্রায় বহুধারা-বিভক্ত ও তথায় ত্রিকোণ ভূমির উৎপাদক।

এতদ্দেশীয় পুরাতন পণ্ডিতেরা তিন ভাগ না করিয়া চারিভাগ কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। শীঘ্রবহা, তির্য্যকস্রোতা, মৃ-

দ্রুবাহিনী ও অন্তঃসলিলবাহিনী বা বিনশন। ভারতবর্ষে—যত নদ নদী আছে, পুরাতন পণ্ডিতেরা তত্ত্বাবতের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ছিলেন। কোন্ নদী কিরূপ স্বভাব বিশিষ্ট এবং কিম্বিধ গুণাক্রান্ত তাহা তাঁহারা পর্য্যবেক্ষণদ্বারা নির্ণয করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হিমালয়-প্রভব নদী সকলের জল অদুষ্ট এবং বিন্ধ্য ও সহ্য প্রভৃতি পর্ব্বত-প্রভব নদীর জল বিশেষ রোগজনক, ইত্যাদি গুণাগুণবর্ণনা সুশ্রুতগ্রন্থের ৪৫ অধ্যায়ে বহুপরিমাণে আছে এবং কোন্ নদী কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাও বর্ণিত আছে; বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিলাম না এবং সেরূপ সংগ্রহ এপ্রস্তাবের উদ্দেশ্যও নহে।

সলিলের সহিত চন্দ্রমণ্ডলের এক আশ্চর্য্য সম্বন্ধ আছে। এই আশ্চর্য্য সম্বন্ধের প্রকৃত রূপ ও কারণ কি? ইহা আমরা জানি না। তিথি-বিশেষে যেমন সমুদ্রজল উচ্ছ্বসিত হয়, তেমনি মনুষ্য শরীরের রস নামক জলও উচ্ছ্বসিত হয়। সুস্থ ব্যক্তি ইহা অনুভব করিতে পারুন বা না পারুন, জলীয় পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। চন্দ্র-কলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সাগর-জলের হ্রাস বৃদ্ধি (স্ফীতোপচয়তা) হয়, পুরাতন আর্য্যেরা যে দিন ইহা জানিতে পারিয়া ছিলেন, সেই দিনেই জলরাশি সাগরের "সমুদ্র" এই আখ্যা প্রদান করিয়া ছিলেন। ইহা 'সমুদ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। পরন্তু চন্দ্রের সহিত সলিলের যে সম্বন্ধ আছে এবং কিরূপ চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধ্যনুসারে সিন্ধু সলিলের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, ইহার স্পষ্ট বিবরণ আমরা সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যে অদ্যাপি দেখিতে পাই নাই। যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা অলীক কল্পনা বলিয়াই উপলব্ধি হইল। শ্বেতদ্বীপের পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, চন্দ্রের আকর্ষণ দ্বারাই সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হয়। ইঁহারা আরও বলেন যে, পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েরই আকর্ষণ শক্তি আছে; চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আপন কক্ষায় পরিভ্রমণ করেন। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও তেমনি পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। পরন্তু চন্দ্রের আকর্ষণেই পৃথিবীর গাত্র-লগ্ন সমুদ্রের-জল তরল পদার্থ বলিয়া উচ্ছ্বসিত হয়।

পৃথিবীর যে ভাগ যখন চন্দ্রের নিম্নে অবস্থিতি করে, তখন সেই ভাগস্থিত সমুদ্র-জল উচ্ছ্বসিত হয়। পরন্তু ঠিক্ এই রূপ না হইলে অহোরাত্রের মধ্যে একবার মাত্র জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ফলতঃ উক্ত কালের মধ্যে দুইবার জোয়ার হওয়া সর্ব্ব প্রত্যক্ষ। সুতরাং উহার মধ্যে অপর একটি সূক্ষ্ম কারণ থাকা নির্ণয় করিতে হইবে। তাহা এই—

পৃথিবীর যেভাগ যখন চন্দ্রের ঠিক নিম্নে থাকে, তখন তাহার সেইভাগ, অন্য ভাগ অপেক্ষা নিকট হয়; সুতরাং সেই ভাগস্থ জল চন্দ্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়

এবং তাহার নিম্নভাগস্থ জল আকর্ষণের অল্পতা প্রযুক্ত নত হয়। এই নিমিত্ত উভয় স্থানেই এক সময়ে জোয়ার উৎপন্ন হয় এবং উক্ত জোয়ারের পার্শ্বের জল সরিয়া গেলেই পার্শ্বদ্বয়ে ভাঁটা হইয়া থাকে। এই রূপেই দিবারাত্রের মধ্যে দুইবার জোয়ার হয়। অপিচ, যে সময়ে জোয়ার হয়, সেই সময়ে উক্তরূপে পৃথিবীর উভয় ভাগের জল নত ও উন্নত হইলে পৃথিবী অণ্ডাকৃতি ধারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু চন্দ্রের নিয়ত গমন ও পৃথিবীর নিয়ত ঘূর্ণন হেতু সমুদ্রের এক স্থানের জল চন্দ্রমণ্ডলের আকর্ষণ দ্বারা স্ফীত হইতে হইতে চন্দ্র অন্য স্থানের উপর উদিত হয়; সুতরাং সমুদ্র জলের স্ফীততা ক্ষণকালের অধিক স্থিরীভূত হইতে পারেনা। এজন্যই তৎকালে পৃথিবী অণ্ডাকৃতি ধারণ করিতে পারেনা।

দ্বৈপায়ন জাতির এবম্বিধ বর্ণনার অনুরূপ বর্ণনা বোধ হয় কোন সস্কৃত গ্রন্থে নাই। আমরা যতদূর দেখিয়াছি তদনুসারেই ইহা বলিতেছি। ফল, চন্দ্রমণ্ডল যে সমুদ্রজলস্ফীততার কারণ, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জল ও চন্দ্রমণ্ডল ঘটিত অন্যান্য বিষয়গুলি 'চন্দ্রমণ্ডল' নামক প্রস্তাবে ব্যক্ত করিব। এক্ষণে চিকিৎসার উপযোগী কতিপয় জল গুণ বর্ণনা করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি।

চিকিৎসা শাস্ত্র, জলকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। আন্তরীক্ষ ও ভৌম। আকাশাগত বৃষ্টি-জলের নাম 'আন্তরীক্ষ' আর তাহা পৃথিবীস্থ হইলে 'ভৌম' বলিয়া আখ্যাত হয়। আন্তরীক্ষ জলের কি রস আছে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া বলা যায় না। ফল, এই আন্তরীক্ষ জল, অমৃততুল্য উপকারক।—আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর, তৃপ্তিকর, ধাতুপোষক, মনঃস্থৈর্য্যকারক, শ্রমনাশক, এবং ক্লান্তি ও পিপাসাহর—ইত্যাদি বহুগুণসমাযুক্ত। ভৌমজল স্থানবিশেষে, বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে; তদ্বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইমাত্র নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে যে, মৃত্তিকাসংস্পৃষ্ট হয় বলিয়া অনেক পরিমাণে মৃত্তিকার গুণ বর্ত্তে; সুতরাং যে দেশের বা যে স্থানের মৃত্তিকার যেরূপ গুণ, তত্রস্থ জল ও কিয়দংশে তদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া জানিতে হইবেক। আন্তরীক্ষ জলই সর্ব্বোত্তম হিতকারী, অভাবে আকাশ-গুণ-বহুল-স্থান জল সুপথ্য। আকাশ-গুণপ্রধান স্থানের জলে কোন বিশেষরূপ রসবত্তা অনুভব হয় না এবং তাহা লঘু হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোল্লিখিত 'অন্তরীক্ষ' জলের আবার চারি প্রকার প্রভেদ আছে। 'ধার''কার'' তৌষার' এবং 'হৈম'।

ধার—বৃষ্টিধারার জল। কার—কৃত্রিম জল।* তৌষার—কুঝটিকা। হৈম

* এস্থলে কৃত্রিম জল কি? তাহা বুঝি না। প্রাচীন কালেও কি বাষ্প জমাইয়া জল করিবার প্রথা ছিল?

বরফের জল। এই চতুর্ব্বিধ জলের মধ্যে 'ধার' জলই পথ্য ও সেবনীয়। অন্যগুলি অপথ্য ও প্রায়শঃই সেবার অযোগ্য।

ধার জল দুই প্রকার। গাঙ্গ ও সামুদ্র। সমস্ত বর্ষাকাল ব্যাপিয়া যে বৃষ্টিধারা পতিত হয়, মনে করিবেন না সকল সময়ের বৃষ্টির জল সমান। মেঘেরাও ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জল বর্ষণ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মেঘেরা ' গাঙ্গজল ' প্রায় আশ্বীন মাসেই বর্ষণ করিয়া থাকে ; এবং অন্যান্য মাসে কখনং বর্ষণ করে।

' আশ্বিন মাসের বৃষ্টির জল, গাঙ্গজল, আর ভাদ্র মাসের বৃষ্টির জল সমুদ্রের জল , একথা কিরূপ বিশ্বাস হইবে। কিরূপেই বা জানা যাইবে ?

'দ্বয়োরপি পরীক্ষণং কুর্ব্বীত'—দুই প্রকার জলেরই পরীক্ষা করিবে, পরীক্ষা করিলেই গাঙ্গজল কি সামুদ্রজল জানা যাইবে। বৃষ্টিজলের গাঙ্গত্ব ও সামুদ্রত্ব অবরোধের নিমিত্ত নিম্নলিখিত পরীক্ষা নির্ব্বাচিত আছে। যথা—

শালি ধান্যের পরিস্কার তণ্ডুল লইয়া তাহা না গঁবে যায় এরূপ করিয়া পাক কর। সেই অন্ন পিণ্ডাকৃতি করিয়া তাহা চাঁদি রূপার পাত্রে রাখ। টাট্‌কা থাকিতে থাকিতে তাহা বৃষ্টির সময় বাহিরে রাখিয়া দাও। এক মুহূর্ত্ত অর্থাৎ অন্যূন দুই দণ্ড রাখিলেও যদি সেই অন্নপিণ্ডের রঙ্‌ ঠিক্‌ থাকে এবং অন্য কোন প্রকার ক্লেদ ভাব লক্ষ্য না হয়, তবেই সেই বৃষ্টির জলকে " গাঙ্গ ' বলিয়া গ্রহণ কর। আর যদি শীঘ্র শীঘ্রই বিবর্ণ হইয়া যায় সিকৃথ (মোম) ও ক্লেদের মত কোন প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে বৃষ্টির জল " সামুদ্র " জানিয়া পরিত্যাগ কর। গাঙ্গ বর্ষণের জল উপকারী আর সমুদ্র বর্ষণের জল অপকারী। কিন্তু অন্যান্য মাস অপেক্ষা আশ্বিন মাসের সমুদ্রজলবর্ষণ অপেক্ষাকৃত ভাল বোধ হয়। এখন সকল মাসেই সমুদ্র জলবর্ষণ হয়, মেলেরাই এক্ষণে মলারিষ্ট বায়ু (ম্যালেরিয়া) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শীত, গ্রীষ্মাদি কালের নিমিত্ত 'ধার' জল ধরিয়া রাখা আবশ্যক। রাখিবার নিয়ম এইরূপ—বৃষ্টির সময় উত্তম পরিষ্কার শুভ্র বস্ত্র টানাইয়া দাও। নীচে সুবর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র কি মৃণ্ময়পাত্র অথবা কাঁচপাত্র রাখ। জলপূর্ণ হইলে তুলিয়া রাখ, কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত হইবে না। সুপরিষ্কৃত হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ হইতে ধৃত করিলেও হইতে পারে।

এরূপ জলের অভাবে কাযে কাযেই ' ভৌম ' জল ব্যবহার করিতে হয় ; সুতরাং ভৌম জলের বিবরণও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা যাইতেছে। ভৌমজল প্রধানতঃ সপ্তপ্রকার। সপ্তবিধ ভৌমজলের দোষ গুণ ও জল পরিষ্কার নিয়মাদি আগামী প্রস্তাবে ব্যক্ত করা যাইবেক।

প্রেততত্ত্ব।

(প্রথম প্রস্তাব)

আজি কালি সভ্যসমাজে প্রেততত্ত্ব লইয়া মহা গোলযোগ বাঁধিয়াছে। একদিকে ইয়োরোপ ও অপরদিকে আমেরিকা এই ভৌতিক তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছেন। যোগনিরত ঋষিগণও বড সাধারণ লোক নহেন। তাঁহারা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ও সভ্যসমাজের আদর্শ স্থল। তাঁহাদিগের বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞানে সভ্যজগৎ মুগ্ধ। সুতরাং শীঘ্রই যে তাঁহারা তাঁহাদিগের কঠোর তপস্যার ফল পাইবেন, এরূপ আশা বড অসম্ভব নয়। তাঁহারা আশানুরূপ ফল পাউন বা নাই পাউন, কিন্তু যে টুকু পাইয়াছেন তাহাতেই মুগ্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। দেহশূন্য আত্মার সহিত তাঁহারা কথা কহিতে পারেন। এবং সেই আত্মার সহায়েই ভূত, ভবিষ্যৎ ইহকাল ও পরকালের সমস্ত ঘটনা জানিতে পারেন। ব্যাপারটি বড় সাধারণ নয়। মুনি ঋষিগণ যে পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির করিয়া কখন বলিতে পারিলেন না যে, পরকাল আছে বা পরকাল নাই, সেই পরকালের নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত এই সকল বিদেশীয় পণ্ডিতেরা অল্পদিনেই জানিতে পারিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে; এই সকল আত্মারা উক্ত পণ্ডিতদিগের একান্ত বাধ্য। আহূত হইবা মাত্রই তাঁহারা পণ্ডিতদিগের সমক্ষে আবির্ভূত হন। এবং তাঁহাদিগের ইচ্ছানুরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দিয়া চলিয়া যান।

উপর্য্যুক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকেই যে সন্দিহান হইবেন, আশ্চর্য্য নহে। অনেকে ভাবিবেন, ঘটনা কিয়ৎপরিমাণে অতিরঞ্জিত হইয়াছে। হয় প্রস্তাবলেখক নয় প্রস্তাবের মূলপুস্তকলেখক, যাহা হউক, একটা কারখানা করিয়াছেন। যাঁহারা এরূপ মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে এইমাত্র বক্তব্য, যে তাঁহারা কিছুকাল অপেক্ষা করুন। আমাদিগের প্রস্তাবের সারার্থ ব্যাখ্যার জন্য আমরা যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিব, এবং প্রেতসম্বন্ধীয় যে সকল দৃষ্টান্ত দিব, তাহাতেই তাহাদের এ ভ্রম দূর হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু একদিকে যেমন প্রেতপক্ষসমর্থনার্থ আগ্রহ জন্মিয়াছে, অন্যদিকে আবার কতকগুলি ব্যক্তি এই মতের উচ্ছেদসাধন জন্য খড়্গহস্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের কয়েকজন প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি ঘটনা অলীক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। উভয় পক্ষেই কৃতি এবং

উভয় পক্ষেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ আছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের কোন পক্ষই অবলম্বন না করিয়া আমরা সাধারণতঃ প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিব।

অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রেতের অস্তিত্বে বিশ্বাস জনসমাজে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বৃদ্ধ, পণ্ডিত, মূর্খ সকলেই সকল সময়ে সকল প্রদেশে প্রেতের প্রতি যথেষ্ট সম্মান করিয়া আসিতেছেন। বিশেষ বাঙ্গালীর ঘরে ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতির বড় অনুগ্রহ। অশ্বত্থ বৃক্ষ, বটবৃক্ষ বা কোন নিম্ববৃক্ষ ইহাদিগের বাসস্থান। এবং যে সকল বাটীতে এই প্রকারের বৃক্ষ আছে সেবাটির স্ত্রীলোকদিগকে বড় সশঙ্কিত থাকিতে হয়। কোনরূপে অপদস্থ হইলে ইহারা গৃহস্থদিগের কাহারও না কাহারও স্কন্ধে চাপিয়া এ অপমানের প্রতিহিংসা লন। এইরূপ পিশাচাক্রান্তদিগের রোজা নামধারী একপ্রকার চিকিৎসকও আছেন। তাঁহারা মন্ত্রপ্রভাবে গৃহের মঙ্গল স্থাপন করিতে পারেন। এবং প্রেতের চতুর্দ্দশ পুরুষ যাহাতে গৃহের ত্রিসীমায় আর আসিতে না পারে সেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে বঙ্গীয়ভূত এবং রোজার বিশ্বাস শিক্ষিতদিগের মধ্যে নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদিগের একাধিপত্য স্ত্রীলোক এবং অশিক্ষিতের মধ্যে। অশিক্ষিতদিগের মধ্যেও অনেকে আবার ইহার মূলতত্ত্ব জানে। বঙ্গীয় ভূত যে বাস্তবিক দুষ্ট মনুষ্য, এবং রোজামহাশয়েরা বঞ্চকহরি, ইহা অনেক পূর্ব্ব হইতে বঙ্গের সাধারণ বিশ্বাস*। বাটিতে ভূতের উৎপাৎ হয় বলিলেই অনেকে বলিয়া থাকেন, বাটির স্ত্রীলোকদিগকে সাবধান করিও।

কিন্তু কোন ব্যাপার যত কেন মিথ্যা হউক না, তাহার অভ্যন্তরে কিছু না কিছু সত্য থাকিবেই থাকিবে†। সত্যশূন্য মিথ্যা এজগতে সম্ভবে না। আমরা দেখিতেছি, যেখানে একদল কোন মতকে ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, আর দল সেই মতেরই বিশেষ পক্ষপাতী। সুতরাং সেই মতের মধ্যে কিছু না কিছু সত্য অবশ্য আছে, নহিলে এত লোক তাহারভক্ত হইত না।

এই জন্যই আমাদিগের জিজ্ঞাস্য যে, বঙ্গীয় ভূতদিগের কোনরূপ অস্তিত্ব না থাকিলেও ইহাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাসের জন্ম কোথা হইতে থাকিল ? এই বিশ্বাসের মূল আত্মার অমরত্ব। দেহমধ্যে

* কিছু দিবস পূর্ব্বে কোন রোজা এক গৃহে ভূত ছাড়াইতে গিয়া ভূতের আহারের জন্য দধি প্রার্থনা করিয়াছিল। গৃহস্বামী ভূতকে বিশেষ জব্দ করিবার জন্য দধিতে জ্বারা মিশাইয়া দিয়াছিল, পরদিবস দেখিল যে রোজা মুখে লাল কাটিতেছে। এই ঘটনাটি কোন সপ্তাহিক সংবাদ পত্রে দৃষ্ট হয়। এরূপ ঘটনার অপ্রতুল নাই।

† " Falsity has a nucleus of reality "——H. Spencer.

আত্মা বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ থাকে কি না? যদি থাকে সে কোথায় থাকে, কেন থাকে, কি উদ্দেশে থাকে? তাহার কোন প্রমাণ আছে কি না? এসকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদিগের সময় নাই, সাধ্যও নাই। যাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহার মীমাংসা কে করিবে? এই কথা মীমাংসার জন্য কোন দুই পণ্ডিতের মত ঠিক মিলিল না। কথাই আছে ‘ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং ”। এই জন্য আত্মার অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনরূপ প্রমাণ আমরা দিব না। তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব যে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস সাধারণ বিশ্বাস। সকল সমাজের অভ্যন্তরেই এই বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। হয়ত দুই চারি জন এই বিশ্বাসের শত্রু, কিন্তু দুই চারিজনের মত ধর্ত্তব্য নহে। তাহাদিগের মত সমাজের মত নহে। সমাজ তাহার জন্য দায়ী হইতে পারেন না। সাধারণের মতই সমাজের মত।

সুতরাং মৃত্যুর পর যদি আত্মা থাকে, তবে সে কোন না কোন স্থানে থাকিবেই থাকিবে। যদি এতদূর হয়, তবে মানুষের সহিত সাক্ষাৎ কেন না করিবে? যে মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যের সহিত আলাপ করিয়া এতদিন কাটাইল, সে কি একদিনে সব ভুলিয়া যাইবে! যেই ইহলোক ছাড়িল, অমনি কি সকলকে স্মৃতির অন্ধকারগহ্বরে নিক্ষেপ করিবে। মানুষ ডাকিলে সে কেন না আসিবে? কিন্তু যে সে ডাকিলে আসিবে না। সে যাহাকে ভাল বাসে সেই ডাকিলেই আসিবে। বাঙ্গালায় রোজা না ডাকিলে আসিবে না; বিলাতে ও ইউনাইটেডষ্টেটে মধ্যস্থ (Medium) না ডাকিলে আসিবে না। আবার যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে আসিবেনা। আয়োজন করিয়া ডাকা চাই। এই কারণে প্রেতাহ্বানের জন্য নানা স্থলে নানারূপ আয়োজন হইয়া থাকে।

আমরা রোজাদিগকে পূর্ব্বে যে পরিহাস করিয়াছি, ইহাতে হয়ত অনেকে মনে করিয়াছেন, রোজাদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে বাঙ্গালায় জন্মিয়াছে। বিলাতে জন্মিলে তাহারাও ‘ গণ্ডায় ’ ‘ ণ্ডা ’ দিয়া চলিয়া যাইত। লেখকের বিশ্বাস আছে যে, বিলাতের সকলই ভাল, বাঙ্গালির কিছুই ভাল নহে ইত্যাদি। বাস্তবিক তাহা নহে। বাঙ্গালায়ও আমরা দুই চারি জন সন্ন্যাসীর কথা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এবং আরও অনেকের কথা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছি। ইহাঁরা পিশাচসিদ্ধ নামে পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদিগের ঘটনাবলী দেখিলে শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। আমরা যথাস্থানে ইহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিব। অন্যদিকে আবার বিলাতের সকলই যে ভাল তাহা নহে। ইচ্ছা করিলে আমরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দিতে পারি। আমরা একত্রীভূত রাজ্য (United States) হইতে একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। ফ্লিট নামক একজন

সাহেব উক্তস্থানে একজন মধ্যস্থ বলিয়া পরিচিত। প্রেতের সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয়, এবং এই ব্যবসায়ে তিনি বিপুল অর্থোপার্জ্জনও করিয়াছেন। তিনি পরলোক হইতে সংবাদাদি আনিয়া দেন। জীবিত মনুষ্যেরা যদি তাহাদিগের মৃত বন্ধু, পিতা, মাতা, প্রণয়িণী প্রভৃতি স্বজনদিগের সহিত কথোপকথন করিতে ইচ্ছা করেন, ফ্লিণ্ট সাহেব তাহার মধ্যস্থ হইয়া সহায়তা করিতে পারেন। তাঁহার সাহায্যের পদ্ধতিটা এইরূপ—যাহার কথা কহিবার প্রয়োজন, তিনি পরলোকস্থ আত্মীয়ের নামে পত্র লিখিয়া উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া ফ্লিণ্টের হস্তে দেন। পরদিন পত্র ফিরিয়া পান। পত্র বহির্দ্দিকে পূর্ব্বমত বন্ধ। কিন্তু পত্র খুলিয়া দেখেন যে, পত্রের সহিত মৃত আত্মীয়ের উত্তর রহিয়াছে। কেহ প্রণয়িণীকে লিখিতেছেন, কবে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে; কেহ পিতাকে লিখিতেছেন, আমার জীবনপথ সুখপূর্ণ বা কণ্টকময় ইত্যাদি; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার যথাসম্ভব উত্তর পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি এই ঘটনার একটি ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা প্রকাশের কারণ ফ্লিণ্ট সাহেবের সহিত তাঁহার বনিতার মনবিচ্ছেদ। বিশ্বাসঘাতিনী বনিতা এক্ষণে সাধারণ্যকে জানাইতেছেন যে, তাঁহার স্বামী পত্র খুলিবার একটি অদ্ভুত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এবং তদ্দ্বারা সকল পত্র খুলিয়া আপন মনোমত উত্তর লিখিয়া পত্র পুনশ্চ পূর্ব্বমত বন্ধ করিয়া পত্রপ্রেরককে ফিরিয়া দেন *। এইত গেল আধুনিক সভ্যতম জাতিদিগের প্রেততত্ত্ব। যদি এতদূর হয়,তবে দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে যে রোজাদিগের সময়ে সময়ে পশার হইবে তাহার আশ্চর্য্যতা কি? বিদেশীয়দিগের সকলই ভাল,এ কথা আমরা বলি না, যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগেরই জন্য এই দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। ইচ্ছা থাকিলে এই মত আরও কতশত উদ্ধৃত করিতে পারিতাম।

প্রেততত্ত্ববাদীরা ক্ষমা করিবেন, সকলেই যে এইরূপ এ কথা আমরা বলিতেছি না। বিলাতে ও ইউনাইটেড-ষ্টেটেও এক সম্প্রদায় আছে, যাঁহাদিগের শিক্ষা ও অধ্যবসায়ে বাস্তবিক আমরা মুগ্ধ। পৃথিবীতে ভাল মন্দ উভয়ই একত্র মিলে। ভাল মন্দ না হইলে কিছুই হইতে পারে না। যে হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মাগণ অক্ষয় যশঃ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কতলোক পাপ সোপানে অবতরণ করিতেছে। যে তীর্থে ভক্ত পূজা করিতে যায়; সেই খানেই পাপের ছড়াছড়ি। দেবতা সান্নিধ্যে পাপ হয় না বলিয়া দুষ্ট ভক্তের নামে কালি দেয়। যেখানে মহাত্মা রামমোহন রায়ের নাম, সেখানে এখন কি বলিতে লজ্জা করে।

* Indian Mirror—*Saturday*—2nd June. 1877—সম্পাদকীয় স্তম্ভ।

কিন্তু যাঁহারা এই মন্দের জন্য ভালর নিন্দা করেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। যাঁহারা তীর্থ-স্থানের পাপ দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করেন, বা আধুনিক গোঁড়া ব্রাহ্মদলের আচরণ দেখিয়া প্রকৃত ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকে আমরা কি বলিয়া ডাকিব? এই জন্যই প্রেততত্ত্ব-মধ্যে এত ভণ্ডামি দেখিয়াও সকলেই যে এইরূপ ভণ্ড তাহা আমরা বলিতেছি না। রবার্ট হেয়ার *, সারজণ্ট, ফক্স, জে-ডেভিস্ প্রভৃতি মহাত্মারা যে সজ্ঞানে সাধারণকে বঞ্চনা করিবেন ইহা আমরা স্বপ্নেও বিশ্বাস করি না।

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, প্রেততত্ত্ববাদীদিগের মূলমন্ত্র দেহশূন্য আত্মার সহিত কথোপকথন। এই তত্ত্বাবিষ্কারের প্রারম্ভেই ইউনাইটেড্ ষ্টেটে এক ভয়ানক আন্দোলন হয়। যখন মেসমার (Mesmer) সাহেব প্রথমতঃ ভৌতিক শক্তির দ্বারা মনুষ্যকে অজ্ঞান করিবার উপায় উদ্ভাবন করেন, সেই সময়ের আন্দোলনও প্রায় এইরূপ হইয়াছিল; প্রথমে মেসমারকে কত লোকে কত কথা বলিয়াছিল, কত পরিহাস করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার উদ্ভাবিত মত এখন পর্য্যন্তও সমান অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে †। প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন দেখ আমাদিগের মত প্রথমে ইউনাইটেড-ষ্টেটে উদ্ভাবিত হয়; তখন লোকে শুনিলে হাসিত, পরিহাস করিত। এখন সেইমত, বিলাতে ইন্‌ডেণ্ট হইয়াছে। মাল সাচ্চা না হইলে কি বিলাতে যায় * এক দিন মেসমেরিসমের মত আমাদিগের প্রেততত্ত্ব ও পূজিত হইবে।

যখন কেহ কোন ঘটনা দেখিয়া তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন প্রধানতঃ দেখা উচিত ঘটনাটি সত্য কি না? মৃত দার্শনিক হ্যামিলটন সাহেব † বলিয়াছেন যে, এক বার শিক্ষিতদিগের মধ্যে মহা গোলযোগ বাধিয়াছিল। জীবিত মৎস্য অপেক্ষা মৃত মৎস্য ওজনে ভারী কেন? এই প্রশ্ন লইয়া নানা মুনির নানা রূপ মত প্রকাশিত হইল। কিন্তু কোন উত্তরই সন্তোষজনক হইল না। শেষে একজন সাহেব ঘটনাটি সত্য কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখেন সর্ব্বমিথ্যা। মেসমেরিসম্ যখন আবিষ্কৃত হইল, তখন পণ্ডিত মণ্ডলী ঘটনা সত্য কিনা প্রথমতঃ পরীক্ষা

---

* Robert Hare M D. Professer of Clemistry in the University of Pennsylvania.

† সুবিখ্যাত ফক্স সাহেব একটি সভার সভাপতি হইয়া মেসমেরিসম (Mesmerism) সম্বন্ধে কতকগুলি সুন্দর উপদেশ দেন। বাহুল্য ভয়ে সেগুলি এখানে উদ্ধৃত হইল না। দ্রষ্টব্য The Indian Daily News —27th January-1877—Extracts.

* ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরে ইউনাইটেড ষ্টেট হইতে প্রেততত্ত্ব বিলাতে যায়।

† Lectures on metaphysics.

আরম্ভ করেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, ঘটনা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না; তখন নানা মুনির নানারূপ ব্যাখ্যা প্রকাশ। পরিশেষে সুবিখ্যাত ব্রেড্ (Mr Braid) সাহেবের ব্যাখ্যাই ইহার মূলকারণ প্রকাশ করিয়া দেয়।

প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেকগুলি ঘটনা পরীক্ষিত হইয়াছে। কতকগুলি পরীক্ষার তীক্ষ্ণাস্ত্র সহ্য করিতে পারে নাই। যেগুলি সহ্য করিয়াছে তাহার অনেকরূপ ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রেততত্ত্ববাদীদিগের ব্যাখ্যা এই যে, সে সকল প্রেতের কার্য্য। আমরা অন্যান্য ব্যাখ্যাগুলির সারবত্তা ভবিষ্যতে বিবেচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ঘটনাগুলি পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। তাঁহারা দেখুন ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করিবার উপযুক্ত,না ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা মাত্র।

আমরা এপ্রবন্ধ শেষ করিলাম। প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিব, তাহা এই উত্তম সম্প্রদায়কেই বুঝাইবে। প্রবঞ্চকদিগের সহিত আমাদিগের কোনও সম্বন্ধ নাই।

শ্রীম,লা,শেঠ।

সংক্ষিপ্তসমালোচন।

১। "ভারত গান। ভারতের প্রাচীন এবং বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধীয় এবং স্বদেশানুরাগোদ্দীপক একশত গীত। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।"—এই গীতমালা একটি উপাদেয় বস্তু। ইহাতে যে সকল গীত নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই প্রশংসার্হ;—রচনা প্রাঞ্জল, শব্দবিন্যাস মধুর এবং সমস্তই অক্লেশ-রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে,এই গীতগুলি অন্যান্য অংশে এইরূপ প্রশংসনীয় হইয়াও, উদ্দীপনার অভাবে প্রাণশূন্য হইয়াছে। গ্রন্থকার যদি কোন অপরিচিতনামা নূতন ব্যক্তি হইতেন, তাহা হইলে আমরা একথা বলিতাম না। তাদৃশ স্থলে শুধু প্রশংসা দ্বারাই আমরা গ্রন্থকারের অভিবাদন করিতাম। কিন্তু আমাদিগের বহুদিনের পরিচিত সুহৃদ্ বাবু রাজকৃষ্ণ রায় যখন এই গ্রন্থের রচয়িতা, তখন ন্যায়ের অনুরোধে এবং বোধ হয় প্রণয়েরও অনুরোধে, তাঁহাকে ইহা জানান আবশ্যক যে, ভারতগানের কোথাও প্রকৃত উদ্দীপনার স্ফূর্ত্তি নাই, এবং উদ্দীপনার অভাবে ইহার মাধুর্য্যে মদিরা নাই, ইহার বিলাপে বেদনা নাই, এবং ইহার ললিতপদাবলীতে প্রায় অধিকাংশস্থলেই কবিতার প্রকৃত প্রাণনাই।

বাগ্মী সকল সময়েই উদ্দীপনার উপাসক। কারণ যে বক্তৃতায় উদ্দীপনা নাই, তাহা যার পর নাই শ্রুতিমধুর হইলেও প্রাণের মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কবি সকল সময়ে উদ্দীপনার উপাসনা করেন না। সাধারণতঃ, সৌন্দর্য্যই তাঁহার আরাধ্য বস্তু, এবং স্বকীয় চিত্রতু-

লিকায় সৌন্দর্য্য ফলাইতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। কিন্তু যে সময়ে কবি, কোন বিষয়ের বর্ণনা করিতে না যাইয়া, জাতীয়হৃদয়ের নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নিকে পুনরুদ্দীপন করিতে অভিলাষী হন, তখন উদ্দীপনাই তাঁহার উপাস্য দেবতা। রাজকৃষ্ণ বাবুর ভারতগানে উদ্দীপনার মোহময়ী মদিরা আছে কি না, তাহা পাঠকবর্গ নিম্নোদ্ধৃত গীতগুলি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলেই অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

আড়ানা-বাহার—রূপক।

এখনো কি হেতু, শশী! মুখভরা মৃদু হাসি
নিরখি তোমার, বল, কি এর কারণ?
সপ্ত সত বর্ষ আগে তুমি যে উজ্জ্বল রাগে
রঞ্জিতে ভারত-কায় আজো কি তেমন?
কথারাখ, মাথাখাও, চিরতরে ফিরেযাও,
কাঁদিবার দিনেহাস, ছি ছি একেমন?
কৃষ্ণরেখা কিছু নয়, কলঙ্কের পরিচয়
এহাসে প্রকাশ হ'ল;—হেস না এমন।৬

সারঙ্গ—একতালা।

হে দিবাকর! সর সর সর,
জলদে লুকাও নিজ কলেবর,
দিবা দ্বিপ্রহরে ভারত কাতর,
অধীর পরাণ, আকুল কায়;
একে আঁখি-বারি ঝর ঝর ঝরে,
তাহে দেহে স্বেদ ঝরে তব করে,
বল দেখি, রবি! ক্ষীণ কলেবরে
কেমনে ভারত বাঁচিবে, হায়!
কণ্ঠ শুকা'য়েছে দারুণ পিয়াসে,
দেহ শুকা'য়েছে চিন্তার হুতাশে,
হৃদি শুকা'য়েছে শোকের নিশ্বাসে,
আশা শুকা'যেছে নিরাশা-বায়;
এ হেন বিপদে—এ হেন দশায়,
কেন তুমি, ভানু! আকাশের গায়?
সর সর সর;—মর-মর-প্রায়
ভারত জননী কাতরে চায়। ১৬

ভৈরব—আড়চৌতাল।

যা উড়ে পাখি রে! ডেক না, ডেক না
ও মধুর বোলে তমালে;
জাগিবে ভারত, জাগিবে হৃত শোক,
ভাসিবে আঁখি জলজালে।
দুখের প্রভাতে সুখের সঙ্গীত
কেন তোর গল, বল, ঢালে;—
এবে রে তোমার সুধার সুধার
বিষধার ভারত-ভালে। ১১

রামকেলী—রূপত্রিতালী (ঢিমা তেতালা)।

অয়ি ফুলকুলরাণি মধুমুখি কমলিনি!
ফুটিয়ে হেস না আর সরসে রে সুহাসিনি!
তুমি যে সরসী-জলে হাসি'ছ বদন তুলে,
ও যে ভারতের অশ্রু,উথলে দিন যামিনী।
মম অনুরোধে আজ,কর,ফুল! এই কাজ,—
হাসির বদলে কাঁদ, মুদিয়া নয়ন;—
ভারতাশ্রুসরসীতে,তোমার সুধাশ্রু তা'তে
কেবল মিশিতে থাক্;—কাঁদ খালি, রে
নলিনি! ৪

এই শেষোদ্ধৃত গীত দুটি সুন্দর ও সুললিত

কবিতা। প্রথমোদ্ধৃত দুইটিও কাব্যাংশে নিতান্ত নিন্দনীয় নহে। কিন্তু ইহার একটিতেও কি উদ্দীপনার লেশমাত্র অনুভূত হয়? উদ্দীপনা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, উহা ফুলের মধু নহে;—উদ্দীপনা মূর্ত্তিমতী তাড়িতশক্তি, উহা আবেশময়ী জ্যোৎস্না নহে। যদি ভারতসংগীতেও সেই উদ্দীপনা পরিস্ফুট না হইল, তবে উহা আর কিসে স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে? ভারতমাতার দুঃখ সমুদ্রের ন্যায় গভীর। সে গভীর দুঃখগীতি সমুদ্রের শোকোন্মত্ত তরঙ্গমালার ন্যায় গভীর নিঃস্বনে বিলাপ করিবে;—সমুদ্রতটবাহি নৈশসমীরণের ন্যায় অলৌকিক নিঃস্বনে রোদন করিতে রহিবে। নহিলে, তাহা ভারতগান নহে।

জাতীয় উদ্দীপনার এইরূপ সংগীত কোন দেশেই সকল সময়ে ফোটে না; বিরহের গীত, মানের গীত অথবা তরল দুঃখের তরল গীতের ন্যায়, সেই সকল অন্তর্ভেদি অপূর্ব্ব গীত যখন তখন এবং যেখানে সেখানেই বাহির হয় না। কিন্তু তাদৃশ জাতীয় গীত, ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের মার্শেলিস নামক গীতের ন্যায়, মনুষ্য কণ্ঠ হইতে যখনই নিঃসৃত হয়, তখনই তাহা হৃদয়ের পর হৃদয়ে আহত ও প্রতিহত হইয়া, প্রমত্ত বহ্নিশিখার ন্যায় সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়ে, এবং যাহার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেই উন্মাদিত করিয়া তুলে।

২। "কৃষিতত্ত্ব। মাসিক পত্রিকা। পাইক পাড়া মর্শারি হইতে প্রকাশিত।" আমরা দুর্ভাগ্য বশতঃ এই পত্রিকা খানির প্রথম সংখ্যা দেখিতে পাই নাই। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা মাত্র পড়িয়াই আমরা নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিলাম। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত হওয়া কর্ত্তব্য, এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই এইরূপ প্রয়োজনোপযোগী সাময়িক পত্রিকার আদর হওয়া উচিত।

৩। "তত্ত্বকৌমুদী, পাক্ষিক পত্রিকা। কলিকাতা, সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।" আমরা এই পত্রের মতামত লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু ইহার বাঙ্গালা এমনই বিশুদ্ধ ও মধুর, প্রাঞ্জল ও প্রীতিপ্রদ যে, আমরা সাধারণ সাহিত্য সমাজের নিকট ইহার যশোগান না করিয়া নিবৃত্ত থাকিতে পারিলাম না। শুনিয়াছি, বাবু শিবনাথ শাস্ত্রি প্রভৃতি কতিপয় সুনিপুণ লেখকের সহিত এই পত্রিকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। যদি সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়, তাহা হইলে দিন দিন ইহার অধিকতর উন্নতি হইবে। তাদৃশ সুরুচিসম্পন্ন, চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহার সম্পাদকতায় নিযুক্ত থাকিলে, ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িক পত্রিকাও সুপাঠ্য হইতে পারে।

৪। "দৈব-লতা। ঢাকা, নূতনযন্ত্রে মুদ্রিত"। এই গ্রন্থে চরিত্র, কর্ত্তব্য, রাজভক্তি, ত্যাগস্বীকার ও সহানুভূতি প্রভৃতি

বিবিধ বিষয়ের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ নিবেশিত হইয়াছে। রচনা এইরূপ,—

"স্বরের আ এবং ময়েতে হ্রস্ব ইকারে মি, এই কি আমি"?—"বিশ্বাস-যানে, চিন্তার অতীত, বুদ্ধিরঅগ্রাহ্য, কল্পনার অগোচর ব্যাপার ইহলোকে পরলোকে আত্যাগত্যা করিতে লাগিল।"—পুনশ্চ, "সহানুভূতি বিশ্বাসের স্কন্ধে চড়িয়া লোক হইতে লোকান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। বিশ্বাসের যান না চলিলে সহানুভূতিও চলে না।"—

গ্রন্থকারের মত ও উপদেশ এইরূপ,—

" এই যে আমরা ইংরেজগবর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে অবস্থান করিতেছি,ইহাই আমাদিগের সার্ব্বভৌমিক উন্নতির প্রচুর নিদান। এতৎপ্রভাবে যদি আমাদের অন্তরে রাজভক্তির কুসুম না ফুটে,তবে আমাদিগের কোন্ নরকে যে বসতি হইবে, তাহা নরকাধিপই অবগত রহিয়াছেন। আমরা যে এখনও তাহা জানি না, ইহাই আমাদিগের তৃপ্তির হেতু।"

এইরূপ গ্রন্থ, গ্রন্থের এইরূপ রচনা এবং রচনার এইরূপ ভাবাদি সম্বন্ধে সমালোচকের অনেক কথা বক্তব্য থাকিতে পারে। বক্তব্য কিছু না থাকুক,অন্ততঃ 'আত্যাগত্যা' প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি,—এবং গ্রন্থকার কাহাকে নরকাধিপ বলেন, আর সেই নরকাধিপই বা কিরূপে 'অবগত রহিয়াছেন' ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থকারের নিকট উপদেশ লইবারও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। কিন্তু পরিণামদর্শী সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার তাহারও পথ রাখেন নাই। তিনি বিজ্ঞাপনে প্রথমেই লিখিয়া রাখিয়াছেন যে,

" যে সমুদয় রচনা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্বকপোলকল্পিত বলিয়া গ্রন্থকার অনুভব করেন নাই। তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, ঐশ্বরিক প্রক্রিয়া ভিন্ন এমন রচনার উৎপত্তি হইতে পারিত না"।

এই কথার উপর আর কথা নাই। মহম্মদ যেমন কোরাণকে ঐশ্বরিক প্রক্রিয়ার রচনা বলিয়াছেন, গ্রন্থকারও যখন তাঁহার এই গ্রন্থখানিকে সেইরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন কে এমন সাহসী, কে এমন উদ্ধত, কে এমন ধর্ম্মভয়শূন্য,—এবং হায়! কেই বা চক্ষুঃস্বত্বে এরূপ অন্ধ যে, এবম্ভূত অলৌকিক বস্তুর সমালোচনা করিতে গিয়া আপনা হইতে বিপদে পড়িবে? কিন্তু তথাপি এই একটিমাত্র কথা আমাদিগের বক্তব্য যে, গ্রন্থের নামটি সর্ব্বাংশেই সাহিত্যবিষয়ক সুরুচির বিরুদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা লৌকিক সাহিত্য পড়িয়া ভাষা শিক্ষা করেন, তাঁহাদিগের বিবেচনায় দৈবলতার পরিবর্ত্তে ইহার নাম দিব্যলতা হওয়া উচিত ছিল। কারণ, যদিও দৈবশব্দের এক অর্থ 'দেবতাসম্বন্ধীয়'—কিন্তু ইহার আর এক অর্থ উৎপাত, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই অর্থই অধিকতর প্রচলিত।

অগ্নি।

ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্‌ব্যোম—অর্থাৎ মৃত্তিকা জল তেজ অগ্নি এবং আকাশ, এই কএকটি মূল বা অমিশ্র র্থ বলিয়া স্থিরিকৃত হইয়াছিল। রস 'স্ত্রের উন্নতির পূর্ব্বে এ মহা ভ্রম কেব যে হিন্দুদিগের ছিল তাহা নহে। হিন্দুরা ব্রহ্মার পূজা করেন, পারশিকেরা ও তাহারই উপাশক, গ্রিক বা রোমকেরাও অগ্নির পূজা করিতেন। পূর্ব্বের লোকের বিশ্বাস ছিল এই ভ্রমাত্মক পঞ্চভূত, ঈশ্বরের অবতার, এবং মুর্ত্তিমান্ দেবতা। সম্ভবতঃ এই বিশ্বাস বা ইহাদিগের প্রবল স্বাভাবিক শক্তির উপর লক্ষ করিয়া আধুনীক মানবগণের পুর্ব্ব পুরুষগণ ইহাদিগের প্রতি মহা শ্রদ্ধা করিতেন। আমাদিগের কথা দূরে থাকুক, পেরিপেট্রিয়ন * দিগের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতেও ইহারা আদীম, অবিনশ্বর অমিশ্র এবং মূল পদার্থ বলিয়া গণনীয় হইয়াছিল। এমন কি মিলটন্ পর্য্যন্তও ইহাদিগের মৌলিকত্ব এবং অমিশ্রত্ব স্বীকার করিতেন। পাঠকগণ 'প্যারাডাইসলষ্টের' দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২৩৪ শ্লোকটি পাঠ করিয়া দেখিবেন। সেল সাহেবের অনুবাদিত, কোরাণের ২য় খণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"অবিশ্বাসীরা জানেনা, যে পৃথিবী কেবল একটি পরমাণুপুঞ্জ মাত্র, কঠিন পদার্থ সর্ব্ব ব্যাপৃত অনন্ত জলরাশীর এক পার্শ্বে পড়িয়া ছিল, এবং সেই জল দ্বারা বৃক্ষাদি ও ভূচর ক্ষেচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীর মজ্জা আমি করিয়াছি"—ফলতঃ এ মহাভ্রমের হস্ত হইতে মুসলমান দেবতা মহম্মদের ও নিষ্কৃতি ছিলনা। কিন্তু কালের প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে ক্রমেই এসকল কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। জল যে গর্ব্ব করিতেন আমি আদি, আমি অমিশ্র, অমর, এবং স্বাধীন, হাইড্রজান, এবং অক্‌সিযান ইহার জন্মদাতা বলিয়া আবিষ্কৃত হওয়াতে সে গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে। যাহাহউক জল, বায়ু, পৃথিবী প্রভৃতি মিশ্র না হইলেও প্রকৃতিভূত পদার্থ। বুঝিলাম, জল তবে পদার্থ, স্বীকার করিলাম মৃত্তিকাও তবে পদার্থ, এবং বায়ুও বটে, কিন্তু অগ্নি কি? অগ্নির রহস্য ভেদ বহুকাল পর্য্যন্ত হয় নাই, আজিও এসম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত, তাহাতেই আমরা বলি অগ্নি তবে কি? যে অগ্নি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেও জল মৃত্তিকাদির ন্যায় একটি পদার্থ ছিল,—এখন নাকি আর তাহা মূলে পদার্থই নয়। ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন, যে কোন প্রকারের অগ্নিই হউক না কেন, (স্বাভাবিক

* অরিষ্টোটেল এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ।

কৃত্রিম, ঘর্ষিত, বা উত্তাপজ) উহা নিরতিশয় সূক্ষ্ম তরল, বিক্রমশীল, সদা-গতিবান্ অত্যন্ত প্রসরণক্ষম, অতীব স্থিতিস্থাপক, পদার্থ মাত্রকেই সংকোচন বা বিস্তার করিবার ক্ষমতাযুক্ত, সর্ব্বশরীরে প্রবেশক্ষম, এবং তাহাদিগকে রূপান্তর করিবার গুণযুক্ত, ও তাহাদিগের যোগবিধানক্ষম, এবং তাহার পর প্রদর্শিত সমস্তগুণপরিহার ক্ষম। বাহ্য বস্তু সমূহের সহিত অগ্নির এই স্বভাবের নাম (Stahl) খাঁ সাহেব (Phlogistion) নিত্যাগ্নি রাখিয়াছেন, অপর পণ্ডিতেরা (Fixed fire) বদ্ধ অগ্নি কহেন। খাঁ সাহেবের মত এই, মনে কর একখানী চকমকী পাথর আছে উহাতে লৌহদ্বারা আঘাত করিলে অগ্নি নির্গত হয়, ঐ অগ্নি কোথা হইতে আসিল, যদি বল, আঘাতে পরমাণুর সংঘাত হইয়াছে তাহাতেই তেজকণার উৎপত্তি হইয়াছে। খাঁ সাহেব বলিবেন তবে স্বীকার করিতে হইবে চকমকী জ্বলনীয় পদার্থ, তবে যে উহা জ্বলিয়া উঠে না, ইহার কারণ কি ? সুতরাং উহা গৌণ অগ্নি, অর্থাৎ উহার পরমাণুসমূহ অগ্নিপূরিত। খাঁ সাহেবের সমকালে এক দলে বলিতেন, উহা অগ্নির পরমাণু এবং এক প্রকার কাঁচ জাতীয় মৃত্তিকায় সংগঠিত, অপর দল বলিতেন উহা শুদ্ধ অগ্নির অণুতে নির্ম্মিত। আধুনিক পণ্ডিতেরা বলেন যে উহা অগ্নি উৎপাদন করিবার আপেক্ষিক কারণ,—পরমাণুতে পরমাণুতে সংঘাত লাগিয়া ভয়ানক বেগে যখন সেই সমস্ত পরমাণুর গতি হয়, সেই গতিজনিত উত্তাপই অগ্নি। যতক্ষণ পরমাণুগণ স্থির না হইবে ততক্ষণ তাহার কার্য্য প্রকাশ হইতে থাকিবে, সুতরাং যে পরিমাণ আঘাতে চকমকী হইতে অগ্নি নির্গত হয়, উহাতে উহার সমস্ত প' [illegible]ুর তুমুল গতি হয় না। ঐ চকমকী [illegible]দশে কর্ম্ম যতটুকু হয়, ক্রিয়া ততটু প্রমাণে প্রকাশ পায়। অল্প বা অধিক পরিমাণে সকল বস্তুতেই জ্বলন কার্য্য প্রকাশমান হইয়া থাকে। উহা তদ্ বস্তুর রাসায়নীক সংযোগের বৈলক্ষণ্য প্রযুক্তই ঘটিয়া থাকে।

যাহা হউক, খাঁসাহেবের (Phlogistion) কি তাহাই আমরা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। সকল বস্তুরই অধিক কি অল্প পরিমাণ অগ্নি উৎপাদন বা অগ্নি ধারণ করিবার স্বভাব আছে বস্তুর যে গুণ থাকাতে ঐরূপ হয তাহারই নাম (Phlogistion) বাঙ্গলায় জ্বলনীয় কিম্বিয় বা রাসায়নীক রস বলিলেও উহার প্রকৃত অর্থ বোধ হয় না। যাহাহউক উহাকে আরো ভাল করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিব। তীক্ষ্ণধার তরল (Fluid) ব্যতীত কিছুই গলিত হইতে পারে না। কিন্তু স্বভাবে অগ্নি অপেক্ষায় দ্রবকারী আর কিছুই নাই। অতএব অগ্নিই দ্রব-বীজ, বা দ্রবজীবন। জল যে দ্রবগুণসম্পন্ন, এবং অন্যকেও দ্রব করিতে পারে তাহাও কেবল মাত্র অগ্নি হইতে। অগ্নি ক্রিয়ার ঐ

রূপ কল যাহাতেই স্থিতি করে তাহাই Phlogistion বদ্ধ অগ্নি। পারদ স্বর্ণের সহিত মিলিতে, জল লবণকে গুলিতে যাহা, দ্রবকে জ্বলনশীল করিবার জন্য ষ্টা সাহেবের Phlogistion ও তাহাই। ইহার কার্য্য গন্ধক, তৈল, এবং পাথরিয়া কয়লাতে অধিক পরিমাণে প্রকাশ পায়, সুতরাং উহারাই ষ্টা সাহেবের মতে অগ্নি-ধারক। তবেই তাহার মতে, অগ্নি স্থায়ী, নিত্য, এবং পদার্থহৃদয়বাসী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

(Boerhave) বোয়েরহেভে সাহেব অগ্নির দুইপ্রকার প্রকার-ভেদ করেন। একটি মূল অগ্নি, অর্থাৎ শুদ্ধ অগ্নি, এবং অনপেক্ষিক, অপরটী আপেক্ষিকী, অর্থাৎ অন্য বস্তুর যোগে কার্য্য প্রকাশ করে। তাঁহার মতে উত্তাপের মুখ্যকারণই মূলাগ্নি। উত্তাপ অগ্নি হইতে বিভেদ্য নহে। উত্তাপের পরিমাণ, অগ্নির পরিমাণ বিশেষ। যাহা অগ্নি তাহাই উত্তাপ। কঠিন বস্তুর অনুপ্রসরণ, এবং দ্রব বস্তুর অনুসংকোচন, ক্রিয়া মূলাগ্নির দ্বিতীয় ফল। একখানি লৌহ উত্তপ্ত হইলে, ইহার বিস্তৃতি বর্দ্ধিত হয়, এবং উত্তাপ অধিকপরিমাণে দিলে পুনরায় আরো বর্দ্ধিত হয়, আবার স্নিগ্ধ হইলে, সংকুচিত হয়। এবং পূর্ব্বে যত বড় ছিল তাহাই হয়। স্বর্ণকে গলাইলে পূর্ব্ব হইতে অধিক স্থান গ্রহণ করে। একটি সরু নলের ভিতরে পারদ রাখিয়া উত্তাপ দিলে, পূর্ব্বে যতটুকু স্থান লইয়া ছিল, তাহার ত্রিংশত গুণ অধিক উচ্চে উঠিবে।

বস্তুর এরূপ বিস্তৃতির কারণ বোয়েরহেভে সাহেবই আবিষ্কার করেন। প্রথমতঃ যথা। দ্রব দ্রব্য যতটুকু সময়ে, যে পরিমাণ অগ্নিতে যত অধিক বিস্তৃতি লাভ করিবে, কঠিন দ্রব্য, ঠিক সেই পরিমাণ সময়ে, এবং সেই পরিমাণ অগ্নিতে সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারিবে না। এই নিয়মের অন্যথা হইলে তাপমাপক যন্ত্র কার্য্যকারী হইতে পারিত না, কেননা, তাহা হইলে যে সময়ে এবং যে উত্তাপে পারদ বিস্তৃতি লাভ করিত, নলের অভ্যন্তরস্থ রন্ধ্র ও তবে ঠিক ঐ সময়ে এবং ঐ উত্তাপে আপনি বিস্তৃত হইত। দ্বিতীয়তঃ। দ্রব দ্রব্য যত লঘু হইবে, অগ্নি তাপে উহার তত বিস্তার হইবে। তিনি বলেন, বায়ুর ন্যায় লঘু বস্তু বিরল, অথচ উহার ন্যায় আর কোন দ্রব্য অধিক ছড়াইয়া পড়েনা। বায়ুর পরেই ঐ গুণ সুরাসার বা স্পিরিট্ অব্ ওয়াইনের অধিক। তিনি আরো বলেন, প্রকৃতিতে যত প্রকার শক্তি এবং গতির উৎপত্তি হয়, অগ্নিই তাহার কারণ। তাহা হইতে অগ্নিকে স্বতন্ত্র করিয়া লইলে সমস্ত যত পদার্থ অচল হইয়া পড়িয়া থাকিত। এবং অগ্নির অভাবে, জল, তৈল, সুরাসার জীব-দেহ, উদ্ভিদ সমস্তই কঠিন, জীবনহীন এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত। যদি অসাধারণ শীতপ্রবাহে, জগতের সমস্ত অগ্নি, বিনাশ হইয়া যায় তাহা হইলে, এই জড়-

অর্থাৎ স্বর্ণ ও হিরকের ন্যায় মহা কাঠিন্যময় একটি স্তুপাকার বস্তু হইয়া পড়িয়া থাকিবে। এবং অগ্নিপ্রয়োগে পুনরায় উহা প্রকিতিস্থ হইবে।

বোনেরহেভের কথিত, মুলাগ্নি সংরক্ষণ বা গ্রহণ করিতে হইলে, যে আগুণের আহার বা বায়ু যোগাইতে হয় না। যদি কিয়ৎপরিমাণ কোন সৌগন্ধিক তৈলসার, শূন্য হইতে যবক্ষারিক স্থরায় ঢালা যায়,তৎক্ষণাৎ (উহা হইতে ভয়ানক অগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। তিনি বলেন কতক গুলিন উপায়ে মুল অগ্নির কল জানা যাইতে পারে। যথা সকলেই জানে, চকমকী ও লৌহের ঘর্ষণে, অগ্নি উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ এক দ্রব্যে অন্য দ্রব্য কর্ত্তৃক বিষম সংঘাত পাইলেই তাহা হইতে অগ্নি উঠিবে, এই জন্য দুগ্ধ টানিলে নবনীত তাহা হইতে স্বতন্ত্র হয়। ছুরি কি ক্ষুর সানাইবার সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়,—এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, অগ্নি মৌলীক পদার্থ। নতুবা যাহাতে অগ্নি ছিল না তাহা হইতে অগ্নি কখনই জাত হইবার সম্ভাবনা নহে।

যদি অত্যন্ত শীতের দিনে একখানি স্বর্ণথালী আর একখানি স্বর্ণথালীর সহিত বলপুর্ব্বক ঘর্ষণ করা যায়, তবে ঘর্ষণে ঘর্ষণে মহাউত্তপ্ত হইয়া রক্তবর্ণ এবং পরে গলিবার উপক্রম হইলেও কিঞ্চিন্মাত্রায় ও তাহার গুরুত্বের ধ্বংশ হইবে না, কেবল আয়তনে বৃদ্ধি হইবে, বা স্ফীত হইবে, ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, সংঘর্ষণে স্বর্ণের একটিমাত্র অণুও অগ্নিরূপে পরিণত বা পরিবর্ত্তিত হয় না।—কেন না অগ্নি উহাতে পূর্ব্ব হইতেই আছে। ঘর্ষণ মর্দ্দনের ফলে এইমাত্র হয় যে, যাহা পূর্ব্ব হইতে স্থিতি করিতেছে তাহারই কিয়দংশ সংগ্রহ করিতে বা আনিতে পারা যায়, উহার ফল এরূপ নহে যে, উহা হইতে অগ্নি জন্মাইতে বা করিতে পারা যায়। তবে, আমরা এই পর্য্যন্ত করি যে অপ্রজ্বলিতকে জ্বালিত করি, এবং বহুস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া কোন সঙ্কীর্ণস্থানে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য স্থাপন করি।

এতদ্ব্যতীত বোএরহেভে সাহেব আরো বলেন যে, যেরূপ নিত্যাগ্নি অনন্তকাল হইতে অহরহ সর্ব্বদ্রব্যে দ্রব্যে স্থিতি করিতেছে উহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও তদনুরূপ অবস্থায় বিরাজিত আছে। তিনি বলেন ৪০ বা ৫০ ফিট মৃত্তিকার নিম্নদেশ এত উষ্ণ যে তথায় বরফ থাকিতে পারে না, তাহা হইতে আরো গভীরতর প্রদেশ এতাধিক উষ্ণ যে তথায় ক্ষণকালও তিষ্ঠিতে পারা যায় না। মৃত্তিকার গভীরতম প্রদেশের এই উষ্ণ ভাব দৃষ্টে তিনি বলেন, যে ভূগর্ভে আর একটি অগ্নির আকর বা সূর্য্য আছে। তাহাতেই, যাহারা ভূগর্ভে বা পৃষ্ঠে জন্মে তাহাদের জীবন রক্ষা এবং গতি বিধান করিতেছে এমন কি ভূকেন্দ্রে কেবল অগ্নি ব্যতিত আর কিছুই নাই। এবং এই মহা অনল, অনন্ত কাল

হইতে বিরাজ করিতেছে। তিনি ইহাও বলেন, ভূচর, খেচর, জলচর, প্রভৃতির ন্যায় অগ্নিচর জীব পর্য্যন্ত আছে। বহুকাল পোষিত বৃহৎ অনল কুণ্ড, অত্যুৎকৃষ্ট আতশ পাথর দ্বারা পরীক্ষা করিলে এই সকল জীব দেখা যায়, এই সকল অনলবাসী জীবের নাম (Salamandor) সালামাণ্ডর। এখন দেখা যাইবে বোএরহেভে সাহেবের যুক্তি নিয়ম কতদূর সুসঙ্গত।

তাহার পরবর্ত্তী রসায়ণবিদেরা আগ্নেয় কার্য্যের চারিটি তাপাংশ পরিমাণ করিয়াছেন। প্রথমটি মানবশরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতার তুল্য, বা যে পরিমাণ উষ্ণত্বে কপোত ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হয়। ডিম্বের সহিত একটি তাপ পরিমাপক যন্ত্র রাখিয়া তদুপরি একটি কপোতিনীকে বসাইয়া এই তাপাংশ পরিমিত হইয়াছে। কোন কোন রাসায়নিক আবার এই পরিমাণ উত্তপ্ত দায়ক আগুন, কপোতিনীর পরিবর্ত্তে ডিম্বের চতুর্দ্দিগে রাখিয়া তদ্দ্বারা ডিম ফুটাইয়াছেন। অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় সূর্য্য কীরণ শরীরে লাগিলে জ্বালা করে, বা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্ম্মে বেদনা হয়, অথবা যে পরিমাণ উত্তাপে চর্ম্মে ফোস্কা পড়ে, কিন্তু তদ্দ্বারা শরীরের কোন অংশের ধ্বংশ বা অভাব হয় না, ইহাই তাপের দ্বিতীয় পরিমাণ। এই পরিমাণ তাপেই মনুষ্যরক্তে শ্লেষ্মবৎ এক পদার্থ (Serum) জম্মে এবং ডিম্বের—দ্রবীভূত ধবলাংশ কঠিন হয়, সময়ে সময়ে এই পরিমাণ উত্তাপেই আবার ভয়ানক গাত্র দাহ হইতে পারে, ইহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে পরিমাণ উত্তাপে জল অতিশয় গরম হয়, ইহাই উত্তাপের তৃতীয় পরিমাণ। তাহারা বিবেচনা করেন উত্তাপের এই পরিমাণই সম্পূর্ণ অটল। কেন না, জল যত উত্তাপ সহিতে পারে অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় উত্তাপে উষ্ণ করিলে (পাত্রের মুখ খুলিয়া বাষ্প উঠিতে দিলেও) যে পরিমাণ তাহার উত্তাপ বৃদ্ধি হইবে, আর হাজার কাষ্ঠ দগ্ধ করিলে, কি আরো উত্তাপ দিলে কিছুতেই তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই সকল প্রাচীন রাসায়নিক বোধ হয় জানিতেন না যে, সমুদ্র সমতল স্থানের উষ্ণ জলের উত্তাপ, ব্লাঙ্ক গিরির উপরিভাগের উত্তপ্ত জলের উত্তাপ হইতে স্বতন্ত্র। আর পেপিন * সাহেব উত্তাপের পরিমাণ সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার যুক্তিনিচয় ও সম্ভবতঃ সিদ্ধ বা পরীক্ষিত নহে। যে উত্তাপে ধাতু বা অন্য কোন দ্রব্যকে ধ্বংশ বা দ্রবীভূত করিতে পারে, তাহা উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ।

উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ যে কিরূপে নিরূপিত হইল বুঝিতে পারা যায় না। তাপপরিমাপক যন্ত্র ও বোধ হয়, এত প্রচণ্ড উত্তাপে বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। যে সময়ে এই সকল মত প্রচলিত হয় বোধ

* প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে এই ভয়ে উক্ত ভ্রমাত্মক মত অপ্রকাশিত রহিল।

হয় ওএজউডের অনলপরিমাপক যন্ত্রের (Wedge wood's Pyrometer) সর্জ্জন, বা সেবিষয়ের চিন্তা কাহারও মনে উদয় হয় নাই, ইহাতেই অনুমিত হইতে পারে যে উত্তাপের চতুর্থ পরিমাণ কেবল মাত্র অনুমান এবং ধাতুর দ্রবত্বাবস্থা দেখিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। উষ্ণ জলের উত্তাপ যেমন বৃদ্ধি হইতে পারে না, কিন্তু দ্রবীভূত ধাতুর উত্তাপ-পরিমাণ জানিবার যদি তাহাদিগের কোন উপায় ছিল না তবে ইহা তাঁহাব কিরূপে জানিলেন ?—যাহাহউক প্রাচীন রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ মণ্ডলীর মতে উত্তাপের এই শেষ পরিমাণ। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী বিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞসম্প্রদায়,আর একটি পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া,উত্তাপের পঞ্চম পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। এই উত্তাপে, স্বর্ণ হইতে ধূম এবং বাষ্প নির্গত করায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে মন্সুর সিরাঙ্গহোসেণ্ড (M. Tschirnhausen) প্রমাণ করিয়াছেন যে, স্বর্ণ উত্তাপে একেবারে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে পারে। তাহার পর এই অগ্নিময় দৃশ্যে, তাপক (Caloric) নামে এক সূক্ষ্ম দ্রব্য লীলা করিতে থাকে। সিরাঙ্গহুসেণ্ডের পরে তাপকই অগ্নিজনক বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক নির্ণীত হয়। যাহাতে, উত্তাপের অনুভূতি প্রকাশমান করে, তাহারই নাম " তাপক " রাখা হইয়াছিল। এই তাপকই বরফকে গলিত করে, জল উত্তপ্ত করে এবং লৌহকে রক্তোত্তপ্ত করিয়া তুলে। তবে এই উত্তাপক কি ? ইহাকে কি তবে পদার্থ বলিব, না কি বলিব ? উত্তাপসম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে তন্মধ্যে কেবল দুইটি পরীক্ষিত এবং প্রমাণ্য বলিয়া, অদ্যাপি মানবের বিশ্বাসক্ষেত্রে সজীব রহিয়াছে। একটি (Theory of Emission) উৎক্ষেপণ অনুমান, দ্বিতীয়টি (Theory of Undulation) গতিতরঙ্গ অনুমান।

প্রথম অনুমান। উত্তাপের কারণ ভূতাত্মক, বায়ুর ন্যায় বা বায়ু হইতে উহা সূক্ষ্ম তরল এক শরীর হইতে শরীরান্তরে গমনক্ষম, এবং উহার পরমাণু নিচয় অবিশ্রান্ত অন্বাকর্ষণাবস্থাপন্ন।(In a state of repulsion) এই সূক্ষ্ম ধার তরল, সকল দ্রব্যেরই মূল পরমাণুর সহিত বাস করে, অথচ কাহারও সহিত প্রকৃতরূপ সুযুক্ত হয় না। এই হিসাবে উত্তাপক নামক যে সূক্ষ্ম ধার তরল, তাহা বস্তু, কিন্তু ভৌতিক উত্তাপক প্রমাণতঃ দিন দিন জীর্ণাবস্থা পাইতেছে। তাপকের পরিমাণ বা মূর্ত্তি পরিমাপনীয় নহে। এমন মহা সূক্ষ্ম কোন যন্ত্র অদ্যাপি মানববুদ্ধিতে প্রস্তুত হয় নাই যাহাতে উহার পরিমাণ করা যাইতে পারে বা উহার স্বরূপ অবগত হইতে পারা যায়। আমাদিগের ক্ষমতায় যখন উহার পরিমাণ করিবার সাধ্য নাই তখন আমাদিগের ইহাও বলা উচিত নহে, যে উহার গুরুত্ব নাই। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এখন অনেকেই বলেন যে মূলেই উহার গুরুত্ব নাস্তি।

গতি-তরঙ্গ, বা দ্বিতীয় অনুমান এই যে—পদার্থের পরমাণুর উত্তাল তরঙ্গাভিঘাতে,—উত্তাপ উপস্থিত করে। সে তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া, অত্যন্ত লঘু, এবং স্থিতিস্থাপকগুণবিশিষ্ট একটি তরল পদার্থের সাহায্যে অন্য বস্তুর পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়, ইহাকেই ইথর (Ether) বলে। যেরূপ বায়ু মণ্ডলে শব্দতরঙ্গ ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, সেইরূপ ইথর মণ্ডলে পরমাণু তরঙ্গোৎপাদিত উত্তাপও নৃত্য করিয়া বেড়ায়। যে দ্রব্যের পরমাণুতরঙ্গ তবে যত বিস্তারময় এবং যত দ্রুতবেগবিশিষ্ট, সেই বস্তুর শরীর তত অধিক উত্তাপযুক্ত হয়। উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি কেবল পরমাণুতরঙ্গের গতির অনুপাতানুসারেই হইয়া থাকে, আর কিছুই নহে। প্রথম অনুমান মতে, উত্তাপক জড় পদার্থকে পরিত্যাগ করিলেই তাহার স্নিগ্ধত্ব সম্পাদিত হয়। দ্বিতীয় অনুমানসিদ্ধ ফল তাহা নহে। পরমাণুগণ তরঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেই তত্তৎ শরীরির দেহ শীতল হয়। এই দ্বিতীয় অনুমানে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শব্দের ন্যায়, অগ্নিও বস্তুত্ব সম্পন্ন নহে। কেবল বায়বীয় তরঙ্গাভিঘাতের অনুভূতি বা দমক মাত্র। 'শব্দ' ও গতি ব্যতীত কিছু নহে। যদিও প্রাচীন ইউরোপীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রে * শব্দ এবং গতির মূল নির্দ্দিষ্ট নাই—তথাপি 'শব্দ' গতি (Motion) মাত্র বলিয়া অনুমিত হওয়া সর্ব্বথাই যুক্তি সঙ্গত। শ্রবণ সম্বন্ধে যিনি কিঞ্চিত অভিনিবেশ প্রদান করিবেন—উহার উৎপত্তি যে কেবল সাধারণ গতি হইতে, তাহারই মনে একরূপ একটি ভাব উপলব্ধি হইবে। যদিও শব্দ কেবল মাত্র গতি তথাপি আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি—শব্দ যাইতেছে, শব্দ উত্থিত হইতেছে। উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎ ইহারা যে কেবল গতি মাত্র এবং বস্তু নহে তাহা কাহারও মনে ধারণা করাইবার জন্য এখন বোধ হয় আর আমাদিগকে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না।

* এদেশীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রের কোন কথা আমি অবগত নহি। লেখক।

গতিতারঙ্গিক, বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মতে অগ্নি বস্তু নহে, কার্য্য, পরিবর্ত্তন, বা গতি। ইহা কি ভৌতিক পদার্থ, কি রাসায়নিক পদার্থ, কি বৃহৎ, কি ক্ষুদ্র, কি ভার, কি লঘু, কি তরল, কি দ্রব, কিছুই নহে। ইহার সংস্পর্শে ইথর (Ether) অনুতরঙ্গমালা হইতে উত্তাপকে বহন করিয়া তাহার সমষ্টিতে অনল রচনা করে।

অগ্নি বলিতে গেলেই একবারে স্বভাবের কতগুলিন প্রকৃতিকে বুঝায়—যথা—উত্তাপ, রূপান্তরক্রিয়া, বিস্তারক্রিয়া, এবং বাষ্পিয়ক্রিয়া প্রভৃতি। কাহারও মতানুসারে ইহা (Caloric) উত্তাপকের কার্য্য। এবং কাহারও মতে—কেবল পরমাণুর তরঙ্গে বা গতিতে এরূপ হইয়া

থাকে। দহনশীল পদার্থের দহন ক্রিয়াকেই অগ্নি বলিতে হইবে। যাহাতে ইথর সংমিশ্র অম্লজান (অকসিজন) কিছু অধিক পরিমাণে থাকে, বা কৌশলে কোনও বস্তুকে উক্ত ধর্ম্মাক্রান্ত করা যায় তাহাই দহনশীল পদার্থ।—তাই বলিয়া যে ঐ বস্তু বায়ুর মধ্যে রাখিলা দিলে যে আপনি জ্বলিয়া উঠিবে তাহা নহে। যাহাতে এমন গুণ আছে যে অল্প বা অধিক যোগে ইহার পরিপুষ্ট অকসিজন বায়ু শোষণ করিতে পারে, বা উহার ক্ষতি কিম্বা প্রজ্বলন ক্রিয়ার অভাব ঘটাইতে পারে, তাহাও এক প্রকার দাহ্য। এমন বস্তু কি সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না যাহার প্রচণ্ড উত্তাপ আছে, অথচ যাহা ধীরে২ এমন ভাবে জ্বলে যে তাহাতে শিখা, বা অন্য কোনরূপ জ্বলন ক্রিয়া প্রকাশ না পাইয়া কেবল মাত্র তাহার শারীরিক দহনীয় বস্তু টুকু নিঃশেষিত হইয়া যায়? তাহাতে অগ্নিশিখার অনুপস্থিতি স্বত্বেও তাহা সামান্য দহনশীল পদার্থ নহে।

এরূপ স্তিমিত দহন ক্রিয়া সমস্ত উষ্ণ রক্তসম্পন্ন জীব জন্তু শরীরেও হইতেছে। অনাহারে জীবদেহের উত্তাপকে ক্ষীণতর করে, এবং তাহারা দীর্ঘকাল অনাহারে থাকিলেও, যত দিন দেহের দাহ্য পদার্থ নিঃশেষিত না হয়, ততদিন পুড়িতে থাকে, যখন দাহ্য সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয় তখনই জীবদেহ ভয়ঙ্কর শীতলভাব ধারণ করে তাহাই তাহার মৃত্যু। জীবদেহের শক্তি ও কেবল, অঙ্গারক (Carbon) এবং উদ্‌জান, (Hydrogen) তাহাদের, আহারীয় দ্রব্যে প্রচুর থাকে বলিয়া ষ্টিমার কয়লাব্যতিত যেরূপ শক্তি বিহীন হইয়া পড়ে, ঘোটকেরও ঘাস এবং যব বা বুটের অভাবে তদবস্থপন্ন হইতে হয়। এবং দস্তা না থাকিলে বোল্‌তাইক * যন্ত্রেরও শক্তি লোপ হয়।—কোন২ রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যেখানে ধাতু দ্রব্যাদি গলান যায়, সেখানে ১০ হইতে ২০ গুণ পর্য্যন্ত কাষ্ঠ দাহন করিয়া ঐ স্থান জীব দেহের তুল্য উত্তপ্ত হয়। মেচুসী (Muthuic) সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বোল্‌তাইক যন্ত্রে দস্তার অভাবেও তৎক্ষণাৎ একটি ভেক মারিয়া তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রসায়নিক কার্য্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে। (ভেক জীবিত থাকিলে কার্য্য আরো অধিক পরিমাণে প্রকাশমান করা যাইতে পারে) যাহাহউক ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দহনক্রিয়া হইতেছে অথচ অনেক সময় আমরা বস্তুর বাহ্য অবয়ব দেখিয়া বুঝিতে পারি না। দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, যে রসায়ন প্রভাবে কেমন আশ্চর্য্য আলো বিক্ষিপ্ত হইয়া দর্শকগণকে মুগ্ধ করে অথচ ঐ রসায়নিক অনল প্রকৃত পক্ষে কোনরূপ পদার্থ

* (Volta) বোল্‌তা সাহেব যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করেন তাহারই নাম বলতাইক ব্যাটারী।

দহন করে না ইহা কেবলমাত্র রাসায়নিক যোগের এবং দাহ্যের সহিত অম্লাত্মক বায়ুর (অক্‌সিজনের) সামীপ্যাকর্ষণোৎপাদিত ফল।

অগ্নি বস্তু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে না, সুতরাং আকর্ষণ বা শক্তি ইহার মূল কারণ। আমরা সচরাচর মাধ্যাকর্ষণেরই কার্য্য স্বভাব উপলব্ধি করিতে পারি, ইহা ব্যতীত অন্যান্য আকর্ষণশক্তির প্রভাব তত স্পষ্ট অনুভূত হয় না। বৈদ্যুতিক সাধন, রসায়ন উদ্ভাবন, এবং পরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা মাত্র বুঝা যায়।

তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বক, রাসায়নিক সংযোগ, এবং গতি ইহারাই নৈসর্গিক শক্তি বলিয়া স্বীকার্য্য। সুতরাং অগ্নি এই সমস্ত শক্তির অন্যতরের পরিস্ফুট ক্রিয়া মাত্র। পণ্ডিতগণ আরও বলেন, যে এই সকল শক্তির যে কেবল বিশেষ পারস্পারিক সম্বন্ধ আছে তাহা নহে, ইহারা সকলেই এক সূত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এবং ইহাও অনুমিত হইয়াছে যে ইহাদের যে কোন একটি আপনার সমশক্তি আর একটি শক্তি সম্ভূত করিতে পারে। বিদ্যুতে, রসায়ন যোগ, চুম্বকের শক্তি, উত্তাপ বা গতি, উৎপাদন করিতে পারে। আবার গতিতেও উত্তাপ জন্মাইতে পারে। যথা ঘর্ষণে, সকটচক্রে আগুণ লাগিতে পারে, পাথরে ক্ষুর সানাইলে স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়; কলের সহায়তায় বা একটুক্‌রা চান্দরস কোটের (ধাতুময়) বোতামের সহিত ঘর্ষণ করিলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আবার আলোকে বিদ্যুৎ, গতি, এবং শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। এবং উত্তাপেও যথাক্রমে আলো, বিদ্যুৎ এবং গতির উৎপাদন করিতে পারে। নৈসর্গিক শক্তি পরিবর্ত্তন সহকারে যেরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, বীজগণিতের পরিবর্ত্তন এবং যোগসাধন-প্রক্রিয়াতে (The Law of permutation and combination) তাহার সীমা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। আপাততঃ প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে আমরা তাহার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতে ক্ষান্ত রহিলাম, কেবল মাত্র বৈজ্ঞানিক পত্র ব্যতীত, উহা সাহিত্যিক পত্রিকার উপযুক্তও নহে।

এইক্ষণ আবার বলিতেছি অগ্নি কি? উত্তর। উহা প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের একটি প্রকাশমান ক্রিয়া মাত্র। উত্তাপের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলেই, ঐ উত্তাপের শক্তিও বৃদ্ধি হয়, অবশেষে এই মহাশক্তি হইতে শিখা এবং ধূম উদ্গীরিত হইতে থাকে।

আমরা শক্তির কারণ ব্যাখ্যা করিলাম না বলিয়া যদি পাঠকগণ, এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়েন, তথাপি অন্ততঃ তাঁহাদিগের এইটি ধারণা হইবে যে, বস্তু গুণ সম্পন্ন, নিত্যাগ্নি, ও তাপক প্রভৃতি বিষয়ে প্রাচীনগণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভ্রমসঙ্কুল।

আমরা যাহা জানি বা দেখি সমস্তই আকর্ষণোৎপাদিত শক্তির ফল,—কিন্তু

আমরা শক্তি দেখি না। আমরা কেবল, গতি এবং গতিজনিত কার্য্য দেখি। আমরা কোন বস্তুর কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরিত অবস্থা জানিতে পারি— এবং তাহারই একটি পরিবর্ত্তন বা রূপান্তরশীলতার নাম সাধারণ উত্তাপ। সেই উত্তাপের প্রকৃত স্বরূপ অদ্যাপি অপ্রকাশিত আছে—।

* মহামায়ার চিত্রপট।

সুরভি পবন-রথে ধীরে ধীরে
করি আরোহণ,
উঠরিল ব্রহ্মপুরে আরতির প্রতিধ্বনি
মধুর নিক্কণ।
ভারতীর আসন বেড়িয়া,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভ্রমিতে লাগিল পার্থিব শবদ
যেন পথ হারাইয়া।
কল্পনা সুন্দরী
আপনার করপদ্ম দু'টি
ধীরে ধীরে একত্রিত করি, কহিল,
" বৎসরান্তে পুনঃ, দেবি, ভারতে তোমায়
ভারতবাসীরা স্মরিল।"
ভারতীর ইন্দিবর আঁখি দুটি
ঈষদ ফুটিল ;
অতুল অধরপ্রান্তে, উষার রেখার ন্যায়
হাসি প্রকাশিল।
ইন্দ্রধনুঃ যিনি বরণ
অমনি স্যন্দন,
বক্ষে তুলি সে শুভ্র প্রতিমা খানি
অনন্ত শূন্যে ছুটিল তখন।
জ্যোতিহীনা তারা ;
অঙ্গ অঙ্গে বহিল গলিত স্বর্ণের শতধারা,
সুন্দর ;
মুহূর্ত্তে নামিল রথ শ্যামলবসনা
চারু বঙ্গের উপর।

অমনি চৌদিকে কিরণ ছুটিল,
সংগীততরঙ্গে দিগন্ত ডুবিল,
স্বর্গীয় সৌরভে ভুবন ভরিল,
আহা কি আনন্দ আজ!
বহুদিন পরে অশ্রু-জল মুছি
পরেছে বঙ্গ মোহন সাজ!
সাজিল বঙ্গ কি সুন্দর সাজে!
মরি কি মধুর আরতি বাজে!
উচ্চে বাজিছে ঝাঁঝর শঙ্খ,
টিণ্ টিণ্ টিণ্ ঘনটা বোলে,
আহা মরি যেন মায়ের অঙ্কে
নিদ্রিত শিশুর নূপুর দোলে!
আহা কি আনন্দ আজ!
তাজিয়া জীর্ণ মলিন বসন
পরেছে বঙ্গ কুসুমসাজ!

* ময়মনসিংহ সারস্বত উৎসব উপলক্ষে লিখিত।

বাছিয়া বাছিয়া অঞ্জলী ভরিয়া
চন্দনচর্চ্চিত কুসুম লইয়া,
ভক্তিরসে গ'লে, ঢালিছে সকলে,
ভারতীর চারু চরণ কমলে !
ঘরে ঘরে যেন জ্যোৎস্নাবসনা, শান্তি
সুধাময়ী করিছে বিরাজ !
আহা কি আনন্দ আজ !

মহামায়া মায়া কল্পনারে
করিয়া সহায়,
মুহূর্ত্তে সে রঙ্গভূমি অপরূপ
করিয়া সাজায় !
পদ্মের আকারে
পদ্ম পুষ্পে গড়ে
পরিষ্কার করি সুন্দর আসন,
লতা পাতা দিয়ে
সুন্দর করিয়ে
গড়ে স্তম্ভাবলী নয়নরঞ্জন।
তদুপরি নীল অপরাজিতায়
শারদ নিশার আকাশের প্রায়
চারু চন্দ্রাতপ ঝুলাইল,
মধ্যে মধ্যে তায় গুচ্ছ গুচ্ছ বেলি
নক্ষত্রের ন্যায় বসাইল।
লইয়া গোলাপি গোলাপের কলি
তার চারি ধারে, সারি সারি,
বসাইয়া ফুটন্ত চামেলী
ঝুলা'ল ঝালর তায়,
নন্দন কুসুমে নয়নাভিরাম
শোভিলা মুহূর্ত্তে বাণী
মায়ার মায়ায় !

ওই শুন শুন ! কে গাইছে গান।
তন্ত্রে তন্ত্রে নাচে তান লয় মান !
ছয় রাগ সহ ছত্রিশ রাগিণী
আহা কি সুন্দর মিলিল রে !
জরা মৃত্যু পাপ জঞ্জাল জড়িত
ভব মরুভূমে কেরে আচম্বিত,
এহেন সুধার সংগীতলহরী
জুড়াইতে প্রাণ উঠাল—রে !

তেজস্বী মূরতি, যেন ত্বিষাম্পতি
মহাঋষি আসি প্রণাম করিলা,
দেবতাবাঞ্ছিত পাদপদ্ম দু'টি
ধীরে মাতা তার শিরে ছোঁয়াইলা।
মহর্ষির শিরে শোভে জটাভার,
শুভ্র শ্মশ্রু আসি পড়েছে উরসে;
মুখে রাম রাম শব্দ অনিবার,
ঢল ঢল দেহ যেন ভক্তিরসে !
তাহার পশ্চাতে মেঘের বরণ
মহাকায় এক মহর্ষি আসিয়া
ধীরে বরদার বন্দিলা চরণ;
আশীষিলা মাতা ঈষদ হাসিয়া।
রসে অঙ্গ ভরা নয়ন চটুল,
সংগীত সলিলে স্নিগ্ধ করি প্রাণ
মুঞ্জরিয়া লতা ফুটাইয়া ফুল
দেখা দিলা পরে যুবক ধীমান্‌।
সাষ্টাঙ্গে যুবক প্রণাম করিলা।
আপনার বীণা সুকর কমলে
তুলি বীণাপাণী যুবকে অর্পিলা।
হে যুবক ! তুমি ধন্য ধরাতলে !
মৃদুল মধুর বীণা বাজাইয়া,

ভগ্নকণ্ঠে গায়ি বিরহ সংগীত,
কে আইল ? শোক তরঙ্গ তুলিয়া
প্রকৃতিরে আজ করিল প্লাবিত।
তাহার পশ্চাতে কৃষ্ণবর্ণ কায়,
বিদেশীর বেশে ওকে দেখা দিল ?
অভিনব তানে কি মধুর গায় !
মৃত বঙ্গে যেন চেতনা ঢালিল !

সমস্বরে সবে বাঁধি স্বীয় স্বীয়
তন্ত্রী তার
গাইল হর্ষে, মহামায়ার মায়া
বোঝা ভার !

অমনি সম্মুখে শোভিল অতুল
সুখধাম বনস্থলী।
স্তবকে স্তবকে ফুল আছে ফুটি
শাখে শাখে ফল ঝুলি।
প্রকৃতির সেই সোহাগের বনে
একিরে একিরে হেরি !
কক্ষভ্রষ্ঠ ধ্রুব নক্ষত্রের প্রায়
ধরাসনে এক নারী।
এদিকে দেখনা ঐ কি ভীষণ
রণস্থলে দেখা যায় !
ওই দেখ মহা জ্যোতিষ্মান যোদ্ধা
শুইয়া শরশয্যায় !
অন্যদিকে ফিরাইয়া আঁখি, কর
একবার দরশন,
ঘোর বনে সুরভি কুসুমে ঘেরা
ওই শান্তি নিকেতন।
স্বভাবের ছবি ভুবন মোহিনী
বল্কছালে তনু ঢাকা,
আলবালে জল করিছে সিঞ্চন
বদনে লজ্জার রেখা।
আবার এদিকে শ্যামলপুলিনা
যমুনা বহিছে ধীরে ;
পাগলিনী প্রায় এক রমণী ওই
কাঁদে বসি তার তীরে !
মহামায়া একি দেখালে স্বপন
এমনত দেখি নাই !
বাজি পৃষ্ঠে শত বীর্য্যবতী নারী
দেখে মনে ভয় পাই।
কটীদেশে আঁটা শরাসন ; শিরে
রতন চূড়া নাচিছে !
রহি রহি রোষে ধনুক টঙ্কারে
হস্তে শূল আস্ফালিছে !

মহামায়া মায়া বোঝা ভার !
পরিবর্ত্তিল দৃশ্য পুনর্ব্বার।
নিবিল দেউটী হ'ল আঁধার।

হস্তে ভাঙ্গা লাঠি,
অঙ্গে মাখা মাটি,
উষ্ক খুষ্ক কেশ,
পাগলিনী বেশ,
অঞ্চল ধরায়,
হেলায় লুটায়,
দেহ লতা শীর্ণ,
শরীর বিবর্ণ,
জ্যোতিহীন তারা,
অপাঙ্গেতে ধারা,

কাঁপিতে কাঁপিতে,
পড়িতে পড়িতে,
একটি রমণী আইল তথায়।
সজল নয়নে সুধাইলা বাণী ;—
'কে তুমি মা ? তুমি কাহার রমণী ?
তব দশা দেখে বুক ফেটে যায়!'
মুছি অশ্রু জল,
চাপি বক্ষস্থল,
যষ্ঠির উপর,
রাখি-অঙ্গ ভর,
ভগ্ন স্বরে মরি
কহিলা সুন্দরী ;—
"আমার কাহিনী
শুনিবে কি বাণী ?
আমার বেদনা
কেহত বোঝে না!
তুমি কি বুঝিবে ?
মোরে কি চিনিবে ?
'স্মৃতি' নাম ধরে এই অভাগিনী!'
যদি মোর প্রতি এত দয়া তব
এসো সঙ্গে মোর, এসো বীণাপাণি,
গত দৃশ্য কিছু তোমারে দেখাব।'
ঈষদ হাসিয়া, কহিলা ভারতী
'দেবতা আমরা ;
দিব্য চক্ষু ধরি, এক দৃষ্টে হেরি,
সসাগরা ধরা।
সেই দিব্য চক্ষু তোমারেও আমি
করিনু প্রদান,
দূর দৃশ্য স্মৃতি দেখিবে এখন
যেন চক্ষে বিদ্যমান।

অশ্রু জল মুছি ভগ্ন কণ্ঠে স্মৃতি
কহিলা বাণীর কাছে ;
'অলকা সদৃশ ভারত ভুমির
আর কি সেদিন আছে!
ওই দেখ মাগো যমুনা বহিছে
আঁধারে ঢাকিয়া কায়!
বীচিরবচ্ছলে কালিন্দী কাতরে
বিষাদ সংগীত গায়।
এই যমুনার স্ফটিক সলিলে
প্রভাতে সন্ধ্যায় মরি,
মন্দাকিনী জলে বিদ্যাধরী প্রায়
ভেসেছে প্রমোদ-তরী!
এই যমুনার শ্যামল পুলিনে
বিচিত্র চিত্রিত কত,
শত সৌধমালা ছিল দাঁড়াইয়া
স্বর্গীয় পরীর মত!
সেই যমুনার সেই সে পুলিনে
আজি কি দেখিতে পাই।
মহা মরুভূমি অনন্ত শ্মশান
শূন্য শূন্য সব ঠাঁই!
যেখানে সেখানে ভগ্ন অট্টালিকা
পড়ে আছে স্তূপাকার!
লতা পাতা ঘেরা এই স্তূপোপরি
ফিরাও আঁখি তোমার।
ওই স্তূপে বসি অশ্রুময়ী শোক,
কাঁদিয়া জুড়ায় প্রাণ!
ছিন্ন তন্ত্র কণ্ঠে ভগ্ন বীণে বাঁধি
ভগ্ন কণ্ঠে করে গান।
ওই দেখ মাগো মহা তীর্থ স্থান
কুরুক্ষেত্র দেখ ওই,

কুরুক্ষেত্র আছে বল মা আমায়
সে কুরু পাণ্ডব কই ?
কই সে অর্জ্জুন ? বীর্য্য মূর্ত্তিমান্,
ভীমসেন মহাকায় ;
সত্য সত্য কি মা ভীষ্ম মহাবীর
নিদ্রিত চির নিদ্রায় ?
দেখ প্রান্তরের প্রান্তভাগে ওই
ম্রিয়মান মহাবীর,
ধূলায় লুটায় পর্ব্বতের প্রায়
তার প্রকাণ্ড শরীর।
ভীম শরাসন শতখণ্ড হয়ে
পড়িয়া রয়েছে ভূমে ;
কভু যেন বীর নয়ন মুদিয়া
অচেতন ঘোর ঘুমে !
কভু যেন ক্রোধে ভগ্ন কটি আঁটি
উঠিয়া বসিতে চায় ;
ভগ্ন বাহু ভাঙ্গি তখনি আবার
ভূতলে পড়িয়া যায় !
এই হতভাগ্য এক দিন মাগো
ভারত ঈশ্বর ছিল !
'বীর রস' নাম কালচক্রে পড়ি
ইহার এদশা হলো !'

এই শোক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে
অপাঙ্গে বাণীর অশ্রু দেখা দিল ;
মায়ার মায়ায় আঁধার নাশিতে
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি আসি দাঁড়াইল।

ভুবন মোহিনী
আইলা রমণী
তনুময় যেন মাধুরী মাখা !
শতচন্দ্র যিনি
সে বদনখানি
নিবিড় কুন্তলে অর্দ্ধেক ঢাকা !
আস্য ভরা হাসি,
হেন জ্যোৎস্না রাশি,
অপাঙ্গে বিজলি জ্বলে !
কোহিনূরে ছায়
পরাজি প্রভায়
একটি হীরক গলে !
মহা মূল্য কত
রত্ন শত শত
লছে সর্ব্বাঙ্গে তার,
খচিত রতনে
কৌশিকি বসনে
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা বামার !
স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না রাশি
ঘেরে মুখশশি
হস্তে বিদ্যুত মশাল।
মুহূর্ত্তে সে আলো
দিশি উজলিল
হরি আঁধার ভয়াল !
অন্য এক করে
রত্ন বীণা ধরে,
দাঁড়াল প্রতিমা স্থির ;
স্বীয় পাদমূলে
পুতিয়া মশালে
ধীরে নোয়াইল শির।
সম্মোহন মন্ত্রে
বাঁধি বীণা যন্ত্রে

দিল সে তন্ত্রে ঝঙ্কার ;
আরম্ভিল গান
মোহিল পরাণ
ঘুচিল বিষাদ ভার !

উঠ উঠ মাগো।
ধরাসন ত্যাগো।
তব দশা হেরে হৃদি ফেটে যায়।
চিরদিন কারু সমান না যায় !
ঝাড় ধূলি ঝাড়
নব বস্ত্র পড়
রাজরাণী তুমি কেন হেন বেশ।
কেন ধূলিমাখা এ চাঁচর কেশ।
তব পায়ে ধরি
মুছ অশ্রুবারি।
বিশুষ্ক অধরে একবার হাসো !
একবার সুখ তরঙ্গেতে ভাসো।

উঠ উঠ মাগো !
দেখ পূর্ব্বভাগো !
তপ্ত কাঞ্চনের আভায় শোভিল !
কাল নিশি তব বুঝি মা পোহাল !
বলি যা শোনো মা !
কেঁদোনা কেঁদোনা !
মোর কথা রাখ ' আশা ' মোর নাম
ধৈর্য্যধর পূর্ণ হবে মনস্কাম।
নিরবিলা বীণা। ক্রোধ ভরে
ভয়বাহু যুগে করি বশ
ভগ্ন ঃ ঃ খণ্ড—যোড়া দিয়ে
উঠিতে চাহিল বীর রস,
নির্দ্দয় বিধির কি বিচার
হায় হস্ত ভাঙ্গি পড়ি গেল !
অন্তর্দ্ধান আশা বাণী সব
যাঃ রে মায়ার মায়া ফুরাল !

শ্রীদী—

জীবনপ্রভাত।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আরংজীব।

" আপনি কাটারি মারি আপনার পায়।
অহঙ্কার করে ডিঙ্গা ডুবালি দরিয়ায় ॥
বুদ্ধিমান হয়ে জ্ঞান হারালি হতভাগা।
শিরেকৈলে সর্পাঘাত কোথা বাঁধ্‌বি তাগা।
সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি বেটা হলি হতমূর্খ।
বলে কথা বুঝিস নাহি এই বড় দুঃখ ॥ "
কীর্ত্তিবাস ওঝা।

পর দিন প্রায় এক প্রহর বেলার সময় শিবজীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, জাগরিত হইয়াই রাজপথে একটি গোলযোগ শুনিলেন, উঠিয়া গবাক্ষ দিয়া নিম্নদিকে চাহিলেন, যাহা দেখিলেন তাহাতে চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন,—

দেখিলেন বাটির পশ্চাতে দুই পার্শ্বে, সম্মুখ দ্বারে অস্ত্রহস্তে প্রহরীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বিশেষ পরিচয় না পাইলে বাহিরের লোককে গৃহে প্রবেশ করিতে দি-

তেছে না, গৃহের লোককে বাহিরে যাইতে দিতেছে না। দেখিয়া সীতাপতির কথা স্মরণ হইল, কল্য তিনি পলাইতে পারিতেন, অদ্য আরংজীবের বন্দী!

তখন বিশেষ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; জানিলেন যে, তিনি সম্রাটের নিকট স্বদেশ যাইবার প্রার্থনা করিয়া অবধি আরংজীবের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, সেই সন্দেহপ্রযুক্তই সম্রাট নগরের কোতোয়ালকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে শিবজীর বাটীর চতুর্দ্দিকে দিবারাত্র প্রহরী থাকিবে, শিবজী বাটী হইতে কোথাও যাইলে সেই লোক সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবে। শিবজী তখন বুঝিতে পারিলেন যে, হিতৈষী সীতাপতি গোস্বামী গণনা দ্বারা বা কোনও অনুসন্ধানে আরংজীবের এই আদেশের কথা জানিতে পারিয়া পূর্ব্বেই শিবজীর পলায়নের সমস্ত আয়োজন করিয়া রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সংবাদ দিতে আসিয়াছিলেন। মনেং সীতাপতিকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

আরংজীবের কপটাচারিতা এত দিনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল। প্রথমে শিবজীকে বহু সমাদর পূর্ব্বক পত্র লিখিয়া দিল্লিতে আহ্বান করিলেন,—শিবজী আসিলে তাঁহাকে রাজ সভায় অবমাননা করিলেন, পরে রাজসভায় যাইতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে নিষেধ করিলেন, তৎপরে প্রকৃত বন্দী করিলেন। কোন কোন অজগর সর্প গো মহিষাদি ভক্ষণ করিবার পূর্ব্বে যেরূপ আপন দীর্ঘ শরীর ভক্ষ্যের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া জড়াইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করে, পরে ইচ্ছানুসারে দংশন করে, ক্রূর আরংজীবও সেইরূপ কপটতাজালে শিবজীকে ক্রমে সম্পূর্ণ অধীন করিয়া পরে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মানসচক্ষে অতীত ও বর্ত্তমান সমুদায় ঘটনা মুহূর্ত্তমধ্যে দৃষ্টি করিয়া শিবজী শত্রুর নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন, বুঝিয়া রোষে অভিমানে গর্জ্জিয়া উঠিলেন। দ্রুতপদনিক্ষেপে সেই গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার অধরৌষ্ঠের উপর দন্ত স্থাপিত রহিয়াছে, নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অনেকক্ষণ পর অৰ্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন—

'আরংজীব! শিবজীকে এখনও জান না; চতুরতায় আপনাকে অদ্বিতীয় মনে কর, কিন্তু শিবজীও সে বিদ্যায় বালক নহে। ** এই ঋণ এক দিন পরিশোধ করিব,—দাক্ষিণাত্য হইতে হিন্দুস্থান পর্য্যন্ত সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে!'

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথপন্তকে ডাকাইলেন। প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রী উপস্থিত হইলেন, শিবজীর আজ্ঞায় সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

শিবজী বলিলেন—'পণ্ডিত প্রবর! আপনি আরংজীবের খেলা দেখিতেছেন;—এই খেলা আমাদেরও খেলিতে হইবে;

আপনার প্রসাদে শিবজী এ খেলায় অপরিপক্ক নহে,—খেলিবে।

'অদ্য আমরা বন্দী হইয়াছি, আমি কল্য রজনীতে ইহার সংবাদ পাইয়াছিলাম; কিন্তু অনুচরবর্গকে পূর্ব্বে পরিত্রাণ না করিয়া আমার আত্মপরিত্রাণের ইচ্ছা নাই, সে বিষয়ে আপনার উপদেশ কি?'

ন্যায়শাস্ত্রী অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'আপনার অনুচরদিগের স্বদেশ গমনের জন্য সম্রাটের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করুন, এক্ষণে আপনাকে বন্দী করিয়াছেন, আপনার অনুচরসংখ্যা যত হ্রাস হয় তাহাতে সম্রাট আহ্লাদিত ভিন্ন দুঃখিত হইবেন না। আমি বিবেচনা করি অনুমতি চাহিলেই পাইবেন।'

শিবজী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—'মন্ত্রিবর, আপনার পরামর্শই শ্রেয়ঃ, আমারও বোধ হয় ধূর্ত্ত আরংজীব এবিষয়ে আপত্তি করিবেন না।'

সেই মর্ম্মে একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত হইল; শিবজী যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল; শিবজীর অনুচর সকল দিল্লী হইতে প্রস্থান করিবে শুনিয়া সম্রাট আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগের সকলকে এক একখানি অনুমতি-পত্র দান করিলেন। শিবজী কএক দিন মধ্যে সেই সমস্ত অনুমতি পত্র প্রাপ্ত হইলেন, মনে মনে বলিলেন,—

'মূর্খ! শিবজীকে বন্দী রাখিবে? এখন একজন অনুচরের বেশ ধরিয়া ইহার মধ্যে একখানি অনুমতিপত্র লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিলে কি করিতে পার? যাহা হউক অনুচরবর্গ এখন নিরাপদে যাইবে, শিবজী আপনার জন্য উপায় উদ্ভাবনা করিতে সক্ষম।'

*　　*　　*　　*

পাঠক! যিনি অসাধারণ চতুরতা বুদ্ধিকৌশল ও রণনৈপুণ্যে ভ্রাতৃগণকে পরাস্ত করিয়া, বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লীর ময়ূরসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, যিনি কাশ্মীর হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি হইয়াও পুনরায় দাক্ষিণাত্যদেশ জয় করিয়া সমগ্র ভারতের একাধীশ্বর হইবার মহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যিনি অদ্য চতুরতার দ্বারা মহাবীর শিবজীকেও বন্দী করিয়াছিলেন, চল একবার সেই ক্রূর, কপটাচারী, অথচ সাহসী, দূরদর্শী আরংজীবের প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মনের ভাবগুলি নিরীক্ষণ করি!

রাজকার্য্য সমাধা হইয়াছে, আরংজীব 'গোসলখানা' নামক সভাগৃহের পার্শ্বস্থ একটি ঘরে উপবেশন করিয়া আছেন। সেটি মন্ত্রিদিগের সহিত গুপ্ত পরামর্শের স্থল, কিন্তু অদ্য আরংজীব একাকী বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, কখন কখন ললাটে গভীর চিন্তার রেখা দেখা যাইতেছে, কখন বা উজ্জ্বল নয়নে ও কম্পিত অধরে রোষ, অভিমান বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, কখন বা মন্ত্রণা-স-

ক্লান্তিজনিত সন্তোষে সেই ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্যরেখায় অঙ্কিত হইতেছে। সম্রাট কি করিতেছেন? আপন বুদ্ধিবলে সমস্ত হিন্দুস্থানের একাধীশ্বর হইয়াছেন, সেই কথা স্মরণ করিতেছেন? হিন্দু ধর্মের আরও অবমাননা অথবা রাজপুত বা মহারাষ্ট্রদিগকে আরও পদদলিত করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন? শিবজীকে বন্দী করিয়া মনে মনে উল্লাসিত হইতেছেন? জানি না সম্রাটের কি চিন্তা। তাঁহার সভার মধ্যে, ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও লোক, কোনও সেনাপতি, কোনও মন্ত্রীকে সন্দিগ্ধমনা আরংজীব কখন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না,—মনের ভাব বলিতেন না। নিজের বুদ্ধি প্রাখর্য্যে সকলকে পুত্তলিকার ন্যায় চালাইবেন, সমগ্র দেশ সুন্দর শাসন করিবেন, আরংজীবের এই উদ্দেশ্য। বাসুকী যেরূপ নিজ মস্তকে এই জগৎ ধারণ করিতেছেন, বিশ্রাম চাহেন না, কাহারও সহায়তা চাহেন না, আরংজীব নিজের অসাধারণ মানসিক বলে ভারতসাম্রাজ্যের শাসনকার্য্য একাকী বহনকরিবার মানস করিয়াছিলেন, কাহারও পরামর্শ চাহিতেননা।

অনেকক্ষণ উপবেশন করিয়াছিলেন, এরূপ সময় একজন সৈনিক তস্‌লীম করিয়া বলিল—

'সম্রাটের জয় হউক! জহাঁপনা! দানেশমন্দ্‌ নামক আপনার সভাসদ্‌ আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।'

সম্রাট দানেশমন্দকে আসিতে আজ্ঞা দিলেন, চিন্তারেখাগুলি ললাট হইতে অপসৃত করিলেন, সুন্দর হাস্য মুখে ধারণ করিলেন।

দানেশমন্দ্‌ আরংজীবের মন্ত্রী ছিলেন না, রাজকার্য্যে পরামর্শ দিতে সাহস করিতেন না। তবে তিনি পারস্য ও আরবী ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত, সুতরাং সম্রাট তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন, সময়ে সময়ে কোন কোন কথায় বাক্যচ্ছলে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। উদারচেতা দানেশমন্দ্‌ প্রায়ই উদার সরল পরামর্শ দিতেন; আরংজীবের জ্যেষ্ঠ দারা যখন বন্দী হয়েন, দানেশমন্দ্‌ তাঁহার প্রাণরক্ষার পরামর্শই দিয়াছিলেন। এবম্বিধ পরামর্শ কুটিল আরংজীবের মনোগত হইতনা,—আরংজীব তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শী বলিয়া মনে করিতেন,—তথাপি তাঁহার বিদ্যা ও ধন ও পদ-মর্য্যাদার জন্য সম্যক্‌ আদর করিতেন। সরলস্বভাব বৃদ্ধ দানেশমন্দ্‌ সম্রাটকে অভিবাদন করিয়া উপবেশন করিলেন।

বলিলেন—

'এ সময়ে জহাঁপানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসা দাসের ধৃষ্টতা,—কেন না এ সময় সম্রাট রাজকার্য্যের পর বিশ্রাম করেন। তবে যে আসিয়াছি,—কেবল আপনি অনুগ্রহ করেন এই নিমিত্ত; পারস্য কবি সুন্দর লিখিয়াছে, 'সূর্য্যের দিকে জগতের সকল প্রাণী সকল সময়ে চাহিয়া

দেখে, সূর্য্য কি তাহাতে বিরক্ত বা কিরণ দানে বিরত হয়' ? ”

সম্রাট সহাস্য বদনে বলিলেন, ‘ দানেশমন্দ্‌ ! অন্যের সম্বন্ধে যাহাই হউক, আপনি সর্ব্ব সময়েই সমাদরের পাত্র।'

এইরূপ মিষ্টালাপ ক্ষণেক হইলে পর দানেশমন্দ্‌ অন্য কথা আনিলেন ; বলিলেন,—

‘ জহাঁপনা ! ‘ আলমগীর ' নাম সর্থক করিবেন ! সমস্ত হিন্দুস্থান পদতলে রহিয়াছে, এক্ষণে দাক্ষিণাত্য জয় করিতেও বড় বিলম্ব নাই।'

ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন—

‘কেন, সে বিষয়ে আমার কি উদ্যোগ দেখিলেন ?'

দানে। ‘ দক্ষিণদেশের প্রধান শত্রু আপনার পদতলে।'

আরং। ‘ শিবজীর কথা বলিতেছেন ? হাঁ ইন্দুর কলে পড়িয়াছে !' তৎক্ষণাৎ আপন মন্ত্রণা গোপনার্থে বলিলেন, ‘ দানেশমন্দ্‌ আপনি আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই জানেন, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই সম্মান করা আমার উদ্দেশ্য। শিবজী ধূর্ত্ত বিদ্রোহী হউক, যোদ্ধা বটে তাহাকে সম্মানার্থেই দিল্লীতে আনিয়াছিলাম। রাজসভায় সমুচিত সম্মান করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সে এরূপ মূর্খ যে রাজসভায় অসদাচরণ করিয়াছিল। আমি তাহাকে বন্দী করিতে বা তাহার প্রাণ লইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সুতরাং অন্য শাস্তি না দিয়া কেবল রাজসভায় আসিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন শুনিতেছি, যে দিল্লীর মধ্যেই সে অনেক সন্ন্যাসী ও বিদ্রোহীর সহিত পরামর্শ করে সুতরাং কোনও রূপ অনিষ্ট করিতে না পারে এই জন্যই কোতওয়ালকে দৃষ্টি রাখিতে কহিয়াছি। কয়েকদিন পর সম্মান পূর্ব্বক বিদায় দিব।'

দানে। ‘ সম্রাটের এ আদেশ শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম।'

আরং। ‘ কেন ?' আরংজীবের মুখে সেইরূপ হাস্য,—কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়নে দানেশমন্দের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন, তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

উদারচেতা দানেশমন্দ্‌ বলিলেন, ‘সম্রাটকে পরামর্শ দি আমার কি সাধ্য, কিন্তু জহাঁপনা ! যদি শিবজীর প্রতি দয়ালু আচরণ না করিতেন, তাহা হইলে মন্দ লোকে নানারূপ অখ্যাতি করিত, বলিত, যে শিবজীকে আহ্বান করিয়া বদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত নহে।'

আরংজীব ঈষৎ কোপ সঙ্গোপন করিয়া সেইরূপ হাস্যবদনে বলিলেন,—

‘ দানেশমন্দ্‌, মন্দ লোকের কথায় দিল্লীশ্বরের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তবে সুবিচার ও দয়া সিংহাসনের শোভন, সুবিচার করিয়া শিবজীর দোষের জন্য তাহাকে স-

তর্ক করিয়া দিব, পরে দয়াপ্রকাশে তাহাকে সসম্মানে বিদায় দিব।'

দানে। 'এরূপ সদাচরণেই জহাঁপনার প্রপিতামহ আকবর দেশ শাসন করিয়াছিলেন, এরূপ সদাচরণে আপনারও খ্যাতি ও ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।'

আরং। 'সে কিরূপ?'

দানে। 'সম্রাটের অগোচর কিছুই নাই। দেখুন, আকবরশাহ যখন দিল্লীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সমস্ত সাম্রাজ্য শত্রু-সঙ্কুল ছিল; রাজস্থানে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে সর্ব্বস্থানেই বিদ্রোহী ছিল, দিল্লীর সন্নিকট স্থানও শত্রুশূন্য ছিল না। তাঁহার মৃত্যুকালে, সমস্ত সাম্রাজ্য নিঃশত্রু ও নির্ব্বিরোধ হইয়াছিল,—যাহারা পূর্ব্বে পরম শত্রু ছিল, সেই রাজপুতেরাই বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করিয়া কাবুল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত দিল্লীশ্বরের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করে! এ জয়সাধন কিরূপে হইয়াছিল? কেবল বাহুবলে? কেবল সাহসে? তৈমুরের বংশে কাহারও সাহস বা বাহুবলের অভাব নাই,—তবে আর কেহ এরূপ জয়সাধন করিতে পারেন নাই কি জন্য? না জহাঁপনা! কেবল সদাচরণেই এরূপ জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি সদাচরণ করিতেন, অধীন হিন্দুদিগকে বিশ্বাস করিতেন, হিন্দুরাও এবম্বিধ সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইবার চেষ্টা করিত, মানসিংহ, টোডর মল্ল, বীরবল প্রভৃতি হিন্দুগণই মুসলমান সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ হইয়াছিলেন। উত্তম ব্যক্তিকেও অবিশ্বাস করিলে সে ক্রমে অধম হইয়া যায়, অধম কাফেরের প্রতি ও সদাচরণ ও বিশ্বাস করিলে, তাহারা ক্রমে বিশ্বাসযোগ্য হয়; মানবের এই প্রকৃতি,—শাস্ত্রের এই লিখন। আমাদের দক্ষিণদেশের যুদ্ধে শিবজী অনেক সহায়তা করিয়াছেন, জহাঁপনা! তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি যত বেত থাকিবেন, ততদিন তিনি দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ থাকিবেন!"

দানেশমন্দ কি জন্য সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, পাঠক, বোধ হয়, এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। দিল্লীশ্বর শিবজীকে আহ্বান করিয়া বন্দী করায় জ্ঞানী ও সদাচারী মুসলমান সভাসদ্ মাত্রেই লজ্জিত হইয়াছিলেন; দানেশমন্দ্‌কে সম্রাট সমাদর করিতেন, তিনি কোনরূপে কথাচ্ছলে সম্রাটের কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ উদ্দেশ্য তাঁহাকে দেখাইয়া দিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। শিবজীর প্রতি ভদ্রাচরণ করিয়া সম্রাট তাঁহাকে স্বদেশে যাইতে দেন, দানেশমন্দ্ এই উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। দানেশমন্দ্ জানিতেন না যে হস্তদ্বারা প্রকাণ্ড ভূধরকে বিচলিত করা যায়, কিন্তু পরামর্শ দ্বারা আরংজীবের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও গভীর উদ্দেশ্যগুলি বিচলিত করা যায় না।

দানেশমন্দের উদার সারগর্ভ কথা-

গুলি কুটিল আরংজীবের নিকট অতিশয় নির্ব্বোধের কথার ন্যায় বোধ হইল। তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—

'হাঁ, দানেশমন্দ্! আপনি যেরূপ শাস্ত্রবিশারদ, মানবহৃদয়ও সেইরূপ পাঠ করিয়াছেন, দেখিতেছি। দক্ষিণদিকে শিবজী স্তম্ভ স্থাপিত করিবেন, রাজস্থানে ত বিদ্রোহিগণ স্তম্ভ স্থাপন পূর্ব্বেই করিয়াছে; কাশ্মীর পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিব, ও বঙ্গদেশে পাঠানদিগকে পুনরায় সমাদর পূর্ব্বক আহ্বান করিব,—এই চতুঃস্তম্ভের উপর মোগল সাম্রাজ্য সুন্দর ও সুদৃঢ় স্থাপিত হইবে।'

দানেশমন্দের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইল, তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, 'সম্রাটের পিতা দাসকে অনুগ্রহ করিতেন, সম্রাটও যথেষ্ট অনুগ্রহ করেন, সেই জন্য কখন কখন মনের কথা বলি,—নচেৎ জহাঁপনাকে পরামর্শ দি, এরূপ বিদ্যাবুদ্ধি নাই।'

আরংজীব দানেশমন্দকে নির্ব্বোধ সরল জানিয়াও তাঁহার সেই সরলতার জন্য তাঁহাকে ভাল বাসিতেন,—তাঁহাকে কষ্ট দিয়াছেন দেখিয়া বলিলেন,—

'দানেশমন্দ্! আমার কথার দোষ গ্রহণ করিও না। আকবরশাহ বুদ্ধিমান ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি ধর্ম্ম-সঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন? আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমাদের সামান্য দৈনিক কার্য্য সম্পাদনকালেও দেখিতে পাই যে, আপনি করিলে যেরূপ কার্য্য হয় পরের হস্তে সেরূপ হয় না। এরূপ বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন কার্য্যও সেইরূপ পরের উপর বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিলে কি ভাল হয় না? নিজ বাহুবলে যদি সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতে সমর্থ হই, কি জন্য ঘৃণিত কাফেরদিগের সহায়তা গ্রহণ করিব? আরংজীব বাল্যাবস্থা অবধি নিজ অসির উপর নির্ভর করিয়াছে, নিজ অসি দ্বারা সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করিয়াছে, নিজ অসি-দ্বারা দেশ শাসন করিবে, কাহারও সহায়তা চাহিবে না, কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না।'

দানে। 'জহাঁপনা! স্বহস্তে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা যায়, কিন্তু এরূপ সাম্রাজ্য শাসন কি সহায়তা ভিন্ন সম্পাদিত হয়? বঙ্গদেশ, দক্ষিণদেশ প্রভৃতি স্থানে কি সর্ব্ব সময়ে আপনি বর্ত্তমান থাকিতে পারেন? অন্য কাহাকেও নিযুক্ত না করিলে কার্য্য কিরূপে সম্পাদিত হইবে?'

আরং। 'অবশ্য ভৃত্য নিযুক্ত করিব, কিন্তু তাহারা চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় থাকিবে, যেন প্রভু হইতে না চাহে। অদ্য আমি যাহাকে অধিক ক্ষমতা দিব, কল্য সে সেই ক্ষমতা আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারে। অদ্য যাহাকে অধিক বিশ্বাস করিব, কল্য সে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে; এ অবস্থায় ক্ষমতা

ও বিশ্বাস অন্যে ন্যস্ত না করিয়া আপনাতে রাখাই ভাল। দানেশমন্দ্‌! তুমি যখন অশ্বে আরোহণ কর, অশ্বকে বল্‌গা ও গুণের দ্বারা সম্পূর্ণ বশীভূত কর, যেদিকে ফিরাও সেই দিকে যাইতে বাধ্য হয়। সম্রাটেরও সেইরূপে শাসন করা উচিত, কাহাকেও বিশ্বাস করিও না, কাহারও হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করিও না, সমস্ত ক্ষমতা নিজ হস্তে রাখিবে, কর্ম্মচারী ও সেনাপতিদিগকে সম্পূর্ণরূপে বশীকরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের নিকট কার্য্য গ্রহণ করিবে।'

দানে। 'প্রভু! মনুষ্যত অশ্ব নহে, তাহাদিগের মহত্ত্ব আছে, নিজ নিজ সম্মান জ্ঞান আছে।'

আরং। 'মনুষ্য অশ্ব নহে তাহা জানি; সেই জন্যই অশ্বকে বল্‌গাদ্বারা চালাই, মনুষ্যকে উন্নতির আশা ও শাস্তির ভয়ের দ্বারা চালাই। যে উত্তম কার্য্য করিবে তাহাকে পুরস্কার দিব, যে অধম কার্য্য করিবে তাহাকে শাস্তি দিব। পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয়ে সকলে কার্য্য করিবে; ক্ষমতা, বিশ্বাস, মন্ত্রণা, আরংজীব নিজ হৃদয়ে ও নিজ বাহুবলে ন্যস্ত রাখিবে।'

দানে। 'প্রভু! পুরস্কার-আশা ও শাস্তি-ভয় ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ত অন্য ভাবও আছে। মনুষ্যের মহত্ত্ব আছে, উচ্চাভিলাষ আছে, নিজ সম্মান-জ্ঞান আছে। যে শাস্তি-ভয়ে কার্য্য করে, সে কোনরূপে কেবল কার্য্য সমাপ্ত করিয়া নিরস্ত থাকে; কিন্তু যাহাকে আপনি সম্মান করেন, সমাদর করেন, ক্ষমতা দিয়া বিশ্বাস করেন, সে আপনাকে সেই সমাদর ও বিশ্বাসের উপযোগী প্রমাণ করিবার জন্য প্রভুকার্য্যে নিজের ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়াছে, এরূপ উদাহরণ ও শাস্ত্রে দেখা যায়।'

আরংজীব সহাস্যে বলিলেন,—

'দানেশমন্দ! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি; কবিতায় যাহা লিখে তাহা বিশ্বাস করি না। মানবপ্রকৃতি আমার শাস্ত্র; মানবের মহত্ত্ব আমি অল্প দেখিয়াছি। শঠতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা অনেক দেখিয়াছি। সেই শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমি নিজ হস্তে ক্ষমতা রাখিতে শিখিয়াছি, সেই জন্য কাফেরদিগের উপর জিজিয়া কর স্থাপন করিয়াছি, বিদ্রোহোন্মুখ রাজপুতদিগের উপর কঠোর শাসন করিব, মহারাষ্ট্রদেশ নিঃশত্রু করিব, বিজয়পুর ও গলখন্দ জয় করিব, হিমালয় হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত আরংজীব একাকী শাসন করিবে, কাহার ও সহায়তা লইবে না, আলমগীর নিজের নাম সার্থক করিবে।'

উৎসাহে সম্রাটের নয়ন উজ্জ্বল হইয়াছিল, তিনি মনের গভীর অভীষ্ট কখন কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেন না, অদ্য কথায় কথায় অনেকটা হঠাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন! এতদ্ভিন্ন তিনি দা-

নেশমন্দের উদার চরিত্র জানিতেন, তাঁহার নিকট দুই একটি কথা কহিলে কোনও হানি নাই, জানিতেন।

ক্ষণেক পর ঈষৎ হাস্য করিয়া আরংজীব বলিলেন,—'সরলস্বভাব বন্ধু! অদ্য আমার অভীষ্ট ও মন্ত্রণা কিছু কিছু বুঝিতে পারিলে?'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরংজীব যদি আপনার গভীর মন্ত্রণা কিয়দংশ ত্যাগ করিয়া সেই দিন সরল দানেশমন্দের সরল পরামর্শ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য বোধ হয় এত শীঘ্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না!

এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন এমন সময়ে সৈনিক পুনরায় আসিয়া সংবাদ দিল—

'রামসিংহ জহাঁপানার সাক্ষাৎ অভিলাষী, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।'

সম্রাট আদেশ করিলেন,—'আসিতে দাও।'

ক্ষণেক পর রাজা জয়সিংহের পুত্র রাজসদনে উপস্থিত হইলেন।

রামসিংহের সহিত পাঠকের পূর্ব্বেই পরিচয় হইয়াছে। আকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, ললাট প্রশস্ত, নয়নযুগল উজ্জ্বল ও তেজঃপূর্ণ, সমস্ত অবয়ব যৌবনকান্তিতে শোভিত, যৌবন বলে বলিষ্ঠ। যুবক ধীরে ধীরে বলিলেন—

'সম্রাটের সহিত এরূপ সময়ে সাক্ষাৎ করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অবিধেয়, কিন্তু পিতার নিকট হইতে অতিশয় গুরু সংবাদ আসিয়াছে, প্রভুকে জানাইতে আসিলাম।'

আরং। 'আপনার পিতার নিকট হইতে আমরাও অদ্য পত্র পাইয়াছি ও সমস্ত সংবাদ অবগত আছি।'

রাম। 'তবে সম্রাট অবগত আছেন যে পিতা সমস্ত শত্রু পরাজিত করিয়া, শত্রুদেশ বিদীর্ণ করিয়া রাজধানী বিজয়পুর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের সৈন্যের অল্পতা বশতঃ সে নগর এপর্য্যন্ত হস্তগত করিতে পারেন নাই, বিশেষ গলখন্দের সুলতান বিজয়পুরের সহায়ার্থ সেকনাম খাঁ নামক সেনাপতিকে বহুসংখ্যক সৈন্যসমেত প্রেরণ করিয়াছেন।'

আরং। 'সমস্ত অবগত হইয়াছি।'

রাম। 'চতুর্দ্দিকে শত্রুবেষ্টিত হইয়া পিতা সম্রাটের আদেশে এখনও যুদ্ধ করিতেছেন কিন্তু এ যুদ্ধে জয় অসম্ভব, প্রভুর নিকট আর অল্পসংখ্যক সৈন্যের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।'

আরং। 'আপনার পিতা বীরাগ্রগণ্য! তিনি নিজের সৈন্যে বিজয়পুর হস্তগত করিতে পারিবেন না?'

রাম। 'মনুষ্যের যাহা সাধ্য, পিতা তাহা করিবেন; শিবজী পূর্ব্বে পরাস্ত হয়েন নাই, পিতা তাঁহাকে পরাস্ত করাছেন; বিজয়পুর পূর্ব্বে আক্রান্ত হয় নাই, পিতা ততদূর যাইয়া সেই নগর আক্রমণ করিয়াছেন, এখন আপনার নিকট

অল্পমাত্র সৈন্য-সহায়তা প্রার্থনা করিতেছেন। তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য শেষ হয়, দক্ষিণদেশে মোগল সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও দৃঢ়ীভূত হয়।'

এরূপ অবস্থায় অন্য কোন সম্রাট সেই সহায়তা প্রেরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশবিজয়কার্য্য সমাধা করিতেন। আরংজীব আপনাকে বহুদূরদর্শী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনে করিতেন, তিনি সে সহায়তা প্রেরণ করিলেন না—বলিলেন—

'রামসিংহ! আপনার পিতা আমাদের সুহৃদ্‌প্রবর, তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি শোকাকুল হইলাম, তাঁহাকে পত্র লিখিবেন যে, তিনি নিজের অসাধারণ বাহুবলে জয় সাধন করিবেন, সম্রাট দিবানিশি এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন; কিন্তু এখন দিল্লীতে সেনাসংখ্যা অতি অল্প, আমি সহায়তা প্রেরণ করিতে অক্ষম।'

রামসিংহ কাতরস্বরে বলিলেন, 'জঁহাপনা! পিতা দিল্লীশ্বরের পুরাতন দাস, আপনার কালে, আপনার পিতার কালে অসংখ্য যুদ্ধ যুঝিয়াছেন, অনেক কার্য্য সাধন করিয়াছেন; দিল্লীশ্বরের কার্য্যসাধন ভিন্ন তাঁহার জীবনের অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই ঘোর বিপদে আপনি কিঞ্চিৎ সাহায্য দান না করিলে, তিনি বোধ হয়, সসৈন্যে নিধনপ্রাপ্ত হইবেন।' রামসিংহের কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তাঁহার নয়নে জলবিন্দু উদিত হইল।

বালক! জলবিন্দুতে আরংজীবের গভীর উদ্দেশ্য, দৃঢ়মন্ত্রণা বিচলিত হয় না।

সে উদ্দেশ্য—সে মন্ত্রণা কি? রাজা জয়সিংহ অতিশয় ক্ষমতাশালী প্রতাপান্বিত সেনাপতি, তাঁহার অসংখ্য সৈন্য, বিস্তীর্ণ যশ, অনন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ! আজীবন তিনি নিষ্কলঙ্কে দিল্লীশ্বরের কার্য্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু এত ক্ষমতা কোন সেনাপতির থাকা বিধেয় নহে; সম্রাট এতদূর জয়সিংহকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। এযুদ্ধে যদি জয়সিংহ সার্থকতা লাভ করিতে না পারিয়া অবমানিত হয়েন, তবে সে প্রতাপ ও যশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইবে। যদি সসৈন্যে বিজয়পুর সম্মুখে নষ্ট হয়েন, দিল্লীশ্বরের হৃদয়ের একটি কণ্টকোদ্ধার হইবে। ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় আরংজীবের উদ্দেশ্যগুলি বহুবিস্তীর্ণ ও অব্যর্থ, অদ্য জয়সিংহ-কীট তাহাতে পড়িয়াছেন, উদ্ধার নাই।

জয়সিংহ বহুকালাবধি দিল্লীশ্বরের কার্য্যে জীবন পণ করিয়াছেন বটে, সেজন্য কি সূক্ষ্ম মন্ত্রণাজাল অদ্য ব্যর্থ হইবে?

জয়সিংহের উদারচরিত্র যুবকপুত্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছেন বটে, বালকের রোদনের জন্য কি দূরদর্শী সম্রাট উদ্দেশ্য ত্যাগ করিবেন?

দয়া মায়া প্রভৃতি সুকুমার মনোবৃত্তিসমূহ আরংজীব বিশ্বাস করিতেন না, নিজ হৃদয়েও স্থান দিতেন না; আত্মপথ পরিষ্কারার্থ অদ্য একটি পতঙ্গ সরাইয়া ফেলি-

লেন, কল্য একজন সহোদর ভ্রাতাকে হনন করিলেন, উভয় কার্য্যই একই প্রকার ধীর নিরুদ্বেগ হৃদয়ে করিতেন! একদিন পিতা, ভ্রাতা, ভ্রাতষ্পুত্র আত্মীয়বর্গ সেই উন্নতিপথে পড়িয়াছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে সরাইয়া দিয়াছিলেন। পিতাকে মায়াবশতঃ জীবিত রাখেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে ক্রোধবশতঃ হত্যা করেন নাই, সে সমস্ত বালকোচিত মনোবৃত্তি তাঁহার ছিল না। পিতা জীবিত থাকিলে ভবিষ্যতে উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই, আপন উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না, তিনি জীবিত থাকুন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জীবিত থাকিলে উদ্দেশ্যসাধনে প্রতিবন্ধক হইতে পারে; জল্লাদ! তাহাকে সরাইয়া সম্রাট আলমগীরের পথ পরিষ্কার করিয়া দাও!

মন্ত্রণাসাধনের জন্য অদ্য আবশ্যক যে জয়সিংহ সসৈন্য হত হইবেন; তিনি ভাল কি মন্দ, বিশ্বাসী কি বিদ্রোহী অনুসন্ধানে আবশ্যক নাই, তিনি সসৈন্যে মরিবেন! এই পরিচ্ছেদ-বিবৃতি সময়ের পর কএক মাসের মধ্যেই দিল্লীতে সংবাদ আসিল, অবমানিত, অকৃতার্থ জয়সিংহ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

অনেকক্ষণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রামসিংহ বলিলেন—

'প্রভু আমার একটি যাচ্ঞা আছে।'

আরং। 'নিবেদন করুন!'

রাম। 'শিবজী যখন দিল্লী আগমন করিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকে বাক্যদান করিয়াছিলেন যে দিল্লীতে শিবজীর কোনও আপদ ঘটিবে না।'

আরং। 'আপনার পিতা সে কথা আমাদের অবগত করাইয়াছেন।'

রাম। 'রাজপুতদিগের মধ্যে বাক্যদান করিয়া তাহা লঙ্ঘন হইলে অতিশয় নিন্দার বিষয়। পিতার প্রার্থনা ও দাসের প্রার্থনা যে প্রভু শিবজীর যে কোনও দোষ হইয়া থাকে, ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিন।'

আরংজীব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, সম্রাটের যাহা উচিত কার্য্য সম্রাট তাহা করিবেন, সে বিষয়ে আপনি চিন্তিত হইবেন না!'

আরও ক্ষণেক দানেশমন্দের সহিত কথোপকথনের পর সম্রাট বেগমমহলে যাইলেন, দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ ক্ষুণ্ণমনে প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

শিবজীনামে দ্বিতীয় একটি কীট সম্রাটের সেই বিস্তীর্ণ মন্ত্রণাজালে পতিত হইয়াছেন; দানেশমন্দ্ ও রামসিংহ তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

জয়সিংহের যে দোষ শিবজীরও সেই দোষ; শিবজীও সন্ধিস্থাপনাবধি প্রাণপণে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছেন নিজ সৈন্য দ্বারা অনেক দুর্গ দিল্লীর অধীনে আনিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও বিপুল ক্ষমতা; আরংজীব কোনও ভৃত্যের উপর বিপুল

ক্ষমতা ন্যস্ত করিতে পারেন না, কাহাকেও বিশ্বাস করেন না।

যাহাকে অবিশ্বাস করা যায়, তাহারা ক্রমে অবিশ্বাসের যোগ্য হয়। আরংজীবের জীবিতকালের মধ্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা ও দিল্লীর চিরবিশ্বস্ত রাজপুতেরা, দিল্লীর বিরুদ্ধে যে ভীষণ যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিল, মোগল সাম্রাজ্য তাহাতে দগ্ধ হইয়া গেল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়া।

" দূরে গেল জটাজুট।

মধুসূদন দত্ত।

শিবজীর অতিশয় সঙ্কটজনক পীড়া হইয়াছে, সমগ্র দিল্লীনগরে এ সংবাদ প্রচারিত হইল। দিবা নিশি শিবজীর গৃহের গবাক্ষ ও দ্বার রুদ্ধ, দিবানিশি চিকিৎসক আসিতেছেন। এ ভীষণ রোগের উপশম সন্দেহস্থল, অদ্য যেরূপ রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকা অসম্ভব। কখন কখন বা সংবাদ রাষ্ট্র হইতেছে যে শিবজী আর নাই! রাজপথ দিয়া বহুসংখ্যক লোক গমনাগমন করিত ও সেই রুদ্ধ গবাক্ষের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিত, অশ্বারোহী সৈনিক ও সেনাপতিগণ ক্ষণেক অশ্ব থামাইয়া প্রহরীদিগের নিকট শিবজীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন; শিবিকারোহী রাজা বা মনসবদার শিবজীর গৃহের সম্মুখে আসিয়া একবার উঠিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন; শিবজী কিরূপ আছেন, তিনি উদ্ধার পাইবেন কি না, তিনি কল্য পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবেন কি না, এইরূপ নানা কথা নগরবাসী সকলেই বাজারে, পথে, ঘাটে, সর্ব্বসময়ে আন্দোলন করিত। আরংজীব সর্ব্বদাই শিবজীর রোগের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, তথাপি গৃহের চারিদিকে যে প্রহরী সন্নিবেশিত ছিল তাহা পূর্ব্বমত রাখিলেন। লোকের নিকট শিবজীর রোগের বিষয় আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, মনে মনে সর্ব্বদাই ভাবিতেন, " যদি এই রোগেই শিবজীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমার বিশেষ কোন নিন্দা না হইয়াই অনায়াসে কণ্টকোদ্ধার হইবে।'

সন্ধ্যাকাল সমাগত, এরূপ সময়ে একজন প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান হাকিম শিবির হইতে শিবজীর গৃহদ্বারের নিকট অবতীর্ণ হইলেন। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল, ' কি উদ্দেশে শিবজীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন।' হাকিম উত্তর করিলেন, ' সম্রাটের আদেশ অনুসারে রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিয়াছি।' সসম্মানে প্রহরীগণ পথ ছাড়িয়া দিল।

শিবজী শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার ভৃত্য সম্বাদ দিল যে সম্রাট একজন হাকিম পাঠাইয়া দিয়াছেন। তীক্ষ্ণ

বুঝি শিবজী তৎক্ষণাৎ বিবেচনা করিলেন, কোনরূপ বিষপ্রয়োগের জন্য সম্রাট এ কাণ্ড করিতেছেন; ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,—

'হাকিমকে আমার সেলাম জানাইও ও বলিও হিন্দু কবিরাজে আমার চিকিৎসা করিতেছে, আমি হিন্দু, অন্যরূপ চিকিৎসা ইচ্ছা করি না। সম্রাটের এই অনুগ্রহের জন্য আমার কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাইবেন।' কিন্তু ভৃত্য এই আদেশ লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই হাকিম অনাহূত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শিবজীর হৃদয়ে ক্রোধ সঞ্চার হইল, কিন্তু তাহা সঙ্গোপন করিয়া অতি ক্ষীণ মৃদুস্বরে হাকিমকে অভ্যর্থনা করিলেন, ও শয্যাপার্শ্বে বসিতে আদেশ দিলেন। হাকিম উপবেশন করিলেন।

আকৃতি দেখিলে এরূপ লোকের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহ হইতে পারে না। বয়স অনেক হইয়াছে, অতি শুভ্র শ্মশ্রু লম্বিত হইয়া উরঃস্থল আবৃত করিয়াছে; মস্তকোপরি প্রকাণ্ড উষ্ণীষ, হাকিমের স্বর ধীর ও গম্ভীর। বলিলেন—

'মহাশয়! ভৃত্যকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুত হইয়াছি, আমার চিকিৎসা ইচ্ছা করেন না; তথাপি মানবজীবন রক্ষা করা আমাদের ধর্ম্ম, আমি স্বধর্ম্মসাধন করিব।'

শিবজী মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, ভাবিলেন এ বিপদ কোথা হইতে আসিল? কিছু বলিলেন না।

হাকিম। 'আপনার পীড়া কি?'

কাতর স্বরে শিবজী বলিলেন, 'জানি না এ কি ভীষণ পীড়া; শরীর সর্ব্বদাই অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে, হৃদয়ে বেদনা, সর্ব্বস্থানে বেদনা।'

হাকিম গম্ভীরস্বরে বলিলেন, 'পীড়া অপেক্ষা জিঘাংসায় শরীর অধিক জ্বলে, হৃদয়ের বেদনা অনেক সময় মানসিকক্লেশসঞ্জাত; আপনার কি সেই পীড়া?'

বিস্মিত ও ভীত হইয়া শিবজী এই অপরূপ হাকিমের দিকে চাহিলেন; মুখ সেইরূপ গম্ভীর, কোনও ভাবই লক্ষিত হইল না। শিবজী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। হাকিম তাঁহার হস্ত ও শরীর দেখিতে চাহিলেন।

শিবজী আরও ভীত হইলেন, অগত্যা হস্ত ও শরীর দেখাইলেন।

অনেকক্ষণ অতিশয় মনোনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া হাকিম উত্তর করিলেন,—

'আপনার বচন যেরূপ ক্ষীণ, নাড়ীত সেরূপ ক্ষীণ নহে, ধমনীতে শোণিত সজোরে সঞ্চালিত হইতেছে, পেশীগুলি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়বদ্ধ। আপনার এসমস্ত কি প্রবঞ্চনা মাত্র?'

পুনরায় বিস্মিত হইয়া শিবজী এই অপূর্ব্ব চিকিৎসকের দিকে চাহিলেন, চিকিৎসকের মুখ মণ্ডল গম্ভীর ও অকম্পিত, কোনও ভাব লক্ষিত হইল না। শিব-

জীর শরীরে ক্রমে উষ্ণ শোণিত সঞ্চালিত হইতে লাগিল, কিন্তু ক্রোধ সম্বরণ করিয়া পুনরায় ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—

আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, অন্যান্য চিকিৎসকগণও সেইরূপ বলেন; এ মহৎ পীড়া বাহ্যলক্ষণশূন্য, কিন্তু দিনে দিনে তিল তিল করিয়া আমার জীবন নাশ করিতেছে।'

হাকিম ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

'আমফনাবনা ও লাবলুন' নামক আমাদের যে প্রকাণ্ড চিকিৎসাশাস্ত্র আছে তাহাতে এক সহস্র এক পীড়ার বিষয় নির্দ্দেশ আছে; তাহার মধ্যে কয়েকটি বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়ার কথা লিখিত আছে। একটির নাম 'আকলতু সামাকাতা হওরা রাশি হ।' বালকেরা এই পীড়া ভাণ করিয়া চুরি করিয়া মৎস ভক্ষণ করে, ইহার চিকিৎসা প্রহার। আর একটির নাম 'বকুসতনে আমিরী ইশারৎ বর্দ্দ, কয়েদীগণ কাজ না করিবার জন্য এই পীড়া ভাণ করে, ইহার চিকিৎসা শিরচ্ছেদন। তৃতীয় এক প্রকার বাহ্যলক্ষণশূন্য পীড়া আছে, শত্রুহস্ত হইতে পলাতুকাম বন্দীদিগের সেই পীড়া ঘটে, তাহারও ঔষধি নির্দ্দেশ আছে; আমি তাহাই আপনাকে দিতেছি।'

শিবজী এ সমস্ত শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু হাকিম তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুর, শিবজীর মনের ভাব বুঝিয়াছেন তাহা শিবজী বুঝিতে পারিলেন। ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে ঔষধি কি?'

হাকিম উত্তর করিলেন, 'সে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধিও বটে, উৎকট বিষও বটে রব্বুল আলমিনার নাম লইয়া তাহাই আপনাকে দিব, যদি রোগ যথার্থ হয়, অব্যর্থ ঔষধিতে তৎক্ষণাৎ পীড়া আরোগ্য হইবে, যদি প্রতারণা হয় অব্যর্থ বিষে তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশ হইবে।' এই বলিয়া হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন।

শিবজীর হৃৎকম্প হইল, ললাট হইতে স্বেদবিন্দু পড়িতে লাগিল! ঔষধি সেবনে অস্বীকৃত হইলে তাঁহার প্রতারণা প্রচারিত হইবে, সেবন করিলে নিশ্চয় মৃত্যু!

হাকিম ঔষধি প্রস্তুত করিয়া আনিল, শিবজী বলিলেন, 'মুসলমানের পৃষ্ট পানীয় আমি পান করিব না;' সজোরহস্তসঞ্চালনে পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

হাকিম কিছুমাত্র রুষ্ট হইলেন না। ধীরে ধীরে বলিলেন, 'এরূপ সজোর হস্ত সঞ্চালন ক্ষীণতার লক্ষণ নহে!'

শিবজী অনেক্ষণ অতি কষ্টে ক্রোধ সম্বরণ করিয়াছিলেন, আর পারিলেন না। সহসা উঠিয়া বলিলেন, 'রোগীকে উপহাস করিবার এই শাস্তি,' বলিয়া মস্তকে চপেটাঘাত করিলেন ও হাকিমের শুক্ল শ্মশ্রু সজোরে আকর্ষণ করিলেন।

বিস্মিত হইয়া দেখিলেন সেই মিথ্যা শ্মশ্রু সমস্ত খসিয়া আসিল, চপেটাঘাতে

উষ্ণীষ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, তাঁহার বাল্য সুহৃদ্ তন্নজী মালশ্রী খিল্ খিল্ করিয়া হাস্য করিয়া উঠিল!

কষ্টে অনেক্ষণপর হাস্য সম্বরণ করিয়া ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পরে শিবজীর নিকটে আসিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন,—

'প্রভু কি সর্ব্বদাই চিকিৎসককে এইরূপ পারিতোষিক দিয়া থাকেন?' তাহা হইলে রোগীর মৃত্যুর পূর্ব্বে দেশের চিকিৎসক নিঃশেষিত হইবে! বজ্রসম চপেটাঘাতে এখনও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে!'

শিবজী সহাস্যে বলিলেন, 'বন্ধু, সিংহের সহিত খেলা করিলে কখন কখন আহত হইতে হয়। যাহা হউক তোমাকে দেখিয়া কতদূর আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না, এ কয়দিনই তোমাকে প্রত্যাশা করিতেছিলাম, এখন সংবাদ কি বল।'

তন্ন। 'প্রভুর সমস্ত আদেশ সম্পাদিত করিয়াছি, একে একে নিবেদন করিতেছি।

'সম্রাট যে অনুমতি পত্র দিয়াছিলেন তদ্দ্বারা আপনার অনুচরবর্গ সমস্তই নিরাপদে দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে।'

শিব। 'সে জন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ করি। এখন আমার মন শান্ত হইল, আমি আপনার পলায়নের জন্য তত ভাবি না; গগনবিহারী গরুড়পক্ষী সামান্য পিঞ্জরবদ্ধ হইয়া থাকে না।'

তন্ন। 'সেই সমস্ত অনুচর দিল্লী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গোস্বামীর বেশ ধরিয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেছে; মথুরায় অনেক দেবালয়ে পুরোহিতগণও প্রত্যহ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে! আমি দিল্লী হইতে মথুরার পথ বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়াছি, যে যে স্থানে যেরূপ লোক সন্নিবেশিত করিবার আদেশ করিয়াছিলেন তাহাও করিয়াছি।'

শিব। 'চির বন্ধু! তুমি যেরূপ কার্য্যদক্ষ অবশ্যই আমরা নিরাপদে স্বদেশ যাইতে পারিব।'

তন্ন। 'দিল্লীর প্রাচীরের বাহিরে আপনি যেরূপ একটি তীব্রগতি অশ্ব রাখিতে বলিয়াছিলেন তাহাও রাখিয়াছি, যে দিন স্থির করিবেন, সেই দিনে সমস্ত প্রস্তুত থাকিবে।'

শিব। 'ভাল।'

তন্ন। 'রাজা জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পিতা আপনাকে যে বাক্যদান করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম। রামসিংহ পিতার ন্যায় সত্যপ্রিয় ও উদারচেতা, শুনিয়াছি স্বয়ং সম্রাটের নিকট যাইয়া আপনার জন্য সাশ্রুনয়নে আবেদন করিয়াছিলেন।'

শিব। 'সম্রাট কি বলিলেন?'

তন্ন। 'বলিলেন সম্রাটের যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন।'

শিব। 'বিশ্বাসঘাতক! কপটা-

চারী! এখনও একদিন শিবজী ইহার প্রতিশোধ দিবে!'

তন্ন। 'রামসিংহ সে বিষয়ে বিফল-প্রযত্ন হইয়াছেন বটে, কিন্তু যুবক সরোষে আমার নিকট বলিলেন, যে রাজপুতের বাক্য অন্যথা হয় না, অর্থ দ্বারা সৈন্যদ্বারা যেরূপে পারেন, তিনি আপনার সহায়তা করিবেন, তাহাতে যদি তাঁহার প্রাণ যায় তাহাতেও স্বীকার আছেন।'

শিব। 'পিতার উপযুক্ত পুত্র। কিন্তু আমি তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে চাহি না, আমি পলায়নের যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি তাহা তুমি তাঁহাকে জানাইয়াছ?'

তন্ন। 'জানাইয়াছি, তিনি জানিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।'

শিব। 'ভাল।'

তন্ন। 'এতদ্ভিন্ন দানেশমন্দ্‌ প্রভৃতি যাবতীয় আরংজীবের সভাসদকে মিষ্ট কথায় বা অর্থদ্বারা, বা নজর দিয়া আপনার পক্ষবর্ত্তী করিয়াছি। দিল্লীতে হিন্দু কি মুসলমান এরূপ বড় লোক কেহ নাই, যিনি আপনার পক্ষবর্ত্তী নহেন; কিন্তু আরংজীব কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন না।'

শিব। 'তবে সমস্ত প্রস্তুত! আমি আরোগ্য লাভ করিতে পারি?'

সহাস্যে তন্নজী বলিলেন, 'আমার ন্যায় বিজ্ঞ হাকিম যখন আপনার পীড়ার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছে, তখন পীড়া কি থাকিতে পারে? কিন্তু আপনার পানের জন্য সুন্দর মিষ্ট শরবৎ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, সমস্তটা নষ্ট করিলেন?'

শিবজী বলিলেন, 'বন্ধু, আর এক পাত্র প্রস্তুত কর।' তন্নজী সেই পাত্র লইয়া পুনরায় শরবৎ প্রস্তুত করিলেন; শিবজী পান করিলেন,—সহাস্যে বলিলেন, 'চিকিৎসক! আপনার ঔষধি যেরূপ মিষ্ট সেইরূপ ফলদায়ী, আমার পীড়া একেবারে আরাম হইয়াছে।'

তন্ন। 'তবে এখন প্রস্থান করি।' শিবজীকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া পুনরায় উষ্ণীষ ও শ্মশ্রু ধারণ করিয়া তন্নজী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বারদেশে প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, 'পীড়া কিরূপ দেখিলেন?'

হাকিম উত্তর করিলেন, 'পীড়া অতিশয় সঙ্কটজনক, কিন্তু আমার অব্যর্থ ঔষধিতে অনেক উপশম হইয়াছে; বোধ করি অল্পদিনের মধ্যেই শিবজী এ ক্লেশ হইতে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।'

হাকিম শিবিকাযোগে চলিয়া গেলেন; এক প্রহরী অন্যকে বলিল,—

'এ হাকিম বড় ভাল, এত বৈদ্য যে পীড়া আরাম করিতে পারিল না,—হাকিম একদিনে তাহা আরাম করিল কিরূপে?'

দ্বিতীয় প্রহরী উত্তর করিল, 'হবে না কেন, এ যে রাজবাটির হাকিম?'

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

আরোগ্য।

এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হয়ে।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়ে॥
হে বীর, কমল চক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমিবা আমার॥

কাশীরাম দাস।

উপরি উক্ত ঘটনার কএকদিন পর নগরে সংবাদ প্রচারিত হইল যে শিবজীর পীড়ার কিছু উপশম হইয়াছে। নগরে পুনরায় ধুমধাম পড়িয়া গেল; সকলেই সেই কথা কহিতে লাগিল। কেহ কেহ শিবজীর আরোগ্যে দুঃখিত হইলেন; কোন কোন মহদাশয় মুসলমান এই সংবাদ পাইয়া সুখী হইলেন। পথে, ঘাটে, দোকানে, মস্‌জীদে সকলেই এই কথা কহিতে লাগিল; আরংজীব এ সংবাদ শুনিয়া যথোচিত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

নগরে ধুমধাম পড়িয়া গেল। শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে রাশি রাশি মুদ্রা দান করিতে লাগিলেন, দেবালয়ে পূজা পাঠাইতে লাগিলেন, চিকিৎসক সকলকে অর্থদানে সন্তুষ্ট করিলেন। বাজারে আর মিষ্টান্ন রহিল না, শিবজী রাশি রাশি মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া দিল্লীর সমস্ত বড় লোকের বাটিতে পাঠাইতে লাগিলেন। পরিচিত সমস্ত লোকের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন, এমন কি প্রতি মস্‌জীদে ফকীরগণের সেবনার্থ প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। সম্রাটের মনে যাহাই থাকুক, অন্য সকলেই শিবজীর এই বদান্যতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 'দিল্লীকা-লাড্ডু'র ছড়াছড়ি হইতে লাগিল, তাহাতে আর কেহ 'পস্তাইয়া' ছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আরংজীব অতি শীঘ্রই পস্তাইয়াছিলেন।

শিবজী কেবল মিষ্টান্ন প্রেরণ করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, মিষ্টান্ন ক্রয় করাইয়া নিজের গৃহে আনিতেন ও অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আধার সমস্ত নির্ম্মাণ করাইয়া স্বয়ং মিষ্টান্ন সাজাইয়া প্রেরণ করিতেন। সে আধার কখন কখন তিন চারিহাত দীর্ঘ হইত, ৮ কি ১০ জন লোকে বহিয়া লইয়া যাইত। কএক দিন এইরূপে মিষ্টান্ন বিতরিত হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় এইরূপ দুইটি প্রকাণ্ড মিষ্টান্নের আধার শিবজীর গৃহ হইতে বাহির হইল। প্রহরীগণ জিজ্ঞাসা করিল,—

'এ কাহার বাটিতে যাইবে?' বাহকেরা উত্তর করিল, 'রাজা জয়সিংহ-সদনে।'

প্রহ। 'তোমাদের প্রভু আর কত দিন এরূপ মিষ্টান্ন পাঠাইবেন।'

বাহ। 'এই অদ্যই শেষ!'

মিষ্টান্নের ভার লইয়া বাহকগণ চলিয়া গেল।

কতক পথ যাইয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ

স্থানে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই দুইটি আধার নামাইল। বাহকগণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, জনমাত্র নাই, শব্দমাত্র নাই, কেবল সন্ধ্যার বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া যাইতেছে? বাহকেরা একটি ইঙ্গিত করিল, একটি আধার হইতে শিবজী, অপরটি হইতে শম্ভুজী বাহির হইলেন; উভয়ে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিলম্ব না করিয়া উভয়ে ছদ্মবেশে দিল্লীর প্রাচীরাভিমুখে যাইলেন। সন্ধ্যার সময় লোক অতি অল্প, তথাপি, রাজপথে এক একজন লোক যখন নিকট দিয়া যায় শম্ভুজীর হৃদয় ভয়ে, উদ্বেগে, নৃত্য করিয়া উঠে। শিবজীর চিরজীবন এককপ বিপদপূর্ণ, তাঁহার পক্ষে কিছুই নূতন নহে, তথাপি তাঁহার ও হৃদয় উদ্বেগশূন্য ছিল না।

কম্পিত হৃদয়ে প্রাচীর পার হইলেন, একজন প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, 'কে যায়?'

শিবজী উত্তর করিলেন, 'গোস্বামী। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নাম কেবলং।'

'কোথা যাইতেছ?'

'মথুরা তীর্থস্থানে। কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'

প্রাচীর পার হইলেন।

প্রাচীরের বাহিরেও অনেক হর্ম্ম্যাদি ছিল, অনেক ধনাঢ্য ও উচ্চপদাভিষিক্ত লোক বাস করিতেন। সে সকল দুই পার্শ্বে রাখিয়া শিবজী ও সম্ভুজী ত্বরিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। 'হরের্নাম হরের্নাম—ইত্যাদি।'

দূরে একটি বৃক্ষতলে একটি অশ্ব বদ্ধ রহিয়াছে দেখিলেন। অতি সতর্কভাবে সেইদিকে যাইলেন, দেখিলেন, তন্নজী-বর্ণিত অশ্বই বটে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাই, অশ্বরক্ষক! তোমার নাম কি?'

'জানকীনাথ'

'কোথায় যাইবে?'

'মথুরা'

শিবজী বলিলেন, 'হাঁ এই অশ্ব বটে।' শিবজী অশ্বে আরোহণ করিলেন, পশ্চাতে শম্ভুজীকে উঠাইয়া লইলেন, মথুরার দিকে চলিলেন। অশ্বরক্ষক পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে চলিতে লাগিল।

অন্ধকার নিশীথে, নিঃশব্দ পল্লী বা প্রান্ত দিয়া নির্ব্বাক হইয়া শিবজী পলায়ন করিতেছেন। আকাশে নক্ষত্রগুলি মিট্‌মিট্ করিতেছে, অল্প অল্প মেঘ এক একবার গগন আচ্ছাদিত করিতেছে, বর্ষাকালে পূর্ণ কলেবরা যমুনা নদী প্রবলবেগে বহিয়া যাইতেছে, পথ ঘাট কর্দ্দম বা জলপূর্ণ। শিবজী উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে পলায়ন করিতেছেন।

দূর হইতে অশ্বের পদশব্দ শ্রুত হইল; শিবজী লুকাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে স্থানে বৃক্ষ বা কুটির নাই, অগত্যা পূর্ব্ববৎ গমন করিতে লাগিলেন।

তিন জন অশ্বারোহী বেগে দিল্লী

প্রতিমুখে আসিতেছেন; তাহাদিগের কোষে অসি, হস্তে বর্শা। দূর হইতে শিবজীর অশ্ব দেখিতে পাইয়া সেই দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। শিবজীর হৃদয় উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল।

নিকটে আসিয়া একজন অশ্বারোহী জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে যায়?'

শিব। 'গোস্বামী।'

অশ্বারোহী। 'কোথাহইতে আসিতেছ?'

শিব। 'দিল্লীনগর হইতে।'

অশ্বারোহী। 'আমরা দিল্লীনগর যাইব; কিন্তু পথ হারাইয়াছি, আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া পথ দেখাইয়া দাও, পরে মথুরায় যাইও।'

শিবজীর মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; দিল্লী যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা বল প্রকাশ করিবে, বিবাদের সময় সহসা শিবজীকে চিনিলেও চিনিতে পারে; কেননা দিল্লীতে এরূপ সৈনিক ছিল না যে শিবজীকে দেখে নাই। আর দিল্লীতে পুনর্গমন করিলে সহস্র বিপদ! ইতিকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একজন অশ্বারোহী সম্মুখে আসিয়া শিবজীর সহিত কথা কহিয়াছিল, অপর দুইজন অস্পষ্টস্বরে পরামর্শ করিতেছিল। কি পরামর্শ?

একজন বলিল, 'এ স্বর আমি জানি,—আমি দক্ষিণদেশে শায়েস্তাখাঁর অধীনে অনেক দিন যুদ্ধ করিয়াছি, আমি নিশ্চয় বলিতেছি পথিক গোস্বামী নহে।

অপর জন বলিল, 'তবে কে?'

'আমি সন্দেহ করি এ স্বয়ং শিবজী, দুইজন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর ঠিক একরূপ হয় না।'

'দূর মূর্খ! শিবজী দিল্লীতে বন্দী হইয়াছে।'

'সেইরূপ আমরাও মনে করিয়াছিলাম যে শিবজী সিংহগড় দুর্গে আছে, সহসা একদিন রজনীযোগে পুনা ধ্বংস করিয়া গিয়াছিল।'

'ভাল, মস্তকের বস্ত্র তুলিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে,'

সহসা একজন অশ্বারোহী আসিয়া শিবজীর উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিল, শিবজী চিনিলেন শায়েস্তাখাঁর অধীনস্থ একজন প্রধান সেনানী!

যদি হস্তে কোনরূপ অস্ত্র থাকিত শিবজী একাকী তিনজনকে হত করিবার চেষ্টা করিতেন। রিক্তহস্তেও একজনকে মুষ্টি আঘাতে অচেতন করিলেন, এমন সময় আর দুইজন অসি হস্তে নিকটে আসিয়া শিবজীকে ধরিয়া ভূতলশায়ী করিল।

শিবজী নির্ব্বাক! ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতেছিলেন। আবার বন্দী হইবেন, বিদেশে বন্ধুশূন্য হইয়া আরংজীব কর্ত্তৃক হত হইবেন, এই চিন্তা করিতেছিলেন। শম্ভুজীর দিকে নয়ন পড়িল, চক্ষু

জলে আপ্লুত হইল। বলিলেন, ‘ দেব দেব মহাদেব, জীবনে একমনে আপনার পূজা করিয়াছি, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার যাহা উদ্দেশ্য থাকে তাহাই করুন ।, আশা, ভরসা, উদ্যম এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইল।

সহসা একটি শব্দ হইল. শিবজী দেখিলেন, একজন অশ্বারোহী তীরবিদ্ধ হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। আর একটি তীর, আর একটি তীর, শিবজীর তিন জন শত্রুই ভূতলশায়ী! তিন জনই গতজীবন।

যে দিক হইতে তীর আসিল, শিবজী সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—দেখিলেন অশ্বরক্ষক জানকীনাথ!

অশ্বরক্ষক নিকটে আসিল;—শিবজী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন অশ্বরক্ষকবেশে সীতাপতি গোস্বামী।

সাশ্রুনয়নে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া কহিলেন ‘ শিবজীর প্রকৃত বন্ধু! আপনি না হইলে এদাসকে কে রক্ষা করে? সুহৃদবর সীতাপতি! অশ্বরক্ষক বলিয়া যদি ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া থাকি ক্ষমা করুন, অদ্য শিবজী আপনার কৃপায় জীবন দান পাইল।,

অশ্বরক্ষকবেশধারী ধীরে ধীরে শিবজীর পদতলে পতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে কহিলেন।

‘ প্রভু ছদ্মবেশ ক্ষমা করুন; আমি অশ্বরক্ষকও নহি, গোস্বামীও নহি,—আপনার পুরাতন ভৃত্য রঘুনাথজী হাবেলদার!, প্রভুর নিকট শত অপরাধ করিয়াছি কিন্তু প্রভু ক্ষমা না করিলে আর কে ক্ষমা করিবে?,

শিবজী আর সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া রঘুনাথকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, কহিলেন ‘ রঘুনাথ! রঘুনাথ! তোমার নিকট যে পাপ করিয়াছি তাহার ক্ষমা নাই, তোমার ঋণের পরিশোধ নাই! শিবজীর জীবনের বন্ধু! আর যেন শিবজী এজীবনে তোমাকে না হারায়!,

অদ্য নিশীথে রঘুনাথের ব্রত উদ্যাপন হইল, শিবজীর ক্ষোভ দূর হইল,—পরস্পরের হৃদয়ে পরস্পর শান্তি লাভ করিলেন।

ঊনত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

প্রাসাদে।

“ কি দারুণ বুকের ব্যথা।
সে দেশে যাইব যে দেশে না শুনি পাপ পিরিতের কথা॥
সই! কে বলে পিরিতি ভাল।
হাসিতে হাসিতে পিরিতি করিয়া কাঁদিয়া জনম গেল॥
কুলবতী হইয়া কুলে দাঁড়াইয়া যে ধনী পিরিতি করে।
তুষের অনল যেন সাজাইয়া এমতি পুড়িয়া মরে॥

হায় বিনোদিনী, এ দুঃখে দুঃখিনী, প্রেমে
ছল ছল আঁখি।
চণ্ডীদাস কহে, সে গতি হইয়া, পরাণ
সংশয় দেখি॥"
চণ্ডীদাস।

নিশীথে সীতাপতি গোস্বামীর নিকট বিদায় লইয়া রাজপুতবালা গৃহে আসিলেন, কিন্তু গৃহে আসিয়া সরযূ দেখিলেন হৃদয় শূন্য! কে না জানে প্রথম কষ্ট যদিও অতিশয় ভীষণ ও দুর্ব্বহনীয়, কিন্তু তাহার পর সেই কথা স্মরণ করিলে হৃদয়ে যে দুঃখ উছলিতে থাকে, নীরবে নয়ন হইতে যে অশ্রু বহির্গত হইতে থাকে সেই শোক অধিক মর্ম্মভেদী। জগতের মধ্যে প্রিয়জনের প্রথম বিচ্ছেদ ঘটিলে আমরা বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠি, জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ভূমিতে গড়াগড়ি দি,—সে প্রথম শোক-উচ্ছ্বাস সেই আর্ত্তনাদেই নিবারিত হয়। কিন্তু দিবস যাইলে, মাস গত হইলে, বৎসর অতিবাহিত হইলে, সেই প্রিয়জনের কথা যখন স্মরণ হয়, নীরবে রজনীর অন্ধকারে যখন হৃদয় আপনি শোকপারাবারে ভাসিতে থাকে, নয়নের দ্বার যখন উদ্ঘাটিত হয়, নীরবে অশ্রুবিন্দু পড়িতে থাকে,—উঃ মনুষ্য-জীবনে সেই যাতনাই অসহ্য! প্রিয়জনের মুখ মনে পড়ে, তাহার বাক্যগুলি, কার্য্যপরম্পরা, স্নেহ, ভালবাসা, একে একে হৃদয়ে জাগরিত হইতে থাকে, নিস্তব্ধ রজনীতে সেই পূর্ব্ব কথা একে একে উদয় হইতে থাকে, তখনই হৃদয় শূন্য হয়, আমরা বালিকার ন্যায় নিরাশ্রয় হইয়া নীরবে রোদন করিতে থাকি!

দিন গেল, সপ্তাহ গত হইল, মাস অতিবাহিত হইল, সরযূর চিন্তা দিনে দিনে মর্ম্মভেদী হইতে লাগিল। অন্ধকার নিশীথে কখন কখন বালিকা একাকী গবাক্ষপার্শ্বে উপবেশন করিয়া সন্ধ্যা হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, দ্বিপ্রহর হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কত চিন্তা করিত কে বলিবে? কত কথা একে একে স্মরণ হইত, কতবার নীরবে নয়ন হইতে ধীরে ধীরে অশ্রুবিন্দু প্রবাহিত হইত। নীরবে সেই গবাক্ষ দিয়া পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়বল্লভ আর আসিলেন না।

কখন বা সেই পর্ব্বতসঙ্কুল কঙ্কণদেশ মনে জাগরিত হইত, সেই তোরণ-দুর্গ মনে উদয় হইত। সরযূ একাকী ছাদে আসীন রহিয়াছেন, সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গগন ও জগৎ আবৃত করিতেছে, সন্ধ্যার বায়ু বহিয়া বহিয়া সরযূর কেশ লইয়া ক্রীড়া করিতেছে;—এমত সময় সেই দীর্ঘাকার উদার মূর্ত্তি যুবক যেন আকাশপটে দেবচিত্রের ন্যায় দৃষ্ট হইল। সরযূর হৃদয় শিহরিয়া উঠিল, বালিকার হৃদয় নব নব ভাবে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। অদ্য তিন বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু সে মূর্ত্তি সরযূর হৃদয় হইতে অপনীত হয় নাই।

তাহার পরদিন সেই পুরুষসিংহ যে

স্নেহগদগদ স্বরে সরযুর নিকট বিদায় লইয়াছিলেন, সভয়ে ধীরে ধীরে সরযূর কণ্ঠে যে কণ্ঠমালা দোলাইয়া দিয়াছিলেন, জীবন থাকিতে সরযু কি তাহা বিস্মৃত হইতে পারেন? পুনরায় কি সে বীর সরযুর কণ্ঠে কণ্ঠমালা পরাইয়া দিবেন, পুনরায় কি সরযু সেই হৃদয়বল্লভকে দেখিতে পাইবেন?—নীরবে সরযু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, নীরবে গণ্ডস্থল দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল।

কখন বা অপরাহ্ণে একাকী সরযু আম্রকাননে ভ্রমণ করিতেন, ভ্রমণ করিতে করিতে কত কথা হৃদয়ে জাগরিত হইত। বৃক্ষের উপর হইতে কপোত কপোতী মৃদুস্বরে প্রেমগীত গাইতেছে, সেই গীত শুনিয়া একদিন রঘুনাথ কানে কানে সরযুকে কি কথা বলিয়াছিলেন স্মরণ হইল; সরযুর মুখে বিষাদের হাসি আসিল। আর এক দিন ঐ বিশাল আম্র বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ ও সরযূ একত্রে একটি সুমিষ্ট আম্র ভক্ষণ করিয়াছিলেন, খাইতেছিলেন আর পরস্পরে পরস্পরের দিকে সস্নেহে চাহিতে ছিলেন, সে কথা হৃদয়ে জাগরিত হইল। ঐ কণ্টক বনের ভিতর দিয়া আর এক দিন রঘুনাথ স্বয়ং ক্ষতবিক্ষত হইয়াও একটি সুন্দর বন্যপুষ্প চয়ন করিয়া সরযুর কেশে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, পরে কি মিষ্টস্বরে বলিয়াছিলেন, 'সরযু! কি অপরূপ বনদেবীর রূপ ধারণ করিয়াছ!' আহা! সে সুমধুর স্বর কি সরযু আর শুনিবেন, পুনরায় কি রঘুনাথ দুঃখিনীর জন্য পুষ্প চয়ন করিবেন, হতভাগিনীর ভাগ্যে কি এরূপ সুখ আছে? সরযূ শোকে বিবশা হইলেন, নয়ন হইতে দুই চারি বিন্দু জল টস্ টস্ করিয়া ভূমিতে পতিত হইল, নীরবে আপনার অঞ্চল দিয়া নয়ন মুছিলেন। বৃথা চেষ্টা, আবার চিন্তা আসিল, আবার নয়ন পূর্ণ হইল।

কখন কখন রজনী দ্বিপ্রহরের সময় সহসা হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত হইত, ভাদ্র মাসের নদীর ন্যায় শোকপারাবার উথলিয়া উঠিত। তখন কেহ দেখিবার নাই, সরযু প্রাণভরে কাঁদিতেন, শ্রাবণ মাসের ধারার ন্যায় নয়ন হইতে অজস্র বারিধারা বহিতে থাকিত। রঘুনাথের মধুময় মুখ, মধুময় কথা মনে পড়িত, একটি কথার পর অন্য কথা মনে উদয় হইত, শোকতরঙ্গের পর শোকতরঙ্গ হৃদয়ের উপর বহিয়া যাইত,—উপাধানে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বালিকা বিবশা ব্যাকুলহৃদয়া হইয়া দরবিগলিত ধারায় উপাধান সিক্ত করিত। রজনী প্রভাত হইত, প্রাতঃকালের রক্তিমচ্ছটা পূর্ব্বদিকে দেখা দিত; বালিকা তখনও চিন্তাবিদগ্ধা, অথবা শোকে বিবশা হইয়া লুণ্ঠিত রহিয়াছেন।

প্রাতঃকালে পুষ্প চয়ন করিতে উদ্যানে যাইতেন, প্রফুল্ল পুষ্পগুলি একে একে চয়ন করিতেন, হৃদয়ে স্থাপন করিতেন, আর কি চিন্তা করিতেন কে বলিবে? চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় পুষ্পের

দিকে চাহিতেন, পুষ্পদলগত প্রাতঃশি- শিরবিন্দুর সহিত দুই একটি পরিষ্কার স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু মিশাইয়া যাইত। সায়ংকালে বীণা হস্তে করিয়া কখন কখন গীত গাইতেন; —আহা সে যে শোকের গীত, শ্রোতৃ- দিগের নয়নেও জল আসিত। বাল্যকালে রাজপুত চরণদিগের নিকট যত শোকের গীত শিখিয়াছিলেন তাহাই গাইতেন, ভিখারিণীর গীত গাইতেন, দুঃখিনীর গীত গাইতেন, অনাথিনীর গী- গাই- তেন, সায়ংকালের নিস্তব্ধতায় সেই গীত ছাদ হইতে ধীরে ধীরে নৈশ আকাশে উত্থিত হইত, ধীরে ধীরে বায়ুমার্গে বি- স্তৃত হইত, গীতের সহিত গায়কীর নয়ন হইতে বিন্দু বিন্দু জল নির্গত হইত, অথবা শোকপারাবার সহসা উথলিয়া উঠিত, গায়কীর কণ্ঠরুদ্ধ হইত, গীত সহসা লীন হইয়া যাইত।

দিবারাত্রি শোকচিন্তা শেষ হইত না, দিবারাত্রি সেই পথেরদিকে সরযুবালা চাহিয়া থাকিতেন, সে পথ দিয়া হৃদয়ব- ল্লভ আর আসিলেন না।

বসন্তকালে রঘুনাথ বিদায় হইয়া- ছেন, সে বসন্তকাল অতিবাহিত হইল, সুকণ্ঠ পক্ষীগুলি একে একে কুলায় হ- ইতে উড়িয়া গেল। বৃক্ষসমূহে সুন্দর পুষ্পগুলি একে একে অদৃশ্য হইল, গ্রীষ্ম কাল নানারূপ সুস্বাদু ফল আনিয়া মানব হৃদয় আনন্দিত করিল, জগৎকে সুশো- ভিত করিল। সরযুবালা সেই পথ চা- হিয়া রহিয়াছেন,—সে পথে রঘুনাথ দর্শন দিলেন না।

আকাশে মেঘাড়ম্বর হইল, ক্রমে বর্ষার ধারা আরম্ভ হইল, নদ নদী জলাশয় পূর্ণ- কলেবর হইল, ক্ষেত্রে সুন্দর শস্য শোভা পাইতে লাগিল, জলে মাঠ, বিল, প্রান্তর প্লাবিত হইল। সেই প্রান্তরের উপর সরযু একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন, হৃদয়েশ কি এখনও কার্য্যসিদ্ধি লাভ করেন নাই, হৃদয়েশের কি এখনও সরযুকে মনে আছে? হৃদয়েশ কি কুশলে আছেন? জলে নয়ন প্লাবিত হইল,—আর দেখিতে পাইলেন না।

ক্রমে ক্রমে বর্ষার জল অপসৃত হইল, আকাশ পরিষ্কার হইল, নিশীথে শরচ্চন্দ্র উদয় হইয়া গগনে ও জগতে জ্যোতিঃ বি- স্তার করিতে লাগিল। সরযুর হৃদয়াকাশ কবে পরিষ্কার হইবে, হৃদয়নাথ কবে নি- শানাথের ন্যায় উদয় হইয়া সরযুর মনে আনন্দজ্যোতিঃ বিস্তার করিবেন? সরযু পথ চাহিয়া রহিলেন, হৃদয়নাথ আসি- লেন না।

এরূপ ভীষণ চিন্তায় ক্রমে সরযুর শ- রীর শুষ্ক হইতে লাগিল, মুখমণ্ডল পাণ্ডু- বর্ণ ধারণ করিল, নয়ন কালিমাবেষ্টিত হ- ইল। সরলস্বভাব জনার্দ্দন এখনও সরযুর হৃদয়ের কথা কিছু জানেন না, কিন্তু সর- যুর শরীরের অবস্থা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইলেন, কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

নারীর নিকট নারীর মনের কথা গুপ্ত থাকে না, সরযু অনেক যত্নে শোক সংগোপন করিলেও তাঁহার সখী ও দাসীগণ তাঁহার গুপ্তকথা কিছু কিছু অনুমান করিয়াছিল, ক্রমে সেই কথা বৃদ্ধ জনার্দ্দনের কর্ণে উঠিল।

জনার্দ্দন সরল ও নির্ম্মলচরিত্র, তথাপি জনার্দ্দন রাজপুত, সকল রাজপুত ব্রাহ্মণের ন্যায় অতিশয় বংশমর্য্যাদাগর্ব্বী। যখন শুনিলেন, আপনার একমাত্র দুহিতা একজন সামান্য মহারাষ্ট্র সৈনিককে বিবাহ করিতে চাহে, বিদ্রোহীর সহিত বিবাহ করিয়া কুলে কলঙ্ক আনিতে চাহে; তখন জনার্দ্দনের নয়ন আরক্ত হইল, বৃদ্ধের শরীর কম্পিত হইতে লাগিল।

গৃহাভ্যন্তরে আসিয়া বালিকাকে 'পাপীয়সী' 'পিশাচী' বলিয়া গালি দিলেন, সরযু পিতার তিরস্কার নীরবে সহ্য করিলেন, জগতে এরূপ কি যাতনা আছে হৃদয়বল্লভের জন্য নারী যে যাতনা সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ?

বৃদ্ধ, বাতুলের ন্যায় একমাত্র দুহিতাকে শোকার্ত্ত নীরব দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণ করিলেন, সরযুকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনবচনে বলিলেন—

'দেখ দেখি মা! আমার মস্তকে একটি কেশও কৃষ্ণ নাই, এই বৃদ্ধ বয়সে কি তুমি আমাকে যাতনা দিবে?' উঃ! সে সস্নেহ ভৎসনা সরযু সহ্য করিতে পারিলেন না, পিতার কণ্ঠ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, পিতাও রোদন করিলেন।

বৃদ্ধ সরযুর সখীদিগের দ্বারা সরযুকে অনেক বুঝাইলেন, অন্য যুবকের সহিত সরযুর বিবাহ স্থির করিতে চাহিলেন, নিজের কুল-গৌরবের কথা অনেক বলিলেন।

সরযুর একই উত্তর 'পিতাকে বলিও আমার বিবাহে রুচি নাই, চিরকাল অবিবাহিত থাকিয়া তাঁহারই পদসেবা করিব।'

বৃদ্ধ ক্ষণেক ক্ষণেক শোকার্ত্ত হইতেন, ক্ষণে ক্ষণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইতেন। এক দিন ক্রোধপরবশ হইয়া সরযুকে বলিলেন—

'সরযু! আমি রাজপুত, রাজপুতেরা কন্যার অবমাননা দেখিবার পূর্ব্বে কন্যার হৃদয়ে ছুরিকা স্থাপন করে, চরণদিগের গীতে এরূপ শুনিয়া থাকিবে।'

ধীরে ধীরে সরযু উত্তর করিলেন—

'পিতা, সেইরূপ জনকই যথার্থ দয়ালু! পিতা আপনিও যদি সেইরূপ আচরণে আমার হৃদয়ের অসহ্য বেদনা শান্ত করেন, আমি জন্মে জন্মে আপনার দয়ার কীর্ত্তন করিব।'—বৃদ্ধ অশ্রুনয়নে গৃহত্যাগ করিলেন।

ক্রমে চারিদিকে এ কথা বিস্তার হইতে লাগিল, মন্দ লোকে আরও দুই একটি কথা বাড়াইল,—কেহ কেহ বলিতে লাগিল, জনার্দ্দনের কন্যা ব্যাভিচারিণী; তাহার বিবাহ হইতেছে না।

যেদিন জনার্দ্দন এই কথা শুনিলেন, তাঁহার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল; গৃহে আসিয়া কন্যাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া বলিলেন—

'পাপীয়সি, তোর জন্য কি আমি এই বৃদ্ধ বয়সে অবমানিত হইব? তুই আমার নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক দিবি? আমার বাটি হইতে দূর হ।'

ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণনয়নে সরযু উত্তর করিলেন—

'পিতা! আমি অবোধ, যদি আপনার নিকট কখন কোনও দোষ করিয়া থাকি মার্জ্জনা করুন, কিন্তু জগদীশ্বর আমার সহায় হউন, আমাহইতে আপনার অবমাননা হইবে না।'

এ কথার অর্থ তখন জনার্দ্দন বুঝিলেন না, এ কথার অর্থ তাহার পর দিন বৃদ্ধ বুঝিতে পারিলেন।

সেই দিন অন্ধকার নিশীথে সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা একাকিনী পিতৃগৃহ ত্যাগ করিলেন, একাকিনী সংসারের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে।

দুঃখে সুখে খুল্লনা শরৎকাল ভাবে।
আশ্বিনে আসিবেন প্রভু দেবীর উৎসবে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের প্রকাশ।
গৃহে নাহি প্রাণনাথ করি বনবাস॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী।

শরৎকালের প্রাতের কমনীয় আলোকে বেগবতী নীরা নদী বহিয়া যাইতেছে, সূর্য্যকিরণে জলের হিল্লোল হাস্য করিতে করিতে যাইতেছে। সেই সুন্দর নদীর উভয় পার্শ্বে সুন্দর শস্যক্ষেত্র বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে, কৃষকের পূজায় যেন সন্তুষ্ট হইয়া মেদিনী সেই হরিৎ পরিচ্ছদে হাস্য করিতেছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিকে সেইরূপ শ্যামবর্ণ ক্ষেত্র অথবা সুদূরে দুই একটি গ্রাম দৃষ্ট হইতেছে, দক্ষিণ ও পশ্চিমে পর্ব্বতরাশির উপর পর্ব্বতরাশি বালসূর্য্যকিরণে অপরূপ শোভা ধারণ করিতেছে।

সেই নদীকূলে শ্যামলক্ষেত্রবেষ্টিত একটি সুন্দর গ্রাম সন্নিবেশিত ছিল, গ্রামের এক প্রান্তে একটি কৃষকের কুটীরের নিকট একটি বালিকা নদীকূলে খেলা করিতেছে, নিকটে একজন দাসী দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কৃষকপত্নী গৃহকার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে।

গৃহ দেখিলে কৃষককে সম্ভ্রান্ত বলিয়াই বোধ হয়। প্রাঙ্গণে দুই একটি গোলাঘর রহিয়াছে, পার্শ্বে চারি পাঁচটি গরু বাঁধা রহিয়াছে, বাটির ভিতর তিন চারিখানি ঘর, বাহিরে একখানি বড় ঘর। দেখিলেই বোধ হয় গৃহস্বামী কৃষক হইলেও গ্রামের মধ্যে একজন 'মাতব্বর' লোক,—ব্যবসা ও মহাজনী কার্য্যও কিছু কিছু করিয়া থাকে।

বালিকা সপ্তমবর্ষীয়া, শ্যামবর্ণ, চঞ্চল,

প্রফুল্ল ও উজ্জ্বলনয়না। একবার নদীকূলে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে একবার মাতা যে ঘরে রন্ধন করিতেছেন, তথায় দৌড়াইয়া যাইতেছে, এক একবার বা দাসীর নিকট আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কোন কথা কহিতেছে অথবা প্রফুল্লতার হাস্য হাসিতেছে।

বালিকা বলিল, 'দিদি, আয় না কানূকের মত ঘাটে যাই, কাপড় দিয়া মাছ ধরিব।'

দাসী। 'না দিদি, মা বারণ করিয়াছেন, ঘাটে যেও না।'

বালিকা। 'মা টের পাবে না।'

দাসী। 'না ছি, মা যা বারণ করেন তা করিতে নাই, মার কথা কি অন্যথা করে।'

বালিকা। 'আচ্ছা দিদি, মা কি তোরও মা হয়?'

দাসী হাসিয়া বলিল—'হয় বৈ কি?'

বালিকা। 'না সত্য করিয়া বল।'

দাসী। 'সত্যই মা হয়।'

বালিকা। 'না দিদি, তুই যে বামুণের মেয়ে, আমরা তো বামুণ নয়।'

দাসী বালিকাকে চুম্বন করিয়া বলিল এতদূর যদি জান তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?'

বালিকা। 'জিজ্ঞাসা করি, তবে তুই মাকে মা বলিস্ কেন?'

দাসী। 'যিনি আমাকে খাইতে পরিতে দিতেছেন, যিনি আমাকে থাকিবার স্থান দিয়াছেন,—যিনি আমাকে মেয়ের মত লালনপালন করেন তাঁকে মা বলিব না ত কি বলিব? এ জগতে আমার অন্য স্থান নাই, মা আমাকে জগতে স্থান দিয়াছেন।'

বালিকা। 'ছি দিদি, তোর চক্ষে জল কেন, তুই কথায় কথায় কাঁদিস্ কেন দিদি?'

দাসী। 'না দিদি কাঁদ্‌ব কেন।'

বালিকা। 'তোর চক্ষে জল দেখ্‌লে আমার চক্ষে জল আসে কেন দিদি?'

দাসী বালিকাকে পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিল,—'তুমি যে আমাকে ভাল বাস।'

বালিকা। 'আর তুই আমাকে ভাল বাসিস্?'

দাসী। 'বাসি বৈ কি।'

বালিকা। 'বরাবর ভাল বাস্‌বি, কখনও আমাকে ভুল্‌বি নি?'

দাসী। 'না, আর তুমি, দিদি তুমি আমাকে ভাল বাস্‌বে, কখনও ভুলিবে না?

বালিকা। 'না।'

দাসী। 'হাঁ তুমি আমাকে একদিন ভুল্‌বে।'

বালিকা। 'কবে?'

দাসী। 'যবে তোমার বর আস্‌বে।'

বালিকা। 'সে কবে?'

দাসী। 'আর দুই একবৎসরের মধ্যেই।'

বালিকা। 'না দিদি, তখনও তোকে ভুলিব না, বরের চেয়ে তোকে অধিক ভাল বাস্‌ব। আর তুই দিদি,—তোর যখন বর আস্‌বে তখন আমাকে ভুল্‌বিনি ?'

দাসীর চক্ষে পুনরায় জল আসিল, তাহা মোচন করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল,—

'না তখনও ভুল্‌ব না।'

বালিকা। 'বরের চেয়ে আমাকে অধিক ভাল বাস্‌বি ?'

দাসী হাস্য করিয়া বলিল 'সমান সমান।'

বালিকা। 'তোর বর কবে আস্‌বে দিদি ?'

দাসী। 'ভগবান্‌ জানেন। ছাড়, রান্নার বেলা হইয়াছে, আমি যাই।' দাসী অন্ন প্রস্তুত করিতে গেল।

পাঠক বলা অনাবশ্যক যে, অনাথিনী সরযুবালা জগতে আর স্থান না পাইয়া একজন কৃষকের বাটীতে দাস্যবৃত্তি স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষকের কিছু সম্পত্তি ছিল, মহাজনি ছিল, নাম গোকর্ণনাথ। গোকর্ণের অন্তঃকরণ সরল ও স্নেহযুক্ত, নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণকন্যাকে নিজের বাটীতে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। গোকর্ণের গৃহিণীও স্বামীর উপযুক্ত ; নিরাশ্রয় ভদ্র ব্রাহ্মণকন্যাকে দেখিয়া অবধি নিজের কন্যার ন্যায় লালন পালন করিতেন। সরযুও কৃতজ্ঞ হইয়া গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রীর যথোচিত সমাদর করিতেন, নিজে দুই-বেলা অন্ন প্রস্তুত করিতেন, বালিকার তত্ত্বাবধারণ করিতেন, সুতরাং কৃষক ও কৃষকপত্নীর কার্য্যের অনেক লাঘব হইল, তাঁহারাও দিন দিন সরযুর উপর অধিক প্রসন্ন হইতে লাগিলেন।

রঘুনাথের অবর্ত্তমানে যদি সরযুর কোথাও সুখের সম্ভাবনা থাকিত, তবে উদারস্বভাব গোকর্ণনাথ ও তাঁহার সরল গৃহিণীর বাটিতে থাকিয়া সরযু পরম সুখ লাভ করিতে পারিতেন। গোকর্ণের বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইবে কিন্তু চিরকাল নিয়মিত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনও শরীর সবল ও বলিষ্ঠ। গোকর্ণের একটি পুত্র শিবজীর সৈনিক, বহুদিন অবধি বাটি ত্যাগ করিয়াছে, শেষে যে একটি কন্যা হইয়াছিল, পিতামাতা উভয়েই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। প্রাতঃকালে গোকর্ণ কৃষিকার্য্যে বা অন্য কার্য্যে বাহির হইয়া যাইতেন, সরযু গৃহের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহিণী অনেক সময় বলিতেন, 'বাছা, তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে, এরূপ পরিশ্রম করিলে তোমার শরীর থাকিবে কেন ? তোমার করিতে হইবে না, আমিই করিব।' সরযু সস্নেহে উত্তর করিতেন, 'মা, তুমি আমাকে যেরূপ যত্ন কর, তোমার কাজ করিতে পরিশ্রম হয় না, আমি জন্ম জন্ম তোমার সেবা করিব, তুমি আমাকে এইরূপ স্নেহ করিও।" স্নেহবাক্যে সরলস্বভাব বৃদ্ধ গৃহিণীর নয়নে জল আসিত, চক্ষুর জল মুছিয়া বলিতেন,

'সরযু! বাছা তোর মত মেয়ে কখনও দেখি নাই, তোমার মত আমাদের জাতির একটি মেয়ে পাই, তবে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দি।' পুত্র অনেক দিন গৃহ ত্যাগ করিয়াছে, সে কথা স্মরণ করিয়া প্রাচীনা ক্ষণেক রোদন করিতেন।

দ্বিপ্রহরের সময় যখন গোকর্ণ ও তাঁহার গৃহিণী গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বিশ্রাম করিতেন, সরযু বালিকাকে ঘুম পাড়াইতেন, পরে ধীরে ধীরে স্বয়ং গৃহের পার্শ্ববর্ত্তী সুন্দর বিশাল একটি আম্রকাননের তলে বসিয়া কখন বা সূতা কাটিতেন, অনেক ক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিতেন। বিশাল আম্রকাননের ছায়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকিত, দ্বিপ্রহরের মৃদু বায়ু পত্র হইতে সুস্নিগ্ধ মর্ম্মর শব্দ আকর্ষণ করিত, দুই একটি কপোত বা ঘুঘু সেই ছায়ার ডালে উপবেশন করিয়া মৃদুস্বরে গীত গাইতে থাকিত, সেই সুস্নিগ্ধ শান্ত পাদপচ্ছায়ায় সরযু একাকিনী বসিয়া অনন্ত চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। ছয় মাস অতীত হইয়াছে হৃদয়বল্লভ স্বকার্য্যসাধনে গিয়াছেন, রঘুনাথ কবে আসিবেন, অনাথিনী কত দিন পথ চাহিয়া থাকিবেন? এত দিন কি সরযুকে স্মরণ আছে? যুদ্ধকালে, বিজয়ের কালে কি একবার স্মরণ করেন যে, দূর মহারাষ্ট্র দেশে একজন অভাগিনী তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন, তাঁহার আশায় জীবনা ধারণ করিয়া আছেন? দিল্লীর অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত সুখ! সে সুখে রত হইয়া কি হৃদয়েশ্বর বাল্যকালের প্রতিজ্ঞা ভুলিলেন?

তৎক্ষণাৎ বিদায়ের কথা স্মরণ হইল, বিদায়ের সময় সরযুর হস্ত ধরিয়া রঘুনাথ যে সস্নেহের কথা গুলি বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ হইল। না, রঘুনাথ দাসীকে ভুলিবেন না, তাঁহার প্রণয় অবিচলিত! কার্য্যসিদ্ধ হইলেই আসিবেন।

'ঐ বৃক্ষের পক্ষীর মত সরযু যদি একবার পক্ষ পায়, তাহা হইলে এই ক্ষণেই সেই দূর দিল্লীতে উড়িয়া যায়, যথায় হৃদযেশ বসিয়া আছেন তথায় যায়, তাঁহার হৃদয়ে মস্তকখানি রাখিয়া সরযু একবার প্রাণভরে ক্রন্দন করে।

এই রূপ নানা চিন্তায় দিবস অতিবাহিত হইত, বৈকালে পুনরায় গৃহকার্য্য করিতেন, সায়ংকালে যখন গোকর্ণ পরিবারের মধ্যে বসিয়া পুত্রের কথা, যুদ্ধের কথা কহিতেন, অবগুণ্ঠনবতী সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া মনোনিবেশ করিয়া সেই কথা শুনিতেন।

এইরূপে এক মাস, দুই মাস অতিবাহিত হইল। এক দিন সায়ংকালে গোকর্ণনাথ গৃহিণীর নিকট বসিয়াছেন, এক প্রান্তে সরযু বালিকাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণ বলিলেন,—

'গৃহিণী, শান্ত হও, আজ সুসংবাদ আছে।'

গৃহিণী । 'আহা ! তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক, বাছা ভীমজীর কোন সংবাদ পাইয়াছ ?'

গোক । 'শীঘ্রই পাইব, পুত্র শিবজীর সহিত দিল্লী গিয়াছিল,—অদ্য শুনিলাম দুষ্ট বাদশাহের হস্ত হইতে পলাইয়াছেন, দেশে আসিতেছেন, আমাদের ভীমজী অবশ্য তাঁহার সঙ্গে আসিবেন।'

গৃহিণী । 'আহা ভগবান্ তাহাই করুন, প্রায় একবৎসর হইল বাছাকে না দেখিয়া যে মন কি অবস্থায় আছে তাহা ভগবানই জানেন।'

গোক । 'ভীমজী অবশ্যই আসিবে, সে রঘুনাথজী হাবেলদারের অধীনে কার্য্য করিত, রঘুনাথজীর সম্বাদ পাইয়াছি।'

সরযুর হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল, উদ্বেগে শ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি গোকর্ণের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোকর্ণ বলিতে লাগিলেন,—

'যে দিন রঘুনাথকে বিদ্রোহী বলিয়া শিবজী দূর করিয়া দেন সে দিন পুত্র আমাদের কি বলিয়াছিল মনে আছে ?'

গৃহিণী । 'আমি মেয়ে মানুষ আমার কি অত মনে থাকে ?'

গোক । 'পুত্র বলিয়াছিল 'পিতা, রঘুনাথজী যদি বিদ্রোহী হয়েন তাহা হইলে আমি যেন কখনও খড়্গ ধারণ করিতে না পারি। আমি হাবেলদারকে চিনি, তাঁহার ন্যায় বীর শিবজীর সৈন্যে আর নাই, কি ভ্রমে পতিত হইয়া রাজা তাঁহার অবমাননা করিলেন,—পশ্চাৎ জানিবেন, তখন রঘুনাথের গুণ জানিতে পারিবেন' পুত্রের কথা এত দিনে সত্য হইল।'

সরযুর হৃদয় উল্লাসে উদ্বেগে দুরু দুরু করিতে লাগিল, তিনি ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন, তাঁহার মস্তক হইতে স্বেদবিন্দু বহির্গত হইতে লাগিল। এ উদ্বেগ অসহ্য।

গোকর্ণনাথ বলিতে লাগিলেন—

"রঘুনাথজী ছদ্মবেশে রাজার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী গিয়াছিলেন, আপন কৌশলে রাজাকে উদ্ধার করিয়াছেন, আপন সম্পূর্ণ নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিয়াছেন ; শুনিয়াছি শিবজী সাশ্রুনয়নে আপন দোষের ক্ষমা চাহিয়াছেন, রঘুনাথকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, হাবেলদারের পদ হইতে একেবারে 'পাঁচ হাজারী' করিয়া দিয়াছেন। সহরে অন্য কথা নাই, হাটে বাজারে অন্য কথা নাই, গ্রামে অন্য কথা নাই, কেবল রঘুনাথের বীরত্ব কথা শুনিয়া সকলে জয় জয় নাদে ধন্যবাদ দিতেছে।'

আনন্দে, উল্লাসে সরযুর হৃদয় একেবারে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল,—রমণী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, চীৎকার শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন !

—

একত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন দর্শন।

" বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ
হইও তুমি ॥
তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল
প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন লইয়া নিশ্চয় হ-
ইলাম দাসী ॥
ভাবিয়া দেখিলাম এ তিন ভুবনে আর
কেহ মোর কাছে।
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই, দাঁড়াব
কাহার কাছে ॥
একুলে ওকুলে গোকুলে দুকুলে,
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি
কমল পায়॥"

চণ্ডীদাস।

অনেক শুশ্রূষায় সরযু চেতনা প্রাপ্ত হইলেন, হৃদয়ে সহসা বেদনা পাইয়াছিলেন বলিয়া গোকর্ণও তাঁহার স্ত্রীকে ভুলাইলেন কিন্তু সেই অবধি উদ্বেগে সরযুর আহার নিদ্রা নিয়মানুসারে হইত না, দিন গণিতেন, প্রহর গণিতেন, দণ্ড গণিতেন, সময়ে সময়ে পদ শব্দে চকিত হইতেন। চিন্তায় ও অতিশয় উদ্বেগে শরীরে রোগের সঞ্চার হইতে লাগিল।

এক দিন, দুই দিন, দশ দিন, একমাস অতিবাহিত হইল, রঘুনাথ আসিলেন না। তখন সরযু আর সহ্য করিতে পারিলেন না; চিন্তায় শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, মধ্যে মধ্যে শরীর জ্বালা করিত, মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা যাইতেন।

রঘুনাথ জীবিত আছেন সরযু তাহা জানিলেন, রঘুনাথ তবে আসেন না কেন? সরযুকে কি বিস্মৃত হইয়াছেন! বজ্রাঘাতের ন্যায় সরযুর হৃদয়ে এই ভীষণ চিন্তার আঘাত হইল।

দিন দিন এই নূতন চিন্তা প্রবলতর হইতে লাগিল, অবশেষে সরযু স্থির বুঝিলেন, বিজয়ী, গৌরবান্বিত রঘুনাথ অভাগিনী দুঃখিনীকে আর চাহেন না! উঃ শেলসম এ চিন্তা প্রণয়িনীর হৃদয়কে ব্যথিত করে! সরযুর পক্ষে জগৎ অদ্য শূন্য! জীবন অদ্য অন্ধকারময়!

উন্মাদিনী ভূমিতে লুটাইয়া বলিতেন —' হৃদয়েশ! কেন বাল্যকালে সুমিষ্ট কথায় বালিকার মন ভুলাইয়াছিলে? কেন বিদায়কালে সুমধুর আশাবাক্যে অবলাকে বুঝাইয়াছিলে? তুমি পুরুষ, অদ্য তোমার পদোন্নতির সহিত নব নব উদ্দেশ্য হইতেছে, নূতন উদ্যম, নূতন আশা উদয় হইতেছে—জগৎ প্রশস্ত, তোমার কার্য্যপরম্পরাও বিস্তীর্ণ ও অবারিত। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? হৃদয়ে হৃদয়ে যে আশা তুমি স্থাপন করিয়াছ, অভাগিনী সেই আশা এখনও চিন্তা করিতেছে। মৃত্যুকাল অবধি সেই আশা সযতনে গোপন করিবে। বালিকার প্রেম

লইয়া যৌবনে একদিন খেলা করিয়া অ-চিরে সে কথা বিস্মৃত হইলে, বালিকা সে কথা বিস্মৃত হইতে পারে না; পুরুষের খেলা,—রমণীর মৃত্যু।'

কখন বা দ্বিপ্রহর রজনীতে শোকা-ত্তবালা ক্রন্দন করিয়া উঠিতেন, বলিতেন—

'হা নাথ! জগত যখন আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল, লোকে যখন নিন্দা ক-রিয়াছিল, পিতা যখন তিরস্কার করিয়াছি-লেন, তখন আমি সহ্য করিব। হৃদয়েশ্বর! শেষে কি তুমিও অভাগি ত্যাগ করিলে? দুঃখিনী তোমার কি দোষে দোষী? তুমি আমার জন্য স্বীকার করিয়াছ। নাথ। আমি কি স্বীকার করি নাই? পিতা গালি দিয়া-ছেন, অন্য লোকে মন্দ বলিয়াছে, হৃদ-য়েশ! তোমার কথা স্মরণ করিয়া সকল সহ্য করিয়াছি। তোমার জন্য সংসার হারাইয়াছিলাম, জগৎ তুচ্ছ করিলাম, পি-তৃগৃহ ত্যাগ করিলাম, দেশে দেশে দাসী-বেশে ভিক্ষা করিয়াছি; এখন কি . .য আশা ছিন্ন হইল! বিধাতা, তুমিও কি অ-ভাগিনীকে ত্যাগ করিলে?'

পুনরায় বলিলেন, 'বিধাতা যদি চি-রদুঃখিনী করিতেন, কায়িক পরিশ্রমে যদি জীবন ধারণ করিতে হইত, ভগ্নকুটীরে যদি বাস করিতে হইত, ভিক্ষা করিয়া যদি দিন যাপন করিতে হইত, হৃদয়েশ! সরযু তোমাকে পাইলে এ সমস্ত উল্লাসে সহ্য করিত। পিতা দূর করিয়াছেন, মাতা বা-ল্যকালে ত্যাগ করিয়াছেন, হৃদয়নাথ, তাহা সহ্য করিয়াছি! লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিয়াছে, জগতে নিন্দা করি-য়াছে, নাথ, তাহাও সহ্য করিয়াছি, তো-মার চিন্তা করিয়া সমস্ত সহ্য করিয়াছি, জগতে এরূপ কি আছে অভাগিনী তো-মার জন্য যাহা সহ্য করিতে না পারে? রোগ, শোক, পরিতাপ, বিধাতা যে কোন ক্লেশ এ দুঃখিনীকে দিতেন, নাথ! যাকে পাইলে সমস্ত . . . করিতে . . . পা-না। কিন্তু সরযুর জীবন এখন শূন্য!

চিরজীবী হও, তোমার যশ, তো-মান, তোমার ধনের সীমা থাকিবে না, অনেক দাসী পাইবে, কিন্তু সরযুর ন্যায় কেহ ভাল বাসিতে পারিবে না! আমার আর অধিক দিন বাঁচিবার নাই, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।' নয়ন-জলে বালিকা শরীর আর্দ্র করিল। শেষে শ্রান্ত হইয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলি-লেন—'বাল্যকালে মাতাকে হারাইলাম, যৌবনে ধর্মপরায়ণ পিতা হারাইলাম। নাথ! অদ্য তুমিও অভাগিনীকে পায়ে ঠে-লিলে। তোমাকে নিন্দা করি না, জীবিত থাকিতে সরযু যেন তোমার নিন্দা না করে। অদ্য তুমি বড় লোক, অনেক ভাগ্যবতী তোমার পার্শ্বে বসিবে, অভা-গিনী সরযুর বাল্যকালে মনে একদিন এ-কটি আশার উদয় হইয়াছিল, দুঃখিনী তাহা ত্যাগ করিয়াছে, অচীরে জীবন ত্যাগ করিবে।'

এই রূপ দিবানিশি চিন্তা করিতেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ভূমিতে লুটাইতেন, অথবা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিতেন।

গোকর্ণ ও তাঁহার স্ত্রী অনেক শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সরযুর হৃদয় শান্ত হইল না; তাঁহার হৃদয়ের কথাও কেহ জানিতে পারিল না। হৃদয়ে অতিশয় বেদনা, প্রায় নয় মাস হইতে এইরূপ ... হইয়াছে. বেদনা আসিলে রো পী

না করি... থাকিতে পারেন না. . এইমাত্র সরযু বলিতেন। সরল ... গৃহিনী তাহাই বিশ্বাস করিতেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় সরযু নদীকূলে একাকিনী বসিয়া রহিয়াছেন, হস্তে গণ্ডস্থল স্থাপন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এরূপ সময়ে গোকর্ণের কন্যা আসিয়া ধীরে ধীরে সরযুর পার্শ্বে বসিয়া বলিল,—

'দিদি! তোর বুকে বেদনা হইয়াছে তবে তুই অত ভাবিস্ কেন? ভাব্‌লেই ও বেদনা বৃদ্ধি হয়।'

সরযু। 'না দিদি, ভাব্‌লে বেদনা একটু কমে, সেই জন্য ভাবি।'

বালিকা। 'তুই কি ভাবিস্ দিদি? তোর বরের কথা বুঝি ভাবিস্?'

সরযু। সজল নয়নে ঈষৎ হাসিয়া বলিল 'হাঁ বরের কথাই ভাবি।'

বালি। 'বর কবে আস্‌বে?'

সর। 'বর আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে।' সরযুর মুখে হাস্য, চক্ষে জলবিন্দু!

বালি। 'তবে কি হবে?'

সর। 'আর একজন বর আমাকে বিবাহ করি বে।'

বালি। 'সে কে দিদি?'

সর। 'যম।'

বালি। 'সে কে?'

সর। 'আমার মত যাহাদের বরে ভুলিয়া যায়, যম তাহাকে বিবাহ করে।'

বালি। 'তাহার ত বড় দয়ার শ-

রীর

..র। 'অতিশয় দয়ার শরীর; কবে সে আমাকে নেবে?'

..লি! 'সে তোকে বিবাহ করিলে পীড়া আর থাকিবে না?'

সর। 'না; ... কষ্ট নিবারণ হবে। হা জগদীশ্বর!'

বালি। 'সে কবে আসিবে?'

সর। 'আজ রাত্রিতে!'

ক্ষণেক এইরূপ কথার পর বালিকা শয়ন করিতে গেল,—সরযু একাকিনী সেই নদীকূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

রজনী জগতে গভীর অন্ধকার ঢালিতে লাগিল, আকাশে তারাগুলি মিট্ মিট্ করিতেছে, সম্মুখে নদী কুল কুল শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সরযু নদীর দিকে চাহিলেন, পার্শ্বস্থ কুঞ্জবনের দিকে চাহিলেন। শেষে সেই নৈশ আকাশের দিকে চাহিলেন। অনেকক্ষণ স্থিরনেত্রে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

'জীবিতনাথ! সরযুর লীলাখেলা শেষ হইল, সরযুকে বিদায় দাও! বাল্যকালে একদিন ঐ দেবমূর্ত্তি দেখিয়া বালিকার মন ব্যাকুল হইয়াছিল, এক্ষণে সরযুর হৃদয় শান্ত। শান্ত—কিন্তু সেই অবয়ব এখনও হৃদয় ধারণ করিতেছে, যতদিন সরযু জীবিত থাকিবে সেই মূর্ত্তি হৃদ ধারণ করিবে। রঘুনাথ! অভাগিনী মৃত্যুর বিলম্ব নাই, কিন্তু মৃত্যুর সময়ও ঐ দেবমূর্ত্তি সরযু নয়নে দেখিতে থাকিবে, ঐ মধুময় কথাগুলি কর্ণে শুনিতে থাকিবে, তোমার মধুময় নাম উচ্চারণ করিবে, তোমার সুন্দর মুখচ্ছবি হৃদয়ে স্মরণ করিবে। বাল্যকালে যে আশা দিয়াছিলে, তাহা যদি সফল হইত, জীবিতেশ্বর! দাসী তোমার সেবার ত্রুটি করিত না, দাসী বিশ্বাসঘাতিনী হইত না। কিন্তু সে কথায় কায নাই, সে আশা দূর করিয়াছি, মৃত্যুর প্রাক্কালে জগদীশ্বরের নিকট সরযুর প্রার্থনা যেন তুমি চিরজীবী হও, যেন জগদীশ্বর তোমাকে চিরসুখে রাখেন। আর সরযুর হৃদয়ে খেদ নাই! জীবিতনাথ! সরযুকে বিদায় দাও, যদি কষ্ট না হয়, তোমার মুখচ্ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া যে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, কখন কখন সে অভাগিনীকে স্মরণ করিও।'

অভাগিনী নয়ন মুদিত করিলেন; অনেকক্ষণ সেই দেবনির্ম্মিত পুরুষের রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আহা! সেই মধুময় কথাগুলি যেন এখনও সরযু শুনিতেছেন 'সরযু! সরযু! আমি তোমার রঘুনাথ!'

নয়ন উন্মীলিত করিলেন,—সহসা তারকালোকে সেই দীর্ঘাকার বীরপুরুষকে দণ্ডায়মান দেখিলেন;—বাহুদ্বয় সরযুর দিকে প্রসারিত, চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ!

এ কি রোগীর স্বপ্ন মাত্র? বিধাতা! এ বিড়ম্বনা কি জন্য? সরযু নয়ন পুনরায় মুদিত করিলেন।

এ স্বপ্ন নহে, এ বিড়ম্বনা নহে! সরযু পুনরায় চাহিলেন, কি দেখিলেন?

দেখিলেন হৃদয়নাথ অভাগিনীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, উঃ! সরযুর তপ্ত হৃদয় সেই প্রশান্ত হৃদয়ে শীতল হইল, সরযুর ঘনশ্বাসের সহিত রঘুনাথের নিশ্বাস মিশ্রিত হইল সরযুর কম্পিত ওষ্ঠদ্বয় রঘুনাথের ওষ্ঠ স্পর্শ করিল!

উঃ! সে স্পর্শে বালিকা শিহরিয়া উঠিল, বালিকা সংজ্ঞাশূন্য! একি প্রকৃত না স্বপ্ন? আনন্দভরে বায়ুতাড়িত পত্রের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরযু মনে মনে বলিলেন 'জগদীশ্বর! এ যদি স্বপ্ন হয়, যেন এ সুখ নিদ্রা হইতে কখনও না জাগরিত হই!'

—•:•—

দ্বাত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন নির্ব্বাণ।

হাসিয়া বলেন ভীষ্ম শুনহ রাজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় অবশ্য ঘটন।
ধর্ম্ম অনুসারে জয় ঈশ্বর বচন।

কাশীরাম দাস।

মহারাষ্ট্রদেশে মহাসমারোহ আরম্ভ হইল! শিবজী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, পুনরায় আরংজীবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ম্লেচ্ছদিগকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। নগরে গ্রামে পথে ঘাটে এই জনরব হইতে লাগিল।

এদিকে রাজা জয়সিংহ বিজয়পুর নগর আক্রমণ করিয়াও সে স্থান হস্তগত করিতে পারিলেন না। তিনি বার বার দিল্লীর সম্রাটের নিকট সহায়তার জন্য যে আবেদন করিয়াছিলেন তাহাও বিফল হইল, অবশেষে তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, যে তাঁহার সৈন্য সমেত বিনাশ ভিন্ন আরংজীবের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন বিজয়পুর ত্যাগ করিয়া আরঙ্গাবাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শেষ পর্য্যন্ত আরংজীবের বিশ্বস্ত অনুচরের ন্যায় কার্য্য করিলেন। আরংজীব তাঁহার প্রতি এরূপ অভদ্র আচরণ করিয়াছেন বলিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও সম্রাটের কার্য্যে ঔদাস্য প্রকাশ করিলেন না। যখন নিশ্চয় দেখিলেন মহারাষ্ট্র দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে তখন পর্য্যন্ত যতদূর সাধ্য সম্রাটের ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টা করিলেন। লৌহগড়, সিংহগড় পুরন্দর প্রভৃতি স্থানে, সম্রাটের সেনা সন্নিবেশিত করিলেন, তদ্ভিন্ন যে যে দুর্গ অধিকারে রাখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সে সমস্ত একেবারে চূর্ণ করিয়া দিলেন যেন শত্রুরা ব্যবহার করিতে না পারে।

কিন্তু এ জগতে এরূপ বিশ্বস্ত কার্য্যের পুরস্কার নাই; জয়সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়াছেন শুনিয়া আরংজীব যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, আরও অবমানিত করিবার জন্য তাঁহাকে দক্ষিণ দেশের সেনাপতিত্ব হইতে অপসৃত করিয়া দিল্লীতে 'তলব' করিলেন, যশোবন্ত সিংহকে তাঁহার স্থলে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ সেনাপতি আজীবন সাধ্যমতে দিল্লীর কার্য্যসাধন করিয়াছিলেন; শেষ দশায় এ অবমাননায় তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইল, তিনি পথেই মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন।

অবমানিত, পীড়িত জয়সিংহ মৃত্যুশয্যায় শয়িত রহিয়াছেন, এরূপ সময় একজন দূত সংবাদ দিলেন—

'মহারাজ! একজন মহারাষ্ট্র সেনানী আপনার দর্শনাভিলাষী। তিনি বলিলেন যে তিনি আপনার চরণোপান্তে বসিয়া এক দিন উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, আর এক দিন উপদেশ পাইবার আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন।'

রাজা উত্তর করিলেন—

'সম্মানপূর্ব্বক লইয়া আইস। তিনি দিল্লীর শত্রু কিন্তু দূতরূপে আসিতেছেন, আমি তাঁহাকে নির্ভয় দিতেছি, রাজপুতের বাক্যের অন্যথা হয় না।'

ক্ষণেক পর একজন মহারাষ্ট্র ছদ্মবেশে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

রাজা তাঁহার দিকে না চাহিয়াই বলিলেন—

'সুহৃদ্বর শিবজী ! মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার দেখা হইল, চরিতার্থ হইলাম। উঠিয়া অভ্যর্থনা করিবার ক্ষমতা নাই, দোষ গ্রহণ করিবেন না, আসন গ্রহণ করুন।'

সজলনয়নে শিবজী বলিলেন, 'পিতঃ ! যখন শেষ আপনার নিকট বিদায় লইয়াছিলাম তখন আপনাকে এত শীঘ্র এরূপ অবস্থায় দেখিব কখন মনে করি নাই।'

জয়। 'রাজন্ ! মনুষ্যদেহ ক্ষণভঙ্গুর, ইহাতে বিস্ময় কি।' ক্ষণেক পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন 'শিবজী, আমাদের শেষ যখন সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমরা মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব দেখিয়াছিলাম ; এখন কি দেখিতেছ ?,

শিব। 'মহারাজ সেই সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন, আপনাকে যখন এ অবস্থায় দেখিতেছি, তখন মোগল সাম্রাজ্যের আর আশা নাই।'

জয়। 'বৎস ! তাহা নহে। রাজস্থানভূমি বীরপ্রসবিনী, জয়সিংহ মরিলে অন্য জয়সিংহ হইবে, জয়সিংহের ন্যায় সহস্র যোদ্ধা এখনও বর্ত্তমান আছেন। মাদৃশ একজন লোকের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।'

শিব। 'আপনার অমঙ্গল অপেক্ষা সাম্রাজ্যের অধিক কি অনিষ্ট হইতে পারে ?'

জয়। 'শিবজী ! একজন যোদ্ধা যাইলে অন্য যোদ্ধা হয়, কিন্তু পাতকে যে ক্ষয়সাধন করে তাহার পুনঃসংস্কার হয় না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যথায় পাপ ও কপটাচারিতা, তথায় অবনতি ও মৃত্যু। এক্ষণে প্রত্যক্ষ তাহা অবলোকন করুন।'

'[illegible]বেদন করুন।'

[illegible] আপনাকে আমি দিল্লী [illegible] তখন আপনার হৃদয়ও দি[illegible]শ্বরের [illegible] আকৃষ্ট হইয়াছিল। আপনার স্থির সঙ্কল্প ছিল, দিল্লীশ্বর যত দিন আপনাকে বিশ্বাস করিবেন, আপনি তত দিন বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। আপনার প্রতি সদাচরণ করিলে সম্রাটের দক্ষিণ দেশে একজন পরাক্রান্ত বন্ধু থাকিত, কপটাচরণ বশতঃ সেই স্থানে একজন দুর্দ্দমনীয় শত্রু হইয়াছেন।'

শিব। 'মহারাজ ! আপনার বুদ্ধি অসাধারণ ও বহুদূরদর্শী, জগতে যথার্থই জয়সিংহকে বিজ্ঞ বলিয়া জানে।'

জয়। 'আরও শ্রবণ করুন। আমি আরংজীবের পিতার সময় হইতে দিল্লীর কার্য্য করিয়াছি। বিপদে, যুদ্ধসময়ে, যত দূর সাধ্য, দিল্লীশ্বরের উপকার করিয়াছি। স্বজাতি, বিজাতি বিবেচনা করি নাই, আত্মপর বিবেচনা করি নাই, যাঁহার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি জীবন পণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসাধন করিয়াছি। বৃদ্ধকালে সম্রাট্ আমার প্রতি প্রথমে অসদাচরণ করিলেন,

পরে অবমাননা করিলেন। সে জন্য আমার কার্য্যে বৈলক্ষণ্য নাই, আমি যে সমস্ত সৈন্য প্রধান প্রধান দুর্গে রাখিয়া যাইলাম, শিবজী, তাহারা বিনা যুদ্ধে আপনাকে দুর্গ হস্তগত করিতে দিবে না। কিন্তু এ আচরণে আবংজীব স্বয়ং ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। অম্বরাধিপেরা দিল্লীশ্বরের চিরবিশ্বস্ত অনুচর ও সহায়, অদ্য [illegible] দিবস রাজগণ দিল্লীর প্রধা[illegible] নি বার[illegible]।'

ক্রোধে শিবজীর নয়ন[illegible] মহারাজ[illegible]ত। [illegible]গিল, মহাত্মা জয়সিংহ সে [illegible]ক্রোধ [illegible]রণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

[illegible] উদাহরণ দিলাম, মহারাষ্ট্র দেশের ও অম্বর দেশের। সমস্ত ভারতবর্ষে এইরূপ। শিবজী! আবংজীব সমস্ত ভারতবর্ষে বিশ্বস্ত অনুচরের অবমাননা করিতেছেন, মিত্রদিগকে শত্রু করিতেছেন, বারাণসী মন্দির বিনষ্ট করিয়া তথায় মস্জীদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, রাজস্থানে, সর্ব্বদেশে হিন্দুদিগের অবমাননা করিতেছেন, হিন্দুদিগের উপর জিজিয়া করস্থাপন করিতেছেন।' ক্ষণেক পরে নয়ন মুদিত করিয়া অতি গম্ভীর স্বরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন—যেন মৃত্যুশয্যায় মহাত্মার দিব্য চক্ষু উন্মীলিত হইল, সেই চক্ষুতে ভবিষ্যৎ দেখিয়াই যেন রাজর্ষি কহিতে লাগিলেন,—'শিবজী! আমি দেখিতেছি যে, এই কপটাচারিতায় চতুর্দ্দিকে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইল, রাজস্থানে অনল প্রজ্বলিত হইল, মহারাষ্ট্রে অনল জ্বলিল, পূর্ব্ব দিকে অনল জ্বলিল। আরংজীব বিংশতি বৎসর যত্ন করিয়া সে অনল নির্ব্বাণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তাঁহার অসামান্য কৌশল, তাঁহার অসাধারণ সাহস ব্যর্থ হইল; বৃদ্ধ বয়সে পশ্চাৎ তাপ করিয়া দিল্লীশ্বর প্রাণত্যাগ করিলেন! অনল আরও প্রবলবেগে জ্বলিতেছে, চারিদিক হইতে ধূধূ শব্দে জ্বলিতেছে, সেই অনলে মোগল সাম্রাজ্য দগ্ধ হইয়া গেল! তাহার পর? তাহার পর মহারাষ্ট্র জাতির নক্ষত্র উন্নতিশীল, মহারাষ্ট্রীয়গণ! অগ্রসর হও, দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে উপবেশন কর।'

রাজার বচন রোধ হইল। চিকিৎসকেরা পার্শ্বে ছিলেন তাঁহারা নানা ঔষধি দিলেন, কিন্তু জয়সিংহ অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর মৃদুস্বরে বলিলেন, 'কপটাচারী আপনাকেই শাস্তিদান করে; সত্যমেব জয়তি।'

শ্বাস রোধ হইল, শরীর হইতে প্রাণ নির্গত হইল।

শিবজী বালিকার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন; মৃত জয়সিংহের পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

জীবন প্রভাত।

'ধনুর্দ্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা—
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!,

মধুসূদন দত্ত।

রজনী এক প্রহর মাত্র আছে এরূপ সময়ে শিবজী রাজপুতশিবির ত্যাগ করিলেন। বাহিরে আসিয়া একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন, চিনিলেন তিনি রাজা জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী।

মন্ত্রী বলিলেন, 'রাজন্! মহারাজা জয়সিংহ আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত্যুর পর আপনার হস্তে এই সমস্ত কাগজ দিব। এত দিন এ সমস্ত সাবধানে রাখিয়াছিলাম, আপনি এক্ষণে গ্রহণ করুন।

শিবজী সে সময়ে অতিশয় শোকার্ত্ত ছিলেন, কোন উত্তর না করিয়া সেই কাগজ লইয়া নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই প্রধান প্রধান সেনানী ও অমাত্যদিগকে একত্র করিলেন। ক্ষণেক পরামর্শ করিলেন, পরে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপনার সমস্ত সৈন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন—

'বন্ধুগণ! প্রায় একবৎসর হইল আমরা আরংজীবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলাম; আরংজীবের নিজের দোষে ও কপটাচারিতায় সে সন্ধি খণ্ডন
যাছে; অদ্য আমরা সে কপট আচ
পরিশোধ করিব,—মুসলমানদি
হিত পুনরায় যুদ্ধ করিব।

'যিনি আরংজীবের
ছিলেন, ঈশ্বা[illegible]
নি[illegible]
বজী
অদ্য
[illegible]
পরিশোধ

'চারিদি[illegible]
হিন্দুর অবমাননা,—
দেবালয়ের অবমাননা।
আমরা এ অবমাননা দূর[illegible]
এ অবমাননার যদি পরিশো[illegible]
বীরগণ। রণরঙ্গে আমরা ইহার পরিশো[illegible]
করিব।

'মৃত্যুশয্যায় রাজা জয়সিংহের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইয়াছিল, তিনি দেখিলেন মোগলদিগের ভাগ্যনক্ষত্র অবনতিশীল,—মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্যনক্ষত্র উন্নতিশীল,—দিল্লীর সিংহাসন ত্বরায় শূন্য হইবে, বন্ধুগণ অগ্রসর হও, যুধিষ্ঠির ও পৃথ্বুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার করিব।

'পূর্ব্বদিকে রক্তিমাচ্ছটা দেখিতে পা-

...ছু, ও প্রভাতের রক্তিমাচ্ছটা। কিন্তু আমাদিগের পক্ষে সামান্য প্রভাত ...মহারাষ্ট্রগণ। হিন্দুগণ। অদ্য আ-

নন্দপ্রভাত।"

...ও সৈন্যগণ এই মহৎ ... অদ্য আ-

...চত।

...রাম দাস।

...য় রঘুনাথ এ-

...রণা করিতেছিলেন,

...ত, সরযুর সহিত পুন-

...দিগের সহিত পুনরায়

...গের ভাবী স্বাধীনতা, এইরূপ

বিষয়ের চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইতেছিল। সহসা পশ্চাৎ হইতে একজন ডাকিলেন—

'রঘুনাথ।'

রঘুনাথ পশ্চাৎদিকে চাহিয়া দেখিলেন চন্দ্ররাও জুম্‌লাদার! রোষে তাঁহার শরীর কাঁপিতেছিল, কিন্তু ঈশানীমন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি বিস্মৃত হয়েন নাই।

চন্দ্ররাও বলিলেন, 'রঘুনাথ! এজগতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই, একজন মরিব।'

রঘুনাথ রোষ সম্বরণ করিয়া ধীরস্বরে বলিলেন, 'চন্দ্ররাও! কপটাচারী, মিত্রহন্তা চন্দ্ররাও! তোমার উপযুক্ত শাস্তি শিরশ্ছেদন, কিন্তু রঘুনাথ তোমাকে ক্ষমা করিলেন,—জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।'

চন্দ্র। 'বালকের ক্ষমা গ্রহণ করা আমার অভ্যাস নাই। তোমার আর অধিক জীবিত থাকিবার সময় নাই, মন দিয়া আমার কথা শুন।

'জন্ম অবধি তুমি আমার পরম শত্রু, আমি তোমার পরম শত্রু। বাল্যকালে তোমাকে আমি দিব্যচক্ষুতে দেখিতাম, সহস্রবার প্রস্তরের উপর তোমার মস্তক আঘাত করিবার সঙ্কল্প মনে উদয় হইয়াছে। তাহা করি নাই, কিন্তু তোমার বিষয় নাশ করিয়াছি, তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছি, তোমাকে বিদ্রোহী বলিয়া অপমানিত ও দূরীকৃত করিয়াছি! চন্দ্ররাওয়ের ভীষণ জিঘাংসা তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়াছিল।

'তোমার ভাগ্য মন্দ, পুনরায় উন্নত পদ লাভ করিয়া সৈন্যমধ্যে আসিয়াছ। চন্দ্ররাওয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা জীবনে কখনও নিষ্ফল হয় নাই, এখনও হইবে না। অন্য উপায় ত্যাগ করিলাম, এই অসি দ্বারা তোর হৃদয় বিদ্ধ করিব, হৃদয়ের শোণিত পান করিয়া এ ভীষণ পিপাসা নির্ব্বাণ করিব। ভীরু! তোর অদ্য আমার হস্তে রক্ষা নাই।'

রোষে রঘুনাথের নয়ন অগ্নিবৎ জ্বলিতেছিল, কম্পিতস্বরে বলিলেন ‘পামর! সম্মুখ হইতে দূর হ, নচেৎ আমি পবিত্র প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইব, সহসা তোর পাপের দণ্ড দিব।’

চন্দ্র। ‘ভীরু! এখনও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ, তবে আরও শোন্। উজ্জয়িনীর যুদ্ধে যে তীরে তোর পিতার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল সে শত্রুনিক্ষিপ্ত নহে, চন্দ্ররাও তোর পিতৃহন্তা!’

রঘুনাথ আর নয়নে কিছু দেখিতে পাইলেন না, কর্ণে শুনিতে পাইলেন না, রোষে অসি নিষ্কোষিত করিয়া চন্দ্ররাওকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্ররাও ও ক্ষীণহস্তে অসি ধারণ করেন নাই, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, উভয়ের অসিতে উভয়ের শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, বর্ষার ধারার ন্যায় উভয়ের শরীর দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল। চন্দ্ররাও বলে ন্যূন নহেন, কিন্তু রঘুনাথ দিল্লীতে চমৎকার অসিযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন, অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর চন্দ্ররাওকে পরাস্ত করিলেন, তাঁহাকে ভূমিতে পাতিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে জানু স্থাপিত করিলেন; বলিলেন—

‘পামর! অদ্য তোর পাপরাশির শেষ হইল, পিতা! আপনার মৃত্যুর পরিশোধ হইল।’

মৃত্যুর সময়েও চন্দ্ররাও নির্ভীক; বিকট হাস্য হাসিয়া বলিলেন, ‘আর তোর ভগ্নী বিধবা হইল, সে চিন্তা করিয়া সুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।’ পুনরায় হাস্য করিয়া উঠিলেন।

বিদ্যুতের ন্যায় সমস্ত কথা তখন রঘুনাথের মনে উপলব্ধি হইল। এই জন্য লক্ষ্মী স্বামীর নাম করেন নাই, এই জন্য চন্দ্ররাওয়ের অনিষ্ট না হয়, প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পিতৃহন্তা কুপিশাচ চন্দ্ররাও বলপূর্ব্বক নীকে বিবাহ করিয়াছে! রোষে নাথের নয়ন দিয়া অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল, দন্ত কড়মড় করিল; কিন্তু তাঁহার উন্নত অসি চন্দ্ররাওয়ের হৃদয়ে স্থাপিত হইল না; তিনি ধীরে ধীরে চন্দ্ররাওকে ছাড়িয়া দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

কম্পিতস্বরে কহিলেন ‘পিশাচ! তোর পাপ জগদীশ্বর বিচার করুন, রঘুনাথ তোর দণ্ড দিতে অক্ষম!’

‘দোষের, বিদ্রোহিতার দণ্ড দিতে অক্ষম নহি,’ বলিয়া পশ্চাৎ হইতে একজন লোক নিকটে আসিলেন, রঘুনাথ চাহিয়া দেখিলেন শিবজী!

শিবজী ইঙ্গিত করাতে অন্তরাল হইতে চারিজন সৈনিক আসিল, চন্দ্ররাওয়ের হস্ত বদ্ধ করিয়া তাহাকে বন্দীস্বরূপ লইয়া গেল!

পর দিন প্রাতে চন্দ্ররাওয়ের বিচার। রঘুনাথের পিতাকে হনন করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে; রঘুনাথকে কল্য অন্যায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে দোষের বিচার নহে: রুদ্রমণ্ডল দুর্গ আক্রমণের পূর্ব্বে শত্রু রহমৎখাঁকে গুপ্ত সংবাদ

দিয়াছিলেন, পরে সে দোষে রঘুনাথকে দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহারই বিচার!

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—আফগান সেনাপতি রহমৎখাঁ রুদ্রমণ্ডলে বন্দী হইলে পর শিবজী তাঁহাকে ভদ্রাচরণ পূর্ব্বক ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, রহমৎখাঁও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়া আপন … রের সুলতানের নিকট গমন ক… হলেন। জয়সিংহ যখন বিজয়পুর আক্রমণ করেন তখন রহমৎখাঁ আপন নৈসর্গিক সাহসের সহিত যুদ্ধ করেন, একটি যুদ্ধে অতিশয় আহত হইয়া জয়সিংহের বন্দী হয়েন। জয়সিংহ তাঁহাকে আপন শিবিরে আনাইয়া অনেক যত্ন ও শুশ্রূষা করাইয়াছিলেন, কিন্তু সে রোগ আরাম হইল না, তাহাতেই রহমৎখাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন জয়সিংহ রহমৎখাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খাঁ সাহেব! আপনার আর অধিক পরমায়ু নাই, আমার সমস্ত যত্ন ও চিকিৎসা বৃথা হইল। এক্ষণে যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।'

রহমৎখাঁ বলিলেন—'আমার মরণের জন্য আক্ষেপ নাই, কিন্তু শত্রু হইয়া আমার প্রতি যেরূপ সদাচরণ করিয়াছেন তাহার পরিশোধ করিতে পারিলাম না এই আক্ষেপ রহিল। কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন, আপনার নিকট আমার অবক্তব্য কিছুই নাই।'

রাজা জয়সিংহ বলিলেন, 'রুদ্রমণ্ডল আক্রমণের পূর্ব্বে একজন শিবজীর সেনানী আপনাকে সংবাদ দিয়াছিল; সে কে আমরা জানি না, আমার বোধ হয় একজন অন্যায় দণ্ডিত হইয়াছে।'

রহমৎ। 'আমি জীবিত থাকিতে সে নাম প্রকাশ করিব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। রাজপুত! আপনার ভদ্রাচরণে আমি অতিশয় সম্মানিত হইয়াছি কিন্তু পাঠানপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে অশক্ত।'

জয়সিংহ ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'যোদ্ধা! আপনার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে আমি বলিতেছি না, কিন্তু যদি কোনও নিদর্শন থাকে তাহা আমাকে দিতে আপত্তি আছে?

রহমৎ। 'প্রতিজ্ঞা করুন সে নিদর্শন আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঠ করিবেন না।'

জয়সিংহ তাহাই প্রতিজ্ঞা করিলেন, তখন রহমৎখাঁ তাঁহাকে কতকগুলি কাগজ দিলেন।

রহমতের মৃত্যুর পরে রাজা জয়সিংহ সেই সমস্ত পত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিলেন, বিদ্রোহী চন্দ্ররাও!

চন্দ্ররাও রহমৎখাঁকে স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা রাজা পড়িলেন, সে সম্বন্ধে অন্যান্য যে যে কাগজ ছিল তাহাও পাঠ করিলেন, চন্দ্ররাও পাঠানদিগের নিকট যে পারিতোষিক পা-

ইয়াছিলেন তাহার প্রাপ্তি স্বীকার পর্য্যন্ত রাজা জয়সিংহ দেখিলেন।

জয়সিংহের মৃত্যুর দিনে তাঁহার মন্ত্রী সেই সমস্ত কাগজ শিবজীকে দিয়াছিলেন।

বিচার কার্য্যে অধিক সময় আবশ্যক হইল না। শিবজীর চিরবিশ্বস্ত মন্ত্রী রঘুনাথ ন্যায়শাস্ত্রী একে একে সেই পত্রগুলি পাঠ করিতে লাগিলেন, যখন পাঠ সমাধা হইল তখন রোষে সমস্ত সেনানীগণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। চন্দ্ররাও বিদ্রোহী, স্বয়ং শত্রুদিগকে সংবাদ দিয়া পারিতোষিক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দোষে নির্দ্দোষী নিষ্কলঙ্ক বীর রঘুনাথের প্রাণদণ্ডের প্রয়াস পাইয়াছিলেন একথা সকলে জানিতে পারিয়া রোষে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন।

তখন শিবজী বলিলেন—' পাপাচারী বিদ্রোহি তোর মৃত্যু সন্নিকট, তোর কিছু বলিবার আছে।'

মৃত্যুর সময়ও চন্দ্ররাও নির্ভীক, তাঁহার দুর্দ্দমনীয় দর্প ও অভিমান এখনও পূর্ব্ববৎ। বলিলেন—

আমি আর কি বলিব? আপনার বিচার ক্ষমতা প্রসিদ্ধ! এক দিন এই দোষে রঘুনাথকে দণ্ড দিয়াছিলেন, অদ্য আমাকে দণ্ড দিতেছেন, আমার মৃত্যুর পর আর এক দিন আর এক জনকে দণ্ড দিবেন, তখন জানিবেন চন্দ্ররাও এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানে না, এসমস্ত প্রমাণ মিথ্যা।'

এই বিদ্রূপে শিবজী মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন—

' জল্লাদ, চন্দ্ররাওয়ের দুই হস্ত ছেদন কর; তাহা হইলে আর ঘুষ লইতে পারিবে না, তাহার পর তপ্ত লৌহদ্বারা ললাটে 'বিশ্বাসঘাতক' অঙ্কিত করিয়া দাও, তাহা হইলে আর কেহ বিশ্বাস করিবে না।'

জল্লাদ এই নৃশংস আদেশ পালন করিতে যাইতেছিল, এরূপ সময় রঘুনাথ সসম্মান হইয়া কহিলেন, ' মহারাজ! আমার একটি নিবেদন আছে।'

শিব। ' রঘুনাথ! এ বিষয়ে তোমার নিবেদন আমরা অবশ্য শুনিব, কেন না এই পামর তোমারই প্রাণনাশের যত্ন করিয়াছিল; তাহার কি প্রতিহিংসা লইতে ইচ্ছা কর, নিবেদন কর।'

রঘুনাথ। ' মহারাজের অঙ্গীকার অনুজ্ঞা, আমি এই প্রতিহিংসা যাচ্ঞা করি, যে চন্দ্ররাওয়ের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ না করে;—অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া বিনা দণ্ডে মুক্ত দিন।'

সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ!

শিবজী ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেন—

' তোমার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিল,—তোমার অনুরোধে সে জন্য চন্দ্ররাওকে রক্ষা করিলাম। রাজ-বিদ্রোহাচরণের শাস্তি দিবার অধিকারী রাজা। সে শাস্তির আদেশ করিয়াছি, জল্লাদ আপন কার্য্য কর।'

রঘু। 'মহারাজের বিচার অনিন্দনীয়, কিন্তু দাস প্রভুর নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্তি দান করুন।'

শিব। 'এ ভিক্ষা দানে আমি অসমর্থ, রঘুনাথ তোমাকে এবার ক্ষমা করিলাম,—অন্যকে এতদূর ক্ষমা করিতাম না।' শিবজীর নয়ন প্রজ্বলিত হইতেছিল।

রঘু। 'প্রভু দুই একটি যুদ্ধে এ দাস প্রভুর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিল, প্রভুও দাসকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, অদ্য সেই পুরস্কার চাহিতেছি, চন্দ্ররাওকে বিনা দণ্ডে মুক্ত করুন।'

রোষে শিবজীর নয়ন হইতে অগ্নিকণা বাহির হইতেছিল; গর্জ্জন করিয়া বলিলেন 'রঘুনাথ। রঘুনাথ। কখন কখন আমাদের উপকার করিয়াছিলে বলিয়া অদ্য আমাদিগের বিচার অন্যথা করিতে চাহ? রাজ-আদেশ অন্যথা হয় না; তুমিও আপনার বীরত্বের কথা আপনি বলিতে ক্ষান্ত হও।

এ তিরস্কার বাক্যে রঘুনাথের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে উত্তর করিলেন,—

'প্রভু! পুরস্কার চাহা দাসের অভ্যাস নাই। অদ্য জীবনের মধ্যে প্রথমবার পুরস্কার চাহিয়াছি, প্রভু যদি এ পুরস্কার দানে অসম্মত হয়েন, দাস দ্বিতীয়বার চাহিবে না। দাসের কেবল এইমাত্র ভিক্ষা, প্রভু সদয় হইয়া তাহাকে বিদায় দিন, রঘুনাথ সৈনিকের ব্রত ত্যাগ করিবে, পুনরায় গোস্বামী হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিতে থাকিবে।'

শিবজী অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, রঘুনাথের নিকট কত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন স্মরণ করিলেন,—রঘুনাথের চক্ষুতে জল দেখিয়া কাতর হইলেন, ক্রোধ বিলুপ্ত হইল, ধীরে ধীরে বলিলেন,—

'রঘুনাথ! তোমার যাচ্ঞা দান করিলাম; চন্দ্ররাওকে মুক্ত করিলাম; রঘুনাথ! যে ব্রত ধারণ করিয়াছ তাহাতেই অবস্থিতি কর,—চিরকাল শিবজীর দক্ষিণ হস্তের ন্যায় হইয়া থাকিও!'

সভাসদ্ সকলে নিস্তব্ধ। সকলে ঘৃণার সহিত চন্দ্ররাওয়ের দিকে চাহিলেন,—

ঘোর অভিমানী চন্দ্ররাও সাধারণের এ ঘৃণা ও নিন্দাবাক্য সহ্য করিতে পারিলেন না, রঘুনাথের দয়াতে তাঁহার রক্ষা হইল এ কথা সহ্য করিতে পারিলেন না।

চন্দ্ররাও ভীরু নহেন। ধীর ধীরে ক্রোধ-জর্জ্জরিত শরীরে রঘুনাথের নিকট যাইয়া বলিলেন—

'বালক! তোর দয়া আমি চাহি না, তোর দেওয়া জীবন আমি তুচ্ছ করি, তোর অনুগ্রহে আমি এইরূপে পদাঘাত করি, বলিতে বলিতে রঘুনাথের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। পরে ক্ষণে আপন ছুরিকা নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপন করিয়া অ-

ভিমানী ভীবণপ্রতিজ্ঞ চন্দ্ররাও জুমলাদার সাধারণের ঘৃণা হইতে আপনার চিরনিষ্কৃতি সাধন করিলেন। জীবনশূন্য দেহ সভাস্থলে পতিত হইল!'

পঞ্চত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতা ভগিনী।

'সুত পরিবার,
কেবা বল কার
যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়,
সকল মিছামায়,
কেবল ভবের মায়া॥

কীর্ত্তিবাস ওঝা।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইয়াছে; এক্ষণে নায়ক নায়িকাদিগের বিষয় দুই একটি কথা বলিয়া পাঠক মহাশয়ের নিকট বিদায় লইব।

বৃদ্ধ জনার্দ্দন কন্যাকে হারাইয়া বাতুলের ন্যায় হইয়াছিলেন, পুনরায় সরযুকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন, 'সরযু! সরযু! তোমার ন্যায় রত্ন আমি ত্যাগ করিয়াছিলাম? তোমাকে ত্যাগ করিয়া কি একদিনও জীবন ধারণ করিতে পারি?' সরযুও পিতার গলা ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিলেন,—'পিতঃ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, জীবন থাকিতে আর কখনও আপনার ছাড়া হইব না।'

পুলকিত হৃদয়ে বৃদ্ধ শুনিলেন যে রঘুনাথ রাজপুত-সন্তান, অতি উন্নত ব্রাহ্মণবংশীয় বীরপ্রবর গজপতি সিংহের পুত্র; সানন্দহৃদয়ে শুভদিনে কন্যা দান করিলেন। সরযুর সুখ কে বর্ণনা করিবে? চারি বৎসর যে দেবকান্তির জপ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষ-দেবকে যখন আপন কোমলহৃদয়ে ধারণ করিলেন, তাঁহার ওষ্ঠে যখন উষ্ণ ওষ্ঠ স্থাপন করিলেন, তখন সাধ্বী সুখে উন্মাদিনী হইলেন। যাহারা সে সুখ ভোগ করিয়াছ, অনুভব কর, লেখক বর্ণনায় অক্ষম!

আর রঘুনাথ?—রঘুনাথ তোরণদুর্গে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন তাহা কি অদ্য সার্থক হইল? সেই প্রিয় কণ্ঠমালা বার বার সরযুর হৃদয়ে দোলাইয়া দিলেন, সেই পুষ্পবিনিন্দিত দেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, সেই বিশাল স্নেহপূর্ণনয়নের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উন্মত্ত প্রায় হইলেন।

সরযু তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া 'দিদি'কে বিস্মৃত হইলেন না। রঘুনাথের অনুরোধে শিবজী গোকর্ণকে একটি জায়গীর দান করিলেন ও গোকর্ণের পুত্র ভীমজীকে উন্নতি দান করিয়া হাবেলদার পদে নিযুক্ত করিলেন।

সরযু দিদিকে সর্ব্বদাই আপন গৃহে রাখিতেন, ও বরের সহিত 'সামন সমান' ভাল বাসিতেন,—কয়েক বৎসর পরে একটি সদ্বংশীয় সুচরিত্র পাত্র দেখিয়া দিদির বিবাহ দিলেন। বিবাহ দিবসে স-

রঘু ও রঘুনাথ স্বয়ং উপস্থিত রহিলেন; সরযু কন্যার কাণে কাণে বলিলেন,—'দেখিও দিদি। যাহা বলিয়াছিলে সে কথা যেন রাখিও,—বরের চেয়ে আমাকে ভাল বাসিবে।'

রঘুনাথ আখ্যায়িকাবিবৃত সময়ের পর ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ্যাতি ও সম্মানের সহিত শিবজীর অধীনে কার্য্য করিতে লাগিলেন। যশোবন্ত সিংহ যখন জানিতে পারিলেন রঘুনাথ তাঁহার প্রিয় অনুচর গজপতি সিংহের পুত্র, তখন রঘুনাথকে পৈতৃক ভূমি সমস্ত ছাড়িয়া দিলেন, তাহা ভিন্ন অনেক জায়গীর দান করিলেন। কিন্তু শিবজী রঘুনাথকে দেশে যাইতে দিলেন না, যতদিন জীবিত ছিলেন রঘুনাথকে নিকটে রাখিলেন। পরে যখন ১৬৮০ খৃঃ অব্দে চৈত্র মাসে শিবজীর মৃত্যু হয়, যখন অযোগ্য পুত্র শম্ভুজী পিতার পুরাতন ভৃত্যদিগকে একে একে অবমানিত বা কারারুদ্ধ করিতে লাগিলেন, রঘুনাথ আর মহারাষ্ট্রে থাকিলে উপকার নাই দেখিয়া সরযু ও জনার্দ্দনের সহিত স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, পৈতৃক জায়গীর অধিকার করিলেন, পৈতৃক প্রশস্ত গৃহ রঘুনাথ ও সরযুর বালকবালিকাদিগের ক্রীড়াশব্দ ও হাস্যধ্বনিতে শব্দিত হইতে লাগিল।

পাঠক! ইচ্ছা এই স্থানেই আপনার নিকট বিদায় লই, কিন্তু আর এক জনের কথা বলিতে বাকি আছে; শান্ত চিরসহিষ্ণু লক্ষ্মীরূপিণী লক্ষ্মীর কি হইল?

যেদিন চন্দ্ররাও আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, রঘুনাথ অনতিবিলম্বে ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলেন; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। দেখিলেন, শবের পার্শ্বে লক্ষ্মী আলুলায়িত বেশে গড়াগড়ি দিতেছেন, ঘন ঘন মোহ যাইতেছেন, সময়ে সময়ে হৃদয়বিদারক আর্ত্তনাদে ঘর পরিপূরিত করিতেছেন। হিন্দুরমণীর পতির মৃত্যুতে যে ভীষণ যাতনা হয়, কে বর্ণনা করিতে পারে? অদ্য লক্ষ্মীর নয়নের আলোক নির্ব্বাণ হইয়াছে, হৃদয় শূন্য হইয়াছে, জগৎ অন্ধকারময় হইয়াছে! শোকে, বিষাদে, নৈরাশে, নব বৈধব্যের অসহ্য যাতনায়, বিধবা ঘন ঘন আর্ত্তনাদ করিতেছে।

রঘুনাথ সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিলেন, সান্ত্বনা দূরে থাকুক লক্ষ্মী প্রাণের ভ্রাতাকে চিনিতেও পারিলেন না। ঝর ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে রঘুনাথ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় পুনরায় ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন, লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্ত্তন দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। দেখিলেন লক্ষ্মীর নয়নে জল নাই, ধীরে ধীরে স্বামীর মৃতদেহ সুন্দর শুভ্র সুগন্ধ পুষ্প দিয়া সাজাইতেছেন। বালিকা যেরূপ মনোনিবেশ করিয়া পুত্তলি সাজায়, লক্ষ্মী সেইরূপ মনোনিবেশ পূর্ব্বক মৃতদেহ সাজাইতেছেন।

রঘুনাথ গৃহে আসিলে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে রঘুনাথের নিকটে আসিলেন, অতি মৃদুপাদবিক্ষেপে আসিলেন, যেন শব্দ হইলে স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হইবে। অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—

'ভাই রঘুনাথ! তোমার সঙ্গে যে আর একবার দেখা হইল আমার পরম ভাগ্য, এখন আর আমার মনে কোনও কষ্ট থাকিল না।'

সাশ্রুনয়নে রঘুনাথ বলিলেন—'প্রাণের ভগিনী লক্ষ্মী, আমি তোমার সঙ্গে এ সময়ে দেখা না করিয়া কি থাকিতে পারি?'

লক্ষ্মী অঞ্চল দিয়া রঘুনাথের চক্ষের জল মোচন করিয়া বলিলেন—

'সত্য ভাই, তোমার দয়ার শরীর, তুমি হৃদয়েশ্বরের জন্য রাজার নিকট যে আবেদন করিয়াছিলে শুনিয়াছি। আমার ভাগ্যে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে, জগদীশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন।' নিজের চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল মোচন করিলেন।

রঘু। 'লক্ষ্মী! তুমি বুদ্ধিমতী আমি চিরকাল জানি, অসহ্য শোক কথঞ্চিৎ সম্বরণ করিয়াছ দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। মনুষ্যের জীবন শোকময়, তোমার কপালে যাহা ছিল ঘটিয়াছে, সে শোক সহিষ্ণু হইয়া বহন কর, আইস আমার গৃহে আইস, ভ্রাতার ভালবাসায় ভ্রাতার যত্নে যদি সন্তোষ দান করিতে পারে, লক্ষ্মী, আমি ত্রুটী করিবনা।'

লক্ষ্মী একটু হাসিলেন, সে হাস্য দেখিয়া রঘুনাথের প্রাণ শুকাইয়া গেল। ঈষৎ হাসিয়া লক্ষ্মী বলিলেন,—

'ভ্রাতঃ, তোমার দয়ার শরীর, কিন্তু লক্ষ্মীকে জগদীশ্বরই স্বয়ং সান্ত্বনা করিয়াছেন, শান্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। হৃদয়েশ্বর চির নিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন, তিনি জীবদ্দশায় দাসীকে অতিশয় ভালবাসিতেন, দাসী জীবনে তাঁহার প্রণয়িনী ছিল, মরণে তাঁহার সঙ্গিনী হইবে।'

রঘুনাথের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীর ভাব পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীর শান্ত ভাবের হেতু বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মী সহমরণে স্থির সঙ্কল্প হইয়াছেন।

তখন অনেকক্ষণ অবধি লক্ষ্মীর প্রতিজ্ঞাভঙ্গের চেষ্টা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, অনেক ক্রন্দন করিলেন, এক প্রহর রজনী পর্য্যন্ত লক্ষ্মীর সহিত তর্ক করিলেন, ধীর শান্ত লক্ষ্মীর একই উত্তর 'হৃদয়েশ্বর আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না।'

অবশেষে রঘুনাথ সজলনয়নে বলিলেন,—

'লক্ষ্মী, এক দিন আমার জীবন নৈরাশে পূর্ণ হইয়াছিল, আমি জীবনত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। ভগিনী তোমার প্রবোধে, তোমার স্নেহময় কথায় সে সঙ্কল্প ছাড়িলাম, পুনরায় কার্য্যজগতে প্রবেশ করিলাম। লক্ষ্মী, তুমি কি আ-

তার কথা রাখিবে না? তুমি কি ভ্রাতাকে ভালবাস না?'

লক্ষ্মী পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে উত্তর করিলেন—

'ভাই সে কথা আমি বিস্মৃত হই নাই, তুমি লক্ষ্মীকে ভালবাস, লক্ষ্মীর কথা শুনিয়াছিলে, তাহা বিস্মৃত হই নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ পুরুষের অনেক আশা, অনেক উদ্যম, অনেক অবলম্বন, একটি যাইলে অন্যটি থাকে, একটি চেষ্টা নিষ্ফল হইলে দ্বিতীয়টি সফল হয়। ভাই তুমি সেদিন ভগিনীর কথাটি রাখিয়াছিলে, অদ্য তোমার কলঙ্ক দূরীভূত হইয়াছে, ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে, সুযশ দেশদেশান্তরে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু অভাগিনী নারীর কি আছে? অদ্য আমি যে নয়নের মণিটি হারাইয়াছি তাহা কি জীবনে আর পাইব? যে মহাত্মা দাসীকে এত ভালবাসিতেন, এত অনুগ্রহ করিতেন, জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কি আর পাইব? ভাই! তুমি লক্ষ্মীকে বাল্যকাল হইতে বড় ভালবাসিয়াছ, অদ্য সদয় হও, লক্ষ্মীর একমাত্র সুখের পথে কাঁটা দিও না, যিনি দাসীকে এত ভালবাসিতেন তাঁহার সহিত যাইতে দাও!'

রঘুনাথ নিরস্ত হইলেন; স্নেহময়ী ভগিনীর অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া বালিকার ন্যায় ঝর ঝরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এ অসার কপট সংসারে ভ্রাতা ভগিনীর অখণ্ডনীয় প্রণয়ের ন্যায় পবিত্র স্নিগ্ধ প্রণয় আর কি আছে? স্নেহময়ভ্রাতা বা স্নেহময়ী ভগিনীর ন্যায় অমূল্য রত্ন এ বিস্তীর্ণ জগতে আর কোথায় যাইলে পাইব?

রজনী দ্বিপ্রহরের সময় চিতা প্রস্তুত হইল, চন্দ্ররাওয়ের শব তাহার উপর স্থাপিত হইল, হাস্যবদনা লক্ষ্মী সুন্দর পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া একে একে সকলের নিকট বিদায় লইলেন। চিতা পার্শ্বে আসিলেন, দাসীদিগকে অলঙ্কার, রত্ন, মুক্তা বিতরণ করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে তাহাদিগের নয়নের জল মোচন করিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, জ্ঞাতি কুটুম্বিনীদিগের নিকট বিদায় লইলেন, গুরুদিগের পদধূলি লইলেন, সপত্নীদিগের আলিঙ্গন করিয়া বিদায় দিলেন, সকলের নয়নের জল অঞ্চল দিয়া মুছাইয়া দিলেন, মধুময় বাক্য দ্বারা সকলকে প্রবোধ দিলেন।

শেষে রঘুনাথের নিকট আসিলেন—

বলিলেন 'ভাই! বাল্যকাল অবধি তোমার লক্ষ্মীকে তুমি বড় ভালবাসিতে, অদ্য লক্ষ্মী ভাগ্যবতী, অদ্য চিরসুখিনী হইবে, একবার ভালবাসার কাজ কর— সস্নেহে কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিদায় দাও, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।'

রঘুনাথ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, লক্ষ্মীর দুটি হাত ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন! লক্ষ্মীর ও চক্ষুতে জল আসিল।

সস্নেহে ভ্রাতার চক্ষুর জল মুছাইয়া লক্ষ্মী বলিতে লাগিলেন—

'ছি ভাই শুভকার্য্যে চক্ষুর জল ফেল কি জন্য? পিতার ন্যায় তোমার সাহস, পিতার ন্যায় তোমার মহৎ অন্তঃকরণ, জগদীশ্বর তোমার আরও সম্মান বৃদ্ধি করিবেন; জগৎ তোমার যশে পূর্ণ হইবে! লক্ষ্মীর শেষ বাসনা এই, জগদীশ্বর যেন রঘুনাথকে সুখে রাখেন! ভাই, বিদায় দাও, দাসীর জন্য স্বামী অপেক্ষা করিতেছেন।'

কাতরস্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

'লক্ষ্মী, তোমা বিনা জগৎ তুচ্ছজ্ঞান হইতেছে, জগতে আর রঘুনাথের কি আছে? প্রাণের লক্ষ্মী। তোকে কিরূপে বিদায় দিব, তোকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে জীবন ধারণ করিব?' আর্ত্তনাদ করিয়া রঘুনাথ ভূমিতে পতিত হইলেন।

অনেক যত্ন করিয়া লক্ষ্মী রঘুনাথকে উঠাইলেন, পুনরায় চক্ষুর জল মুছিয়া দিলেন, অনেক সান্ত্বনা করিলেন, অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, 'ভ্রাতঃ তুমি বীরশ্রেষ্ঠ! পুরুষের যাহা ধর্ম্ম তাহা তুমি পালন করিতেছ, তোমার লক্ষ্মীকে নারীর ধর্ম্ম পালন করিতে দাও। আর বিলম্ব করিও না, বাধা দিও না; ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে আকাশ রক্তবর্ণ হইয়াছে, তোমার লক্ষ্মীকে বিদায় দাও।'

গদ্ গদ স্বরে রঘুনাথ বলিলেন—

'লক্ষ্মী, প্রাণের লক্ষ্মী, এজগতে তোমাকে বিদায় দিলাম, ঐ আকাশে ঐ পুণ্যধামে আর একবার তোমাকে পাইব। সে পর্য্যন্ত জীবন্মৃত হইয়া রহিলাম।'

ভ্রাতার চরণধূলি লইয়া লক্ষ্মী চিতাপার্শ্বে যাইলেন, স্বামীর পদদ্বয়ে মস্তক স্থাপন করিয়া বলিলেন 'হৃদয়েশ্বর! জীবনে তুমি দাসীকে বড় ভাল বাসিতে, এখন অনুগ্রহ কর, যেন তোমার পদপ্রান্তে বসিয়া তোমার সঙ্গে যাইতে পারি। জন্ম জন্ম যেন তোমাকে স্বামী পাই,—জন্ম জন্ম যেন লক্ষ্মী তোমার পদসেবা করিতে পায়। জগদীশ্বর। লক্ষ্মীর অন্য কামনা নাই।'

ধীরে ধীরে চিতা আরোহণ করিলেন, স্বামীর পদপ্রান্তে বসিলেন, পদদ্বয় ভক্তিভাবে অঙ্কের উপর উঠাইয়া লইলেন। নয়ন মুদ্রিত করিলেন,—বোধ হইল যেন সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্মীর আত্মা স্বর্গে প্রবেশ করিল।

অগ্নি জ্বলিল. অতিশয় ঘৃত থাকায় শীঘ্র অগ্নি ধূ ধূ শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। প্রথমে অগ্নিজিহ্বা লক্ষ্মীর পবিত্র শরীর লেহন করিতে লাগিল, শীঘ্রই সতেজে চারিদিক বেষ্টন করিয়া লক্ষ্মীর মস্তকের উপর উঠিল, নৈশ গগনের দিকে মহাশব্দে ধাবমান হইল। লক্ষ্মীর একটি অঙ্গ নড়িল না, একটি কেশ কম্পিত হইল না!

এক প্রহরের মধ্যে অগ্নি নির্ব্বাণ হইল; কিন্তু সেই ভীষণ দৃশ্য, চিতার সেই নৈরাশজনক ধূ ধূ শব্দ রঘুনাথ জীবনে বিস্মৃত হইলেন না।

আর্য্যায়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

এ দেশের প্রায় সমস্ত গ্রন্থকারই 'কবিচিত্ত ফুলবনমধু কল্পনার' মাধুর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন। কেবল স্মৃতিকারগণই এই কল্পনাস্পৃহা কিয়ৎপরিমাণে সংযত করিতে পারিয়াছিলেন; তথাপি তাঁহারাও জগদুৎপত্তি প্রকরণাদিতে অসামান্য কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যাহা হউক অপরাপর সামাজিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে স্মৃতিকারগণ বড় একটা উপন্যাস বা অলঙ্কারের ছটা প্রকাশ করিয়া কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করিতে ব্যাকুল হন নাই। দেখা যাউক অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরির সম্বন্ধে ইহারা কি বলেন।

ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃপরাশর উচ্যতে।
মনুঃ।

বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ-
স্ত্রিয়াম্
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাংনিষাদোজাতঃ পারশবোঽ-
পিবা॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতোঽম্বষ্ঠোহি মুনি
সত্তমঃ।
ব্রাহ্মণং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টো মুনি-
পুঙ্গবৈঃ॥ পরাশরঃ।

বৈশ্যাজ্জাতোহি বৈদ্যঃস্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্মপু-
ত্রকঃ॥ শঙ্খঃ।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি সকল স্মৃতিকারই একবাক্যে অম্বষ্ঠবংশপ্রবর্ত্তককে ব্রাহ্মণবিবাহিতা বৈশ্যার সন্তান বলিয়াছেন। সুতরাং প্রাগুক্ত পৌরাণিক ইতিবৃত্ত হইতে আমরা যে ঐতিহাসিক সারসঙ্কলন করিলাম তাহার সহিত প্রায় সমস্ত স্মৃতিকারদিগের ঐকমত্য দেখা যায় অতএব প্রাগুক্ত বিবরণই আমরা ধন্বন্তরির প্রকৃত জন্মবিবরণ বলিয়া গ্রহণ করিলাম। পুরাণ কবিতারও বলেন যে ধন্বন্তরি স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনদ্বয়ের মানবীকন্যাত্রয়ের পাণিগ্রহণ করেন। অশ্বিনদিগের অপর নাম সনৎকুমার। সিদ্ধবিদ্যাদি এই তিন স্ত্রীর গর্ভে ধন্বন্তরির সেন দাসাদি চতুর্দ্দশ পুত্র জন্মে। অশ্বিনদ্বয় মানসপুত্র, চিরকুমার ছিলেন বলিয়াই, বোধ হয়, পুরাণ কবি ইহাদের মানসী কন্যার কল্পনা করিয়াছেন। যাহা-হউক, উপন্যাস ত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ধন্বন্তরির তিন পাণিগ্রহের সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মহৌজা গালব-সুনু স্বকীয় প্রতি-

ভাবনে বয়োবৃদ্ধি সহকারে মুনি সমাজে অতীব খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। পুত্রগণও পিতার অনুবর্ত্তন করিয়া উত্তরোত্তর বংশোজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। আমরা পাঠকগণকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি যে তাঁহারা যেন বর্ত্তমান কালের বৈদ্যকুলকুঠার নিরক্ষর ভিষক্‌নামধারীদিগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া প্রাচীন ভিষক্‌গণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত না করেন। বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণবৈদ্য দেখিয়া পুরাকালের ব্রাহ্মণ বৈদ্যের ছায়া অঙ্কনপ্রায়াস বিড়ম্বনা মাত্র। স্মৃতিকারগণ বলেন যে আনুলোমিক জাতির মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ ঔরসে ও বৈশ্যাগর্ভে জন্মিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বেদ বেদাঙ্গ পারগ ও মুনি বলিয়া খ্যাত। *

ধন্বন্তরিসন্তান ব্যতীত মহামতী অগ্নিবেশ অপর একপ্রকার অম্বষ্ঠের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিপ্রপুত্র অম্বষ্ঠের ঔরসে ও বিপ্রকন্যা অম্বষ্ঠার গর্ভে যে সন্তান জন্মে সেও অম্বষ্ঠ † ব্রাহ্মণের সহিত তাহার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডত্ব। তিনি ব্যবহারশাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণত্যক্ত ধনাদির ও অধিকারী। যাহা হউক বর্ত্তমানকালে এবম্বিধ অম্বষ্ঠসন্তানদিগকে ধন্বন্তরিসন্তান হইতে নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, প্রত্যুত অসম্ভব ব্যাপার। বিশেষতঃ যখন উভয়েই একজাতিভুক্ত, তখন তদর্থে যত্নের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় না। হারীত স্বপ্রণীত সংহিতায় বলিয়াছেন 'ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহারাই দ্বিজ এবং ইহাদের যথাপূর্ব্ব গৌরব। * অগ্নিবেশও পদমর্য্যাদানিবন্ধনকালে বলিয়াছেন, ইহারা সত্যে পিতৃতুল্য, ত্রেতাতে তদ্রূপ, দ্বাপরে ক্ষত্রিয়বৎ, কলিতে বৈশ্যোপম † এই সমস্ত প্রাচীন সংহিতাবচনে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অমৃতাচার্য্যের বংশপরম্পরা অনেকেই সেই দেবতুল্য মহাপ্রভাববান্ পিতৃপুরুষের কুলের অলঙ্কার ছিলেন। কিন্তু, বিচারাসনে বসিয়া কে বলিতে পারে যে এই বৈদ্যনামধারী অদৃষ্টায়ুর্ব্বেদ বৈদ্যকুলকণ্টক কবিরাজ মহাশয়েরা তাহাদেরই বংশধর এবং তাদৃশ সম্মান ও ভক্তির পাত্র?

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ধন্বন্তরি ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন এবং ব্রাহ্ম-

---

* তত্র বৈশ্যা সুতায়াং যে জজ্ঞিরে তনয়া অমী। সর্ব্বেতে মুনয়ঃখ্যাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ॥

† একমেকস্য বিপ্রস্যাম্বষ্ঠজাত্যা অম্বষ্ঠাৎস্মৃতঃ। সোহন্যবিপ্রস্য কন্যায়ামম্বষ্ঠায়াস্তথাঽপরো। ব্রাহ্মণেন সপিণ্ডত্বং তেষাং ত্রৈপুরুষাবধিঃ। দারপ্রাপ্তিশ্চ বিপ্রস্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ॥ অগ্নিবেশঃ।

* ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্রবিশাবপি। অমীপঞ্চদ্বিজা এষাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্। হারীতঃ।

† সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃস্তুল্যা ত্রেতায়াঞ্চতথাস্মৃতা। দ্বাপরে ক্ষত্রবৎপ্রোক্তাঃ কলৌবৈশ্যোপমস্মৃতাঃ। অগ্নিবেশঃ।

ণগণ বৈদ্যদিগকে আয়ুর্ব্বেদব্যবসায় সম্প্রদান করেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে এরূপ প্রতীত হয় যে, ব্রাহ্মণাদিও তৎকালে এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেন। কারণ, যে কাল পর্য্যন্ত সমাজস্থ সকলের চিকিৎসোপযোগী বৈদ্যের সংখ্যাধিক্য হয় নাই সেই পর্য্যন্ত বৈদ্যেতরজাতিকেও বাধ্য হইয়া তদ্ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক এবম্বিধ প্রয়োজনপ্রণোদিত বৈদ্যব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ কদাচ অনুযোগার্হ নহেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্যবাহুল্য হইলেও লোভপরায়ণ হইয়া বৈদ্যব্যবসায় অবলম্বন করিতেন। যৎকালে চরক অগ্নিবেশতন্ত্র প্রতিসংস্কার করেন, অথবা যে সময়ে অগ্নিবেশ স্বয়ং আয়ুর্ব্বেদসংহিতা প্রণয়ন করেন সেই সময়েও ব্রাহ্মণের বৈদ্যবেশ ধারণ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিবার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি দীর্ঘজীবিত নামাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে পীড়িত ব্যক্তি বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইবেক না * সুতরাং তৎসময়ে এরূপ প্রথা প্রচলিতথাকার কোনও সন্দেহ নাই। ব্যবহারশাস্ত্রকারগণও এবম্বিধ প্রতারণা নিবারণোপায়ে স্বপ্রণীত সংহিতায় বিবিধ অনুশাসনবাক্য নিবদ্ধ করিয়াছেন। বৈদ্যবেশধারী ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্র সবস্ত্র স্নান করিবেক, এইবাক্য আজও আমাদের দেশে সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায় *। যে ব্রাহ্মণ চিকিৎসক তাহার অন্ন পূয়বৎ, যিনি কুসীদগ্রহণকারী, তাহার অন্ন বিষ্ঠা ইত্যাদি *। অনুশাসনবাক্যে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে বহুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া অন্য জাতির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু এস্থলে স্মরণ রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণগণ বৈদ্যদিগকে চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এক চেটিয়া রূপে দান করেন নাই। স্মৃতি পুরাণাদিতে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এরূপ হইলে আত্রেয় ভরদ্বাজাদির আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপন ধর্ম্মবিগর্হিত হইয়া উঠে। ইহাও অনুসন্ধেয় যে তৎকালে তাহাদের চিকিৎসা ব্যবসায়ও বিচার করিতে গেলে অসঙ্গত প্রতীয়মান হয় না। কারণ ধন্বন্তরির আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায় লাভ ভরদ্বাজের সময়ে ঘটে। সুতরাং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আত্রেয়ের চিকিৎসাব্যবসায় দত্তাপহারীত্বদোষসঙ্কুল নহে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান ধন্বন্তরি ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ লাভ করিয়া ভরদ্বাজ ও গালব প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিবর্গের

* নচশ্রুতবতাং বেশবিভ্রতাং শরণং গতাঃ॥ চরকে।

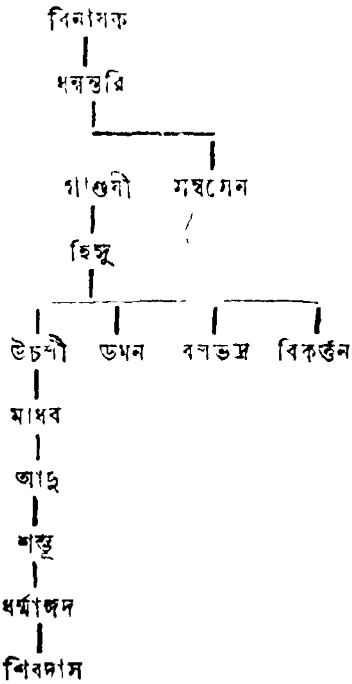
* ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং জলমাবিশেৎ।

† পূয়ং চিকিৎসকস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্তুন্নমিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠা বার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্॥

সম্মতি অনুসারে আপন সন্তানদিগকে তদ্ব্যবসায়ে অধিকারী করেন। এবং উত্তরকালের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে স্বয়ং একখানা সংহিতা প্রণয়ন করেন। আয়ুর্ব্বেদের যত সংহিতা প্রণীত হইয়াছে তন্মধ্যে আত্রেয় ও ধন্বন্তরিকৃত সংহিতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অমিতপ্রতিভ ধন্বন্তরি অতীব অধ্যবসায়বলে মানবশরীরতত্ত্ব, লতা, গুল্মাদি, ওষধি ও ইতর প্রাণীর সহিত মানবদেহের সম্বন্ধপরম্পরা অতি সংক্ষেপে স্বপ্রণীত সংহিতায় নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। নানাবিধ রোগের নিদান, চিকিৎসা ও রোগহেতু নির্ণয় করিয়া মানবজাতির পরম বান্ধবের কার্য্য করিয়াছেন। আজ কাল ধন্বন্তরিসংহিতা এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিনা সন্দেহস্থল; প্রস্তাবলেখক যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছেন তাহাতে তিনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। যদিও কেহ কিয়ৎপরিমাণে প্রচলিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু সেই সকল খণ্ডিত অংশ একত্র করিলেও মূলগ্রন্থের ছায়ামাত্রও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সুতরাং আদিসংহিতা সম্প্রতি যে একেবারে অপ্রাপ্য না হইলেও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।

কতকাল হইল ধন্বন্তরিসংহিতা দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা স্থিরসিদ্ধান্ত করা সুকঠিন। আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক গ্রন্থের ব্যাখ্যানকালে কোন কোন অংশতন্ত্র ধন্বন্তরিসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন বলিয়া আমরা এতদ্বিষয়ের কথঞ্চিৎ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম।

বল্লালসেনসংস্থাপিত আটজন অম্বষ্ঠকুলতিলকেরই একতমের অধস্তন সন্তান পণ্ডিতবর শিবদাস মহামতি চক্রপাণিদত্তকৃতসংগ্রহের টীকা ও ব্যাখ্যানকালে ধন্বন্তরিসংহিতার অনেক শ্লোক গ্রহণ করিয়া প্রমাণ ও মতান্তর সমর্থন করিয়াছেন। বিনায়ক সেন বল্লাল সংস্থাপিত বৈদ্যরত্নের একতম ব্যক্তি। * নিম্নলিখিত বংশপরম্পরায় দৃষ্ট হয় যে শিবদাস বিনায়ক হইতে দশম পুরুষ।



* দুহির্বিনায়কশ্চায়ুঃ কায়ুঃ পাস্থ স্ত্রি পুরকঃ।
শিরালো গরিরিহাস্তৌ রাঢ়েবঙ্গে প্রতিষ্ঠিতাঃ। কবিকণ্ঠহার।

ইহাদের প্রত্যেক পুরুষের স্থিতিকাল গড়ে ৩০বৎসর ধরিলে বিনায়ক হইতে শিবদাস পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসর গত হইয়াছিল। বল্লাল সেন ও খৃঃ১১শ শতাব্দির প্রারম্ভে বর্ত্তমান থাকার সম্ভব। এই গণনানুসারে শিবদাস খৃঃ১৪শ শতাব্দির লোক বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং ধন্বন্তরিসংহিতা অন্যূন ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ শিবদাস-কৃত টীকাতে বহুল পরিমাণে ধন্বন্তরির ধ্বনি থাকাতে এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গত নহে যে উক্ত সংহিতা তৎকালে সাধারণের মধ্যে বিশেষ মান্য ছিল। এবংবিধ গ্রন্থের বিরলপ্রচার হইতে ও অন্ততঃ শতবৎসর কাল গত হওবার সম্ভব। সুতরাং যখন পাঠানকরতলস্থ বঙ্গদেশ মোগলদের আক্রমণে উপর্য্যুপরি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, যে সময়ে বঙ্গবাসী এক দিকে স্বদেশীয় পাঠান কর্ত্তৃক উপদ্রুত, অপরদিকে দিল্লীর সম্রাটদিগের প্রেরিত সেনা দ্বারা ভূয়োভূয়ঃ লুণ্ঠিত, সেই অরাজকের সময়ই অল্পে২ আয়ুর্ব্বেদের এই প্রাচীন গ্রন্থও অপরাপর শাস্ত্রের সঙ্গে২ বিলুপ্ত হইতে থাকে।

ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্যও গালবঔরষে জন্মগ্রহণ করিয়া শৈশবকাল হইতেই কঠোর তপশ্চর্য্যাতে ও আয়ুর্ব্বেদানুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েন; বিশেষতঃ তাহার জন্মবৈচিত্র ও আয়ুর্ব্বেদীয় অসামান্য প্রতিভা তাহাকে সহজেই মৌনব্রতে প্রণোদিত করিয়াছিল। গৃহী হইয়াও তিনি সংসারে নিতান্ত বীতস্পৃহ ছিলেন। তাহার এইরূপ সহজ বৈরাগ্য অপনয়নমানসে ব্রহ্মার অনুরোধে ভরদ্বাজ গালব প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিবর্গ তাঁহাকে কাশীরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু যাহার জীবন মানবজাতির মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তিনি রোগসন্তপ্ত মনুষ্যের নিদারুণ যন্ত্রণায় মর্ম্মবেদনা অনুভব করিতেন, তাহার জীবন কার্য্যান্তরে ব্যয়িত হইবার নহে। তিনি নামে মাত্র কাশীপতি রহিলেন, তাহার সমস্ত সময় আয়ুর্ব্বেদ অনুশীলনেই পর্য্যবসিত হইত। কাশীর আশ্রমে বসিয়া তিনি বহু শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিতে লাগিলেন। সমাগত শিষ্যমণ্ডলীকে তিনি শরীরবিজ্ঞানে বক্তৃতাদ্বারা উপদেশ দিতেন। শিষ্যগণ যথোচিত যত্নসহকারে তদুপদেশ সংক্ষেপে নিবদ্ধ করিয়া স্মরণসৌকর্য্যার্থে এক এক খানা সংহিতার প্রণয়ন করেন। বারাণসীর আশ্রমে তিনি ১০০ শিষ্যকে উপনীত করেন। তিনিই প্রথমতঃ মানবশরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া শরীরস্থানের ব্যাখ্যা করেন ও শিষ্যদিগকে তদর্থে যত্নবান্ হইতে আদেশ করেন। (১)

(১) তস্মাৎ নিঃসংশয়ংজ্ঞানংহর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতংদেহং দ্রষ্টব্যোঽঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতোহিযদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চযদ্ভবেৎ।
সমাসত স্তদুভয়ং ভূয়োজ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥

তিনি প্রকৃষ্ট যুক্তিসহকারে শল্য তন্ত্রের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা ও অপরাপর অঙ্গের অপেক্ষা ইহার প্রাধান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। * যাহা হউক, যে মহাত্মার সংহিতায় আমরা এক্ষণ ধন্বন্তরির উপদেশ পাঠ করি, তাহার বৃত্তিবিবরণকালেই আমরা অমৃতাচার্য্যের অন্যান্য উপদেশ সংক্ষেপে বিবৃত করিব। সম্প্রতি আদি বৈদ্যের সময়সম্পর্কে কএকটি কথা বলিয়া এই অংশের উপসংহার করিতে চাই।

ধন্বন্তরি কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার নিরাকরণ করা বড় সুকঠিন। প্রাচীন সংস্কৃতের যত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তন্মধ্যে বেদসংহিতার পরই মনুর প্রাচীনত্ব ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, মনু খৃঃ জন্মের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও তিনি ধন্বন্তরির নামোল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনি অম্বষ্ঠের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক, পরে দৃষ্ট হইবে যে, ধন্বন্তরি কোন শরীরীমনুষ্যের নাম নহে, পুরাণকর্ত্তারা কল্পিতস্বর্গবৈদ্যের ধন্বন্তরি-উপাধিই অম্বষ্ঠকে প্রদান করেন। সুতরাং আদিবৈদ্য মনুরও পূর্ব্ববর্ত্তী। মনু [illegible] বংশের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেই [illegible] সম্ভবতঃ ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। অন্যথা ব্যবহারশাস্ত্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার নামোল্লেখ করিতেন না। একটি লোকের বংশপরম্পরা যেপরিমাণে অধিকসংখ্যক হইলে তাহা সমাজের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, সেপরিমাণ হইতে অন্যূন ২০০। ৩০০ বৎসর গত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং অম্বষ্ঠবংশের আদি পুরুষ অন্ততঃ খৃঃ জন্মের ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধন্বন্তরির এই সময় আমরা ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতানুসরণ করিয়া নির্ব্বাচন করিলাম। কিন্তু এল্‌ফিন্‌ষ্টোন প্রভৃতি যে যুক্তিমার্গে গমন করিয়া মনুর সময় নির্ব্বাচন করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়। তিনি স্বয়ংই বলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন খৃঃ জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। পরাশর তাহার পিতা; সুতরাং তিনিও অবশ্য ঐ কালের পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং যে মনুর প্রাধান্য, প-

তস্মাচ্ছমস্তগাত্রমবিষোপহত মদীর্ঘব্যাধিপীড়িতমবর্দ্ধ শতিকং নিঃসৃষ্ট মূত্রপুরীষপুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধংপঞ্জরস্থং মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গম প্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যক্ প্রকুথিতশ্চোদ্ধৃত্য ততোদেহং সপ্তরাত্রাদুশীর বালবেণুবল্কলকূর্চানামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবধর্ষয়ং ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব লক্ষয়ন চক্ষুষা।

* শল্যাঙ্গমঙ্গেরপরৈ রুপেতং প্রাপ্তোঽধুনা শাংতুয় ইহোপদেষ্টুম্ সর্ব্বেষু আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রেষু এতদেবাধিকমভিমতং যন্ত্রশস্ত্রক্ষারাগ্নিপ্রণিধানাৎ আশু ক্রিয়াকরণাৎ সর্ব্বতন্ত্র সামান্যাচ্চ। সৌশ্রুতে।

রাশর,যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই মনু যে কেমন করিয়া ৯০০ খৃঃ পূঃ আবির্ভূত হইবেন,তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সুতরাং বেদের সংগ্রহকাল হইতে গণনা করিলে অথর্ব্বের কাল ১৪০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে আসিয়া পড়ে।

এস্থলে এলফিনস্টোন ও মার্শমেন প্রভৃতি ভারতইতিহাসলেখকদের বেদের সংগ্রহকাল নির্ব্বাচনসম্পর্কেও দুই একটি কথা না বলিয়া পারিলাম না। বড় লোকের ভুল অনুসন্ধান আমাদের ধৃষ্টতা; পাঠক মাপ করিবেন।

ইঁহারা বলেন যে ' প্রত্যেক বেদেই জ্যোতিষশাস্ত্রের একটি অংশ আছে। ইহাতে Solsticial বিন্দুর যে অবস্থান আছে, খৃঃ জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও তাহাদের ঐ অবস্থান ছিল। * সুতরাং বেদ বিভাগ ঐ সময়ে ঘটিয়াছিল; এই গণনার বল কত, পাঠক একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা অন্ততঃ দুটি স্থাপনার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে, বেদের ঐ গণনা দ্বৈপায়নের সমকালবর্ত্তী কোন ব্যক্তি করিয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ সূর্য্যের কর্কট রাশিতে গমন(Solsticial Point) একাধিক সময়ে ঘটিতে পারে না। অনেকেই জানেন যে ঐ চক্রেরও গতি আছে। সুতরাং খ্রীঃ জন্মের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বে যেস্থানে (Solsticial) বিন্দু ছিল, ঐ চক্রের সম্পূর্ণ একবার আবর্ত্তনে যত সময় লাগে, তৎপূর্ব্বেও তাহাদের সেই অবস্থান ছিল। তিনি কেন যে এরূপ কষ্টকল্পনার বশবর্ত্তী হইলেন,অথচ রাজতরঙ্গিণীর নির্দ্দিষ্ট কুরুপাণ্ডবদের সময় হইতে দ্বৈপায়নের সময় নির্ব্বাচিত করিলেন না,তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বিশেষতঃ রাজতরঙ্গিণীর নির্ব্বাচিত কুরুপাণ্ডবের সময়ের সহিত কালিদাসকৃত জ্যোতির্ব্বিদাভরণ গ্রন্থের সহিত সাদৃশ্য দেখাযায়। তদনুসারে বেদবিভাগ অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ের ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

ধন্বন্তরিসম্পর্কে পুরাণ ও ভাবপ্রকাশের মতদ্বৈধ আছে। ভাবপ্রকাশ একখানা পরবর্ত্তী সংগ্রহ। গ্রন্থকর্ত্তাকে আমরা জানি না, কেহ কেহ বলেন ভাবমিশ্র ইহার প্রণেতা। যাহা হউক, ভাবপ্রকাশ বলেন ধন্বন্তরি বাহুজ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সুশ্রুত প্রভৃতি শত শিষ্যকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেন। তিনি দিবোদাস ও কাশীরাজ নামে খ্যাত। * এমত

---

* But the decisive argument is that the place assigned to the Solsticial points in the treatises is that in which those Points were Situated in the 14th Century before Christ. Elphinstone's History of India Append

* অধীত্যায়ুর্বেদ মিশ্রাদ্ধন্বন্তরিঃ পুরা। আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি। নাম্নাতু সোহভবৎ খ্যাতো

অবস্থায় আমরা কোন্ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। যদি হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিচার করিতে যাই তবে অবিচলিত চিত্তে পুরাণই মানিতে হইবেক, কারণ আদৌ শ্রুতি, তৎপর স্মৃতি, ও তৎপর পুরাণই প্রামাণ্য। যাহা হউক এবংবিধ অনৈক্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া আমরা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হই দেখা যাউক।

বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত আছে কাশীরাজগোত্রে ধন্বন্তরি নামে একজন রাজা ছিলেন। ভাবপ্রকাশকার বোধ হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এবং পুরাণোল্লিখিত ধন্বন্তরির অলৌকিক জন্মবৃত্তান্তে অনাস্থা হওয়াতেই তাদৃশ বিবরণ লিখিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণোক্ত ক্ষত্রিয় ধন্বন্তরিকে বৈদ্যধন্বন্তরি গ্রহণ করিলে কতকগুলি গোলযোগ আসিয়া পড়ে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণানুসারে আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও চরক ঐ ধন্বন্তরির পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি, ক্ষত্রিয়রাজা ধন্বন্তরি হইলে চরক কোন মতেই স্ব-পুনঃসংস্কৃত অগ্নিবেশসংহিতাতে ধন্বন্তরির মতগ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু চরকসংহিতাতে ধন্বন্তরির মত গ্রহণ দৃষ্ট হয়। * বিশেষতঃ যদি বিষ্ণুপুরাণোক্ত বংশাবলী গ্রহণ করা যায়, তাহা ধন্বন্তরির দিবোদাস নাম অসঙ্গত হইয়া উঠে। কাশীরাজের পৌত্র ধন্বন্তরি নামে এক রাজা ছিলেন. বিষ্ণুপুরাণে তাহার নামান্তর দিবোদাস উল্লিখিত নাই। কিন্তু ধন্বন্তরি-প্রপৌত্র দিবোদাস নামে একরাজা ছিলেন। সুতং সুশ্রুতগুরু ধন্বন্তরিকে ক্ষত্রিয় ধন্বন্তরি গ্রহণ করিলে এও আর একটি অসঙ্গতি হইয়া উঠে। কারণ, ইহার কাশীরাজ আখ্যা সঙ্গত হইলেও দিবোদাস নাম সঙ্গত হইয়া উঠে না। অপিচ, যদি আয়ুর্বেত্তা ধন্বন্তরি ক্ষত্রিয়সন্তান হইতেন, তবে সৌশ্রুতায়ুর্ব্বেদে তাঁহাকে নিমিত্তাসুর ভূমিপ বলিয়া কীর্ত্তিত † হইত না। রাজন্য ক্ষত্রিয়ের সহজ ব্যবসায়, বিশেষতঃ কাশীরাজ পৌত্রজাতীয় ব্যবসায় ও ঐতিহাসিকবিদ্ উভয় সূত্রেই রাজা। সুতরাং, এ আর একটি তৃতীয় দোষ আসিয়া পড়ে।

দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ। বালএব বিরক্তোহভূৎচচার সুমহত্তপঃ। যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপম্। * *

বিশ্বামিত্র মুনিস্তেভ্যঃ পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্। তত্রনাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোস্তি বাহুজঃ। সহিধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাংবরঃ। * * * ভাবপ্রকাশঃ।

* সর্ব্বাঙ্গনিবৃত্তি র্যুগপদিতি ধন্বন্তরিস্তু তদুপপন্নং সর্ব্বাঙ্গানাং তুল্যকালানিবর্ত্তিত্বাৎ * *। চরকে।

† সর্ব্বামরগুরুঃ শ্রীমান্ নিমিত্তাসুরভূমিপঃ। শিষ্যানেবাচ নিখিলমিদং বিপ্রদিলক্ষণম্॥ সৌশ্রুতে।

নিশীথ-চিন্তা।

আশার ছলনা।

"আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু,
হায়! তাই ভাবি মনে।"

ঐ তৃষিত মেদিনী যেমন আজি আশানার অবলম্বনে আকাশের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে, এবং আশা ... রিয়া সহস্রগুণে অধিকতর ক্লেশ পাইতেছে। আমার এই মরুময় দগ্ধ হৃদয়ও সেইরূপ আশাপথপানে ঊর্দ্ধ নয়নে চাহিয়া আছে, এবং হায়! আশার আশ্বাসপ্রদ মধুরকণ্ঠে বিশ্বাস করিয়াই জীবনে এত যন্ত্রণা ও এত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে। এ আশা কি মৃগতৃষ্ণিকা?

আশা ছিল জ্ঞানার্ণবে সাঁতার দিয়া সুখী হইব,—জ্ঞানের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দর্শন করিবার জন্য এপ্রাণ মন বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু আমার সে আশা কি আর সফল হইবে? যে জ্ঞানে এতদিন আমার এত অনুরাগ ছিল, সেই জ্ঞানে এইক্ষণ আমার বিরাগ। বুদ্ধি আরও কি জ্ঞানের অনুসরণ করিয়া বিড়ম্বিত হইতে চাহিবে?—জ্ঞান আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর আলোক এক। হে জ্ঞানাভিমানি ধীর! তুমি কি ইহা অস্বীকার করিতে পার? তোমার জ্ঞানে তুমি কি পাইয়াছ?—না নৈরাশ্যের অন্ধতম অবিশ্বাস,—অন্ধকারের শূন্যতা। তুমি এই শূন্যময় অন্ধকারে কোন্ প্রাণে আর কিরূপে নিরালম্ব অবস্থান করিবে?—তোমার ঐ জ্ঞান সমুদ্রের অতলজলে ডুবাইয়া দেও। জ্ঞানী সে, যে অজ্ঞান;—জানে সে,যে জানিতে চাহে না। তুমি জানিতে যাইয়াই, জানিতে পাইলে না। আমিও এই জন্যই আর জানিতে চাহি না। আমার মন বহুদিনের চিন্তাশ্রমে হতাশ ও অবসন্ন হইয়া এইক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, জ্ঞান আর অজ্ঞান সমান কথা, অন্ধকার আর আলোক এক। ঐ যে বায়ু, কখনও মৃদু হিল্লোলে, কখনও ঝঞ্ঝাবেগে, প্রবাহিত হইতেছে, জান আর উহার প্রস্রবণ কোথায়?—এই যে আলোক, চক্ষুর সম্মুখীন হইয়া গতিপথ প্রদর্শন করিতেছে জান উহা কি? কোন্ সময় হইতে কালের আরম্ভ, আর কোথায় গিয়া দেশের শেষ সীমা? সৃষ্টির সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভুলিয়া যাই। কিন্তু সৌন্দর্য্য এমন সুন্দর কেন? এবং চিত্তই বা কেন উহার জন্য লালায়িত

হয় ? জগতে অসংখ্য প্রাণী, অসংখ্য প্রাণ লইয়া, ভোগ্যবস্তুর জন্য চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত রহিয়াছে, এবং ভোগতৃষ্ণার পরিতৃপ্তিতে সুখে উৎফুল্ল, অথবা অভাব-জন্য দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেছে। এই প্রাণ আর সুখ দুঃখ, সমস্তই কি স্বপ্নলীলা নহে ? হায়! এই সকল সামান্যতত্ত্বের অন্ত পাই না; যাহা অসামান্য, তাহা আমি কিরূপে জানিব ?

তবে কি জ্ঞানে সুখ ? শৈশবের সরলা বুদ্ধি একথাই মানিয়া লইত। কিন্তু প্রতারণার পর প্রতারণায়, বিড়ম্বনার পর বিড়ম্বনায়, বুদ্ধির সে সরলমতি বিনষ্ট হইয়াছে। উহা এইক্ষণ আর এ সকল কথায় ভুলিয়া যায় না। জ্ঞানে যদি সুখ তবে সংসারে অসুখ আর কি ? কোন্ জ্ঞানী এই অবনীমণ্ডলে সুখী হইয়াছে ?

যাহার চক্ষু ফোটে নাই, যে সংসারে আজও কিছু দেখে নাই, কিংবা দেখিবার জন্য উৎসুক হয় নাই, সেই দুঃখের হলাহলকে সুখের অমৃতধারা বলিয়া পান করে, কালকূটময়ী ভুজঙ্গীকে চন্দন-লতাভ্রমে কণ্ঠহার করিয়া লয়, বিপদকে সম্পদ বলিয়া আলিঙ্গন দেয়, এবং বারুদ-গৃহে শয়ান হইয়াও সুখে নিদ্রা কি নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাব ! চনীয় শান্তি ! কিন্তু যাহ... ষ্টিতে বঞ্চিত রহিয়াও, ... দেখিতে শিখিয়াছে, আ... না জানিয়াও আলোকে...

নে...

হ। ... প্রধাবিত ... কি যুবা, ... রতম প্রদে... ধ্বনি। আম... নিতে পাই না, ... কেবল আবর্ত্তকোলাহলে। ইহা... আশা করিব যে, জ্ঞানে অ... হবে, এবং সেই আশায় আমি ... হিব ? সুখী আমার ঐ আ... উহার হাতে তোমরা জ্ঞা... তুলিয়া দিও না...

কল্যই অকৃত্রিম শত্রুতাতে পরিণতি পায়, ক্লিওপেট্রা কৈশোরের প্রেমে এণ্টনীকে বলিস্বরূপ উপহার দিয়া আপনার প্রাণ লইয়া আপনি পলায়ন করে এবং অমৃত-জীবের মত পুত্রও পুণ্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া সকলের পূজা পাইয়া থাকে, তুমি কি সেই গৃহবাসের জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত? যেখানে স্বার্থসেবার নাম সংসার-হিতৈষণা, ধর্ম্ম লইয়া বাণিজ্যের নাম ধর্ম্ম-প্রচার, যশঃস্পৃহার কণ্ডূয়নের নাম অধ্যাত্ম-উদ্দীপনা এবং পরপীড়নের নাম পৃথিবীর মঙ্গল-সাধন, তুমি কি অদ্যাপি সেই গৃহবাসের জন্য আকুলিত?

গৃহবাস কি? পার্থিব গৃহবাস প্রায় সকলের পক্ষেই বনবাস! বনে ব্যাঘ্র ভল্লুক; গৃহে হিংসা দ্বেষ। হায়! যখন দেখিয়াছি যে, পুত্রশোকাতুরা জননী, এই-মুহূর্ত্তে পুত্রের জন্য আর্ত্তনাদ করি..া, পর মুহূর্ত্তেই পুত্রের অজ্ঞা সম্পত্তির জন্য প্রতিবেশী কি বিধবা পুত্রবধূর সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্তা হইয়াছে, আমি তখনই বলিয়াছি পৃথিবীর এ গৃহবাসে সুখের আশা বৃথা। যখন দেখিয়াছি যে, ভ্রাতা ভ্রাতার বক্ষে আঘাত করিয়া আ-
অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় দেখিয়াছে,
.-বাসনার তৃপ্তির নিমিত্ত ভ্রাতৃ-
দিন গণনা করিয়াছে এবং প্রা-
। প্রেম-বিহ্বলা ভার্য্যা এ-
ায়া পানেই নববৈধব্যের স-
হইয়াছে, আমি তখনই

মত
প্রথম
প্রমত্ত স্ফু·
গাঙ্গি বার্দ্ধি-
ত হইয়া, আ-
স্বরে যেন 'না
তাশ কাঁদিতেছে। হৃদয়!
াস যে নিরয়নিবাসের পূর্ব্ব-
। কি তুমি এখনও অনুভব ক-
মর্থ হও নাই? যেখানে মনুষ্য
মনুষ্যকে দংশন করে, জলৌ-
ষার শোণিত শোষণ করে,

বারে লাগিয়া রহিয়াছে । অমন প্রীতি-মধুর প্রিয়কণ্ঠ একবার শুনিলে, শীঘ্র কেহ ভুলিতে পারে না । কিন্তু হায় ! সেখানেও আবার কত্তিমা ! আর সেই কত্তিমা কে ? না, প্রচ্ছন্নরূপী গোঁসাইদাস । বস্তুতঃ গ্রন্থকার এক গোঁসাইদাসের কথা ও কাণ্ড লইয়াই গ্রন্থের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত রহিয়াছেন, এবং গোঁসাইদাসকে ভাবিতে ভাবিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া ক্লাইবের ছবি চিত্র করিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন । যেমন কৃষ্ণকথাশূন্য শিশুপালবধ, তেমনই ক্লাইবের কথাশূন্য সেরাজবধ । ক্লাইবের চিত্র সুচারুরূপে ফলিত না হইবায় গ্রন্থের এক অংশই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে । এইরূপ অপূর্ণতা ও দোষ আরও অনেক আছে ।

কিন্তু অপূর্ণতা ও দোষ সত্ত্বেও এই নাটকখানি প্রশংসাযোগ্য,—রচনা শব্দাড়ম্বরশূন্য অথচ মধুর, বর্ণনা মনোহারিণী, এবং প্রায় সমস্ত অংশই ভাবুকতার পরিচায়ক । শব্দবিন্যাসে অনেক স্থলে ভ্রমপ্রমাদ আছে । যথা ;—"সে আপনাকে সমুহ মান্য করে"—"বাঙ্গালির সুহাঙ্গণ" ইত্যাদি, ইত্যাদি । কিন্তু গুণের ভাগ অধিক হইলে এ সমস্ত সামান্য দোষ প্রায়শঃ গণনায় আইসে না । পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালায় ভাল নাটক নাই ; যে সকল নাটক একদিনে কল্পিত, দুই দিনে লিখিত এবং তিন দিনে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া সমালোচনার জন্য সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে, যদি সে গুলি অন্ততঃ এই শ্রেণীর নাটক হইত, তাহা হইলে আমাদিগের ক্লেশের ভার বিস্তর লঘু হইয়া পড়িত । আমরা গ্রন্থগুলি পড়িতে পারিতাম, পড়িলে সমালোচনা করিতেও সক্ষম হইতাম । যে সকল গ্রন্থ পড়িয়া উঠাই এক বিষম যন্ত্রণা, তাহার সমালোচনা করা কিরূপ ব্যাপার তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন । সমালোচ্য নাটকখানি সম্বন্ধে এ কথা আমরা পুনরপি বলা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিতেছি যে, নাটকাংশে ইহার যাহাই দোষ গুণ থাকুক, ইহা একখানি সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য গ্রন্থ ।

৮ । "ব্যবস্থা বিজ্ঞান । প্রথমভাগ । শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসাখ, বিএ বিএল প্রণীত ।"—এই পুস্তক ... আকারে অতি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে ইতিহাস ও মূলসূত্রস... নগর্ভ কথা আ... রেজী গ্রন্থ... তাঁহারা ই... যাঁহারা ... করিতে... পুস্তক ... বার প...

৯

সচিত্র ... প্রণীত ... স্বন্ধে ... আমাদি...

র্থাৎ যাঁহারা ইংরেজীতে হোমিওপেথিক কোন পুস্তক পড়েন নাই, এখানিতে তাঁহাদিগের বিস্তর উপকার দর্শিবে, এবং একটি ঔষধের বাক্স ঘরে থাকিলে গৃহস্থের পক্ষেও এই গ্রন্থ উপকারে আসিবে। আমরা বসন্ত বাবুর অধ্যবসায়কে ধন্যবাদ দি। হোমিওপেথিতে যদি কিছু সত্য থাকে, তবে তাহা বঙ্গদেশে প্রচার করা কর্ত্তব্য, এবং এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ সেই প্রচারের অন্যতম পথ।

বিবিধ।

আলস্যের পোষকতা।

যে অলস, সে সমাজের গলগ্রহ। তবে তাহার পোষকতা কর কেন? যে অলস, সে পাপের প্রিয়নিকেতন,—পৃথিবীর ভয়দন্ত, দুষ্কৃতির মূর্ত্তিমান্ অবতার, পথের কণ্টক, উন্নতির অন্তরায় এবং অনন্ত দোষ… …াম্মূল। তবে তাহাকে প্রশ্রয় …ন অকার্য্যই তাহার এক …হার কার্য্যে আবার

…লস নহে।
…র কার্য্য
…চ রক্ষা
…র ব্যা-
…
…বারিধি
…ই সমস্ত
…কোন
…কিলে
…ন না।

পশু পক্ষীও অলস নহে। কবির প্রিয় এবং কাব্যের চির আদরের ধন মধুকর যেমন ফুলে ফুলে বিচরণ করিয়া ফুলের মধু সঞ্চয়ন করে, প্রাণিজগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত জীবই সেইরূপ আত্মদেহ রক্ষার নিমিত্ত অহোরাত্র নানাবিধ চেষ্টায় রহে। কেহই বসিয়া থাকে না। কেহই বসিয়া বসিয়া, কথা মাত্র কহিয়া, আপনার ও পরের সময় ধ্বংস করিবার জন্য সমুদ্রের ঢেউ গণে না। তাহাদিগের নাম ব্যাঘ্র হউক, আর ভল্লুক হউক, বৃথা কেন তাহাদিগকে অপবাদ দিবে?

জগতে আলস্যের অপবাদ যদি কাহাতেও প্রযুজ্য হইতে পারে, তবে তাহা … কেবল এক অকৃতী ও অক্রিয়ান্বিত মনুষ্যে। জানি না সমাজ কেন ইহাদিগের ভার বহন করেন।

বঙ্গদেশ ছয়কোটি লোকের বাসভূমি। এই ছয়কোটির মধ্যে অন্ততঃ দুই কোটি লোক আলস্য মাত্র ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালির রক্তশোষণ করি-

ভেছে। বৃটিশশাসনাধীন ভারতবর্ষে ন্যূন কল্পে আটকোটি লোক আলস্যে ডুবিয়া, মনুষ্যগণনার বাহিরে গিয়াছে। যদি ই-হারা প্রত্যেকে আপনার আহার্য্যসমেত দশটি টাকা উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে বাঙ্গালার সাধারণসম্পত্তিতে বৎসরে বিশ কোটি, এবং ভারতবর্ষের সম্পত্তিতে বৎ-সরে আশী কোটি টাকা সমাগত হয়। যাঁহারা এদেশের দারিদ্রদুঃখ, অন্নক্লেশ এবং দুর্ভিক্ষের হাহাকারে আকুল হইয়া স্বজাতির জন্য অশ্রুপাত করিতেছেন, তাঁহারা কি এই গণনার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন?—যাঁহারা ভারতের উদ্ধার সাধ-নের জন্য নবরসের নাটক লিখেন, অথবা কবিতার কোমলকুসুমে মালা গাঁথিয়া ভারতবাসীকে বীর-বেশে বিভূষিত করেন, তাঁহারা কি এই সামান্য কথাটিকে ক্ষণ-কালের জন্যও মনে আনেন?—ভারতের অকর্ম্মা আট কোটি যদি আশী কোটি টাকা বৎসরে ঘরে আনে, তাহা হইলে বোধ হয়, বিনা নাটক, বিনা নবন্যাস, এবং বিনা কবিতার রসের উচ্ছ্বাসেও ভারতভূমি উদ্ধার পাইয়া যায়,—এবং ভা-রতভূমি উদ্ধার না পাউক, অন্ততঃ ভারত-বাসী উদরে অন্ন এবং অঙ্গে বস্ত্র দিয়া পৃথিবীতে দাঁড়াইবার স্থান পায়। ভারতে কেহই কি যোগতত্ত্ব ছাড়িয়া বিয়োগতত্ত্বের এসকল কথা লইয়া আলোচনা ক-রিবে না?

যে ভারতভূমি রত্নেরখনি এবং কুবে-রের ভাণ্ডার বলিয়া ইউরোপে পরিচিত ছিল, এবার সেই ভারতভূমি বিলাতীয় বিজ্ঞলোক ও বণিক্‌দিগের নিকট অন্নের কাঙ্গালিনী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। আমরা যদি আলস্যকেই আমাদিগের পুষ্প-শয্যা জ্ঞান করি,—অলস ও অকর্ম্মণ্য বলিয়া পরিচিত হইতে লজ্জায় ম্রিয়মাণ না হই, এবং দেশের সমস্ত ব্যক্তিকে সমাজের সুদৃঢ় শাসনে বাধ্য করিয়া, কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইয়া না দি, তাহা হইলে বোধ হয় ঐ পুষ্পশয্যাই অচিরে আমাদিগের শব-শয্যা হইবে। ভারতবাসী, সাবধান!

পিপিলিকা রাজ্য।

স্যার জে লাবক নামে একজন প-ণ্ডিত তাঁহার জীবতত্ত্ব নামক গ্রন্থে লি-খিয়াছেন যে, পিপিলিকাগণের অবস্থা এবং সামাজিক ব্যবহারের প্রতি অভি-নিবেশপূর্ব্বক অনুধ্যান করিলে বোধ হয়, উহারা কোন অংশে সভ্যতার অভিমানী মানবসন্তানগণ হইতে নিকৃষ্ট নহে। পি-পিলিকার ক্ষুদ্র সংসার স্নেহ দয়া, আশ্রয়-দান, শুশ্রূষা প্রভৃতি সদ্গুণের আধার। উহারা একে অন্যকে সাহায্য করে, পীড়া হইলে আহার বিধান করে, এবং পৃষ্ঠে ক-রিয়া লইয়া বেড়ায়। লক্ষাধিক পিপি-লিকায় এক একটি উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বাস করে, উহারা পরস্পর সকল-কেই চিনিতে পারে। অথচ মুহূর্ত্তের জন্য বিবাদ করে না। শিশুগণ এবং রোগী ও

বৃদ্ধগণ গৃহে থাকে, যাহারা বলবান তাহারা আহারান্বেষণ করিয়া আনে। যদি দূর হইতে অপর একটি বাসার পিপিলিকাকে আর এক নূতন পিপিলিকার দলে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে, উহারা ঐ বিদেশীকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে এবং আপন করিয়া লয়। এক বাসা হইতে একটি পিপিলিকাডিম্ব, আর এক বাসায় রাখিলে, ঐ বাসার পিপিলিকা আপন ডিম্বের ন্যায় নিস্বার্থ স্নেহ ও যত্নের সহিত প্রাণ পণে উহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। লাবক সাহেব বলেন; তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, পিপিলিকাগণ পাঁচ বৎসর অপেক্ষাও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে। তিনি একাদশটি পিপিলিকা ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত পালন করিয়া ছিলেন, তন্মধ্যে নবটির মৃত্যু হইয়াছিল, দুইটি জীবিতছিল, কিন্তু তাহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, পরে তাহাদিগকে তিনি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

উদ্ভট।

যত দুখ আছে বিধি
দাও তাহা সহিব,
মরমে পুড়িব তবু
মুখে নাহি কহিব ;—
অরসিকে রসালাপ,
এযে এক যাতনা,
ললাটে লিখ'না মোর
ললাটেতে লিখ'না।

বনের বিহঙ্গ আমি
বনে বনে উড়িব,
বন-বিটপীতে বসি
প্রিয়-নাম গাইব ;—
বনফুল, বনফল
বন্য এই পরিমল,
ইহাই সম্পদ মম,
ইহা লয়ে রহিব ;—
প্রিয়-বিচ্ছেদের দুঃখ
বনবাসে ভুলিব।

হায়! কেন না হইনু
মেঘের মতন,
পরার্থে ঢালিয়া দিতে
নিজের জীবন।
দামিনী দুলিত অঙ্গে
থাকিতাম সুখ সঙ্গে
খেলিতাম রঙ্গে লয়ে
মত্ত প্রভঞ্জন।
ভুষিতে পরের প্রাণ,
করিতাম প্রাণ দান,
বজ্রাঘাতে নিজ দেহ
করি বিদারণ।

লজ্জাবতীলতা।

লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ কর, নবীন নব বধূর ন্যায় লাজে উহা ম্রিয়মাণা হইবে।

এই জন্যই কবিগণ ইহার নাম লজ্জাবতী-গণের উপমার স্থলে ব্যবহার করেন যথা, "কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা, মৃতপ্রায় পর-পরশনে"—যাহা হউক বধূগণের লজ্জার কারণ আছে, তাই-বলিয়া বনের লতা লজ্জায় মাথা লুকাইবে কেন? ছেনফ্রে এবং মাস্টারস প্রভৃতি উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞেরা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, লজ্জাবতীর পত্র-দণ্ডের অভ্যন্তরে ছিদ্র আছে, ঐ সকল ছিদ্রের মধ্যে প্রতি পত্রের নিম্নদেশে কুশের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এক একটি অতি মৃদুপ্রাণ স্প্রিঙ্ আছে, অতএব উক্ত লতাকে স্পর্শ করিলেই ঐ স্প্রিঙ কুঞ্চিত হইয়া যায়, সুতরাং উহার পত্র নিচয় টলিয়া পড়ে॥

শিক্ষিত শুক পাখী।

সুপ্রসিদ্ধ জুলিয়স্ সিজরের আনন্দ বিধানার্থ কয়েক জন রোমক, তাঁহাকে শিক্ষিত শুক পক্ষী উপঢৌকন দিয়াছিলেন। পাখিগণ সিজরকে দেখিলেই "মহাবীর সিজর তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ কর" এইরূপ বলিত।—সিজর সন্তুষ্ট হইয়া এক একটি পাখীর জন্য এক এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেন। ইহা দেখিয়া আর এক ব্যক্তি একটি শিক্ষিত শুক পক্ষী উক্ত মহাত্মাকে উপহার দান করেন, কিন্তু জুলিয়স্ তাহা গ্রহণ করিলেন না। ইহাতে ঐ ব্যক্তি দুঃখিত হইয়া পক্ষীটিকে ছাড়িয়া দিলেন, এবং ছাড়িয়া দিবার সময় এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন, যে, "হায়, দুঃখী দেখিয়া সিজর আমায় উপেক্ষা করিলেন!"—এই ঘটনার দুইদিন পরে সিজর একদিন তাঁহার বিলাসকাননে বেড়াইতে যান, যেই প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে, "হায়, দুঃখী দেখিয়া সিজর আমায় উপেক্ষা করিলেন!" তিনি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া দেখেন, নিকটে তরুশাখায় বসিয়া একটি ক্ষুদ্র শুক-শিশু মধুর স্বরে অনবরতঃ ঐ কথা বলিতেছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া শুক-শিক্ষককে ডাকিয়া দুই সহস্র টাকা পুরস্কার দান করিলেন। তৃতীয় (লুই) নিপলিয়নের উদ্যান সমূহেও এইরূপ অনেক শিক্ষিত পক্ষী ছিল। ইহারা ফরাসী বিজয়-গীতি পর্য্যন্ত গান করিয়া সকলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিত। আমাদিগের দেশে পাখিগণকে রাধাকৃষ্ণ নাম শিক্ষা দেওয়া হয়।

স্বদেশ বৎসল কপোত।

গত ফ্রাঙ্ক প্রুশিয়ান যুদ্ধের সময় জর্ম্মাণগণ প্যারে নগর অবরোধ করিলে, সূক্ষ্মবুদ্ধি ফরাসীরা, শিক্ষিত কপোত দ্বারা, নগরের বাহিরে আত্মীয়গণের নিকট সংবাদ পাঠাইতেন। জর্ম্মাণগণ, শিক্ষিত বাজ পক্ষী দ্বারা ঐ সকল কপোতগণকে ধৃত করিয়া, বিপক্ষের গুপ্ত সংবাদ পাঠ করিতেন।—এই সময়ে একটি

কপোত যেরূপ অসাধারণ প্রভুভক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা মনে করিলে মানবগণকেও ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। একদা একটি কপোত দুর্গ হইতে এক খানী পত্র * মুখে করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল, ইতিমধ্যে বিপক্ষের বাজপক্ষী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। কপোত বিপক্ষের হস্তগত হইলে,তাহারা উহার চঞ্চু হইতে পত্র লইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কপোত তাহা দিল না। অবশেষে সে যখন দেখিল, ঠোটে করিয়া দীর্ঘকাল উহা রাখা অসম্ভব এবং বিপক্ষে উহা লইবে, তখন বুদ্ধিমান্ কপোত উহা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। জর্ম্মাণেরা কপোতের কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিল। ফরাসী নগরে একটি রমণী একটি কবিতা লিখিয়া এই স্বদেশবৎসল মহাত্মা কপোতবরকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলে নরাধম ব্যক্তিরও দেশানুরাগ হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়। যে কুলাঙ্গারগণের দেশের জন্য মায়া মমতা নাই, তাহারা এই সাধু কপোতের নিকট নীতি শিক্ষা করুক।

---

* চারি বর্গইঞ্চি পরিমিত অতি সূক্ষ্ম কাগজে প্রায় ২০০০ হাজার শব্দ থাকিত, এবং তাহা কেবল যন্ত্রের সাহায্যে পাঠ করা যাইত।

বিনাফুলে ফল।

আমাদিগের দেশে একটি প্রহেলিকা প্রচলিত আছে,—তাহার তাৎপর্য্য এই "বিনাফুলে ফল ধরে, কোন্ কোন্ বৃক্ষে?" এই প্রহেলিকা যাঁহাকেই হউক না কেন জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি মীমাংসা করিয়া দিবেন যে—'ডুমুর প্রভৃতি।' ফলতঃ এ সিদ্ধান্ত ভুল, এবং এ প্রহেলিকাগত প্রশ্নটিও বিষম ভ্রমাত্মক। ডুমুর প্রভৃতি বাস্তব ফল নহে উহারা ফুল,। এই জাতীয় ফুল হইবার উপক্রম হইতেই ইহাদিগের বোটার ত্বক এবং মাংস এত পুষ্ট এবং বৃদ্ধি হইয়া থাকে যে,উহাতে ফুলকে একবারে গ্রাস করিয়া ফেলে। এই সকল ফলাকৃতি ফুল দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া দেখিলেই ফল কি ফুল ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। ডুমুর প্রভৃতিকে কর্ত্তন করিলে উহাদের অভ্যন্তর প্রদেশে পরাগকেশর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বুদ্ধিমান্ দরিদ্র।

এক দরিদ্র ব্যক্তির কোনও প্রকারেই দিনপাত হইত না। তিনি একদা কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট একঘণ্টাকালের জন্য একখানি উৎকৃষ্টশাল এবং তদনুরূপ অন্যান্য বস্ত্রাদি চাহিলেন, তাহাতে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ইহা একঘণ্টা কালের জন্য পরিধান করিয়া কি উপকার পাইবে?—দরিদ্র ব্যক্তি বলিলেন, গরিব অবস্থা দেখিলে সকলেই ঘৃণা

করে। অতএব বড় মানুষ সাজিয়া গেলে ধনিগণ আহ্লাদসহকারে আমার উপকার করিতে যত্নশীল হইবেন, সংসারের এই রীতি।

আশ্চর্য্য-যান।

এক ব্যক্তি আর এক বিদেশী ব্যক্তির সহিত কোন দূরস্থানে যাইতেছেন, যাইতে যাইতে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল মহাশয়, কার্ত্তিক, গণেশ, নারায়ণ প্রভৃতি, পাখী এবং ক্ষুদ্র জন্তুর পৃষ্ঠারোহণ পূর্ব্বক কিরূপে বেড়াইতেন? বিদেশী বলিলেন, তাঁহারা ত দেবতা ছিলেন, ইচ্ছা করিলে যানব্যতীত শূন্যেও যাইতে পারিতেন। আমাদিগের দেশের রাজারা গাধায় চাপিয়া বেড়ান। তৎপর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কেন, তাঁহাদের কি হয়, হস্তী প্রভৃতি কিছুই নাই। বিদেশী ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন, পূর্ব্বে ছিল, রাজা হইয়া অবধি আর নাই। তাঁহার সঙ্গী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? বিদেশী ব্যক্তি বলিলেন, "আরে এখন যে তাঁহারা আহার কমাইয়াছেন—সুতরাং শরীরও কমিয়াছে, এখন গাধাই অনায়াসে তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠে বহন করিতে পারে।" তাঁহার বন্ধু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আহার কমানই বা কেন? বিদেশী বলিলেন, শুনিয়াছি আহার কমাইলে নাকি সূক্ষ্মবুদ্ধি হয়।

চতুরঙ্গ।

এতদ্দেশে ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে বিশেষতঃ পল্লিগ্রামস্থ জমীদার বর্গের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু চতুরঙ্গ খেলায় অভ্যস্ত আছেন। আজি কালি এমন কোন সভ্যদেশ নাই যেখানে চতুরঙ্গ খেলা একবারে অজ্ঞাত অথবা অনাদৃত। আমাদের দেশে কিংবদন্তী আছে যে, রাবণ স্বর্গ বিজয়ের পর যখন সংগ্রাম করিতে আর প্রতিদ্বন্দ্বী খুজিয়া পাইলেন না, তখন এই অবসর সময়ের অলসতা পরিহার এবং সমরলিপ্সু চিত্তের অসহ্য কণ্ডুয়ন নিবারণ করিবার জন্য তিনি এই অপূর্ব্ব চতুরঙ্গ খেলার সৃষ্টি করেন। গ্রীকদিগের মধ্যেও এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, লিডো এবং টার্কিনো নামক বীর-ভ্রাতৃদ্বয় দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া তজ্জনিত দারুণ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবার জন্য এই খেলার উদ্ভাবন করিয়াছিল। কিন্তু ইহা অবিসংবাদিত যে, হিন্দুরাই এই খেলার প্রথম পথ-প্রদর্শক। সর উইলিয়ম জোন্‌স্‌ তাঁহার গভীর গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, চতুরঙ্গ খেলা হিন্দুদিগের দ্বারা প্রথম উদ্ভাবিত হইয়া ভারত বিজয়ের পর আফগানজাতি কর্তৃক তাহাদের দেশে নীত হয়, এবং সেইখান হইতেই মুসলমানজাতিরা শিক্ষা করিয়া সমস্ত ইউরোপে ইহা বিস্তৃত করে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চারি অঙ্গে বি-

তুরঙ্গ বলিয়া এই খেলার নাম চতুরঙ্গ, আফগানগণ এই শব্দটির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার নাম সেৎরঞ্জ রাখিয়াছেন। পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন হইয়া অবশেষে এই শব্দ হইতে ইংলণ্ডীয় Check এবং Exchequer শব্দ বহির্গত হইয়াছে।

আমাদের দেশে তাস পাশা প্রভৃতি যে সকল বৈঠকী খেলা প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে চতুরঙ্গ খেলাই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধি-সাপেক্ষ। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজ পুরুষেরা ইহাতে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি অনেকের এই খেলায় সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত, তথাপি তাঁহারা ভ্রুক্ষেপও করিতেন না। মহাভারতে পাণ্ডবগণের রাজ্য নির্ব্বাসন, বিরাট সভায় যুধিষ্ঠিরের অক্ষাঘাতে রক্তপাত প্রভৃতি পাশক্রীড়ার অনেক গর্হিত দৃষ্টান্তের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই চতুরঙ্গ খেলাসম্বন্ধে পুরাণাদিতে কোন বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়না। কিন্তু ইউরোপে এই খেলায় রাজ্যবিপ্লব পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। টাইমুরলেন যখন তুরুষ্ক আক্রমণ করেন, তখন তুরুষ্কেরসম্রাট বাজেজাত এই খেলায় এইরূপ মত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশ বিলুণ্ঠিত হইল, তথাপি তিনি নিজের অথবা প্রজাপুঞ্জের রক্ষার্থ কোন চেষ্টাবলম্বন করিতে পারিলেন না। স্পেন যখন মুরদিগের অধিকৃত ছিল, তখন উক্তবংশীয় কোন রাজপুরুষ অনেক হত্যাকাণ্ডের পর সিংহাসন অধিকার করিয়াও দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে উহা তাঁহার বংশধরের উপভোগ্য হইবে না। তখন তিনি তাহারও বধসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তদর্থ এক দূত প্রেরণ করেন। এই সময়ে তিনি কোন বন্ধুর সহিত চতুরঙ্গ খেলায় প্রবৃত্ত ছিলেন। দূত যাইয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, তৎক্ষণাৎ এই আদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। তিনি অনেক মিনতি করিয়া আরব্ধ খেলার পরিসমাপ্তির কালটুকু পর্য্যন্ত বাঁচিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। খেলার অবসান হইলে যখন তাঁহাকে বধ্যভূমিতে নেওয়ার উপক্রম হইতেছিল, তখন আর এক দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি প্রজাপুঞ্জের সম্মতি অনুসারে সিংহাসনপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

বঙ্গভাষার উচ্চারণের অভিধান।

মনে বড় সাধ মাতৃভাষার সেবা করি। কিন্তু একে শক্তি অল্প, তাহাতে আবার অবকাশ কম। আজ একটু অবসর সৃষ্টি করিয়া দুটা কথা লিখিতে সংকল্প করিলাম। সম্মুখে অনতিদূরে একখানি ইংরেজী ভাষার উচ্চারণের অভিধান পড়িয়া আছে। ভাবিলাম, বঙ্গভাষায় কি কোন দিন উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন হইবে?

উচ্চারণের অভিধান বর্ণমালার অভাবের উপরেই সংস্থাপিত। যে ভাষার বর্ণমালা পূর্ণাবয়বা সে ভাষার উচ্চারণের অভিধান প্রয়োজনীয় নহে। বঙ্গভাষার বর্ণমালার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বঙ্গভাষা রাণীর কন্যা; স্ত্রীধনে সম্পৎশালিনী ও গৌরবান্বিতা। দেখিলাম বর্ণমালা সমগ্রই জননী সংস্কৃত হইতে পাইয়াছেন। অতি সুন্দর বর্ণমালা, বৈজ্ঞানিকসূত্রে শ্রেণীবদ্ধ। ক্রমনির্ণয়ে কত না পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্যঞ্জনে প্রথমেই উচ্চারণে বায়ুর প্রাধান্য অপ্রাধান্য লইয়া বর্ণবিভাগ। সর্ব্বাগ্রে স্পর্শ বর্ণ, পরে অন্তঃস্থ বর্ণ, ও শেষে উষ্মবর্ণ। স্পর্শবর্ণে জিহ্বাস্পর্শে বায়ু রুদ্ধ ও উচ্চারণ স্থগিত হয়। অন্তঃস্থবর্ণে বায়ু রুদ্ধ বা উচ্চারণ স্থগিত না হইয়া অপ্রতিহতভাবে বাহির হইয়া যায়। এবং উষ্মবর্ণে বায়ু অর্দ্ধরুদ্ধ হইয়া শিষ দেওয়ার ন্যায় বহিয়া যায়। স্পর্শবর্ণ পর্য্যালোচনা করিলাম, দেখিলাম উচ্চারণ স্থানভেদে কেমন বর্গে বর্গে বিভক্ত রহিয়াছে। অন্তর্দ্দেশ হইতে ক্রমশঃ বহির্দ্দেশে আসিলে প্রথমেই কণ্ঠ, পরে ক্রমশঃ তালু, মূর্দ্ধা ও দন্ত, ও শেষে ওষ্ঠ। বর্ণমালারও প্রথমে কণ্ঠ্য কবর্গ, পরে তালব্য চবর্গ, মূর্দ্ধন্য টবর্গ, দন্ত্য তবর্গ ও শেষে ওষ্ঠ্য পবর্গ। সর্ব্বশেষে একটি বর্গের আলোচনা করিলাম। দেখি প্রথমে তীক্ষ্ণ ক খ, পরে স্থূল গ ঘ, ও শেষে নাসিক ঙ। ক, খ এবং গ, ঘর মধ্যেও প্রথম কোমল ক ও গ, ও পরে কর্কশ খ ও ঘ।

স্বরবর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখি প্রথমে কণ্ঠ্য অ আ, পরে তালব্য ই ঈ এবং তৎপরে ওষ্ঠ্য উ ঊ। শেষে মিশ্র উচ্চারিত কণ্ঠতালব্য এ এবং কণ্ঠোষ্ঠ ও। ঋ ৠ ঌ ঐ ঔ এই পাঁচবর্ণের কথা পরে কহিব।

যে কএকটি ভাষার বর্ণমালা জানি তাহাদের সহিত বঙ্গভাষার তুলনা করিলাম। দেখিলাম তাহাদিগের বর্ণমালা বালকের ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খলভাবে

বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। স্বরের মধ্যে ব্যঞ্জন ও ব্যঞ্জনের মধ্যে স্বর, ওষ্ঠ্যবর্ণের পরে কণ্ঠ্যবর্ণ এবং স্পর্শবর্ণের মধ্যে অন্তঃস্থ বা উষ্মবর্ণ। লাটিন ও গ্রীক এবং তন্মিশ্র ইংরেজী, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য ভাষা, আরবী ও পারসী সকল ভাষার বর্ণমালাই এরূপ বিশৃঙ্খল ও যথেচ্ছ ন্যস্ত।

বঙ্গভাষার বর্ণমালায় যে কেবল ক্রমবিন্যাসের অতুল বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য্য রহিয়াছে তাহা নহে, উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিও অতিশয় পরিপুষ্ট। উহা পূর্ণাবয়বা নহে কিন্তু প্রায় পূর্ণাবয়বা। দুই চারিটি দোষ ও অভাব যাহা দেখিলাম তাহা বলিতেছি।

১। দেখিলাম ঋ ৠ ঌ ঐ ঔ এই পাঁচটি বর্ণ অনাবশ্যক। স্বরব্যঞ্জনে কিম্বা দুইটি স্বরে উহাদের কার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে। তদ্ভিন্ন উহাদের উচ্চারণ যৌগিক। যৌগিক উচ্চারণের জন্য অসংযুক্ত বর্ণ থাকিলে তাহাকে কিরূপে নির্দ্দোষ কহিব?

২। দেখিলাম অবহেলায় অন্তঃস্থ ব ও মূর্দ্ধন্য ণ ও ষ এবং দন্ত্য স মৃতপ্রায় হইয়াছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের আর তারতম্য নাই। দুই একটি সংস্কৃত ধরণে রচিত শ্লোক পাঠের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে প্রায় হ্রস্ব দীর্ঘের পার্থক্য থাকে না। মাতঃ বঙ্গভাষা, নিজে উপার্জ্জন করা দূরে থাকুক, স্ত্রীধনে প্রাপ্ত সম্পত্তিও যে খোয়াইতে বসিয়াছ? বাঙ্গালীরা দুঃখের মর্ম্মস্পৃক্ বেদনাতেও একতাবদ্ধ হয় না। তোমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য কি একতাবদ্ধ হইবে? আশা করিতে পারি না। তবে সরস্বতীর কৃপা।

৩। দেখিলাম পদান্ত অকার অনেক স্থলে উচ্চারিত হয় না। একারের উচ্চারণ দুইটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এত, মেথর, কেন, দেও, নেও ইত্যাদি শব্দে একারের উচ্চারণ সাধারণ উচ্চারণ হইতে বিভিন্ন।

প্রথম ও দ্বিতীয় দোষের সহিত আমার চিন্তার বিষয়ের সম্বন্ধ অল্প, কিন্তু যদি অকার কোথায় উচ্চারিত, কোথায় বা অনুচ্চারিত হয়, এবং একারের যদি দুইটি বিভিন্ন উচ্চারণ হয়, তাহা হইলে ক্রমেই উচ্চারণের অভিধানের উপকরণ সংগৃহীত হইতে থাকিবে। ইংরেজী উচ্চারণ পুরুষে পুরুষে যুগে যুগে এমন কি বৎসরে বৎসরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর পারি না। সেই উৎপাত কি বঙ্গভাষায় প্রবেশ লাভ করিবে? আগে শুনিয়াছি ডাইভোর্স, এজুকেশন, নেচার, মাইনরিটি, বেঞ্চ, এখন শুনি ডিভোর্স, এডুকেশন, নেটিয়ুর, মিনরিটি, বেন্শ্। উদাহরণ যথেচ্ছ বৃদ্ধি করা যায়। নূতন কলেজের ছাত্রের নিকট ইংরাজী কহিতে ভয় হয়, পাছে আমার বিনা সম্মতিতে ও অজ্ঞাতে পরিবর্ত্তিত কোন উচ্চারণের জন্য পুরাতন মূর্খ মধ্যে পরিগণিত হই।

ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার উচ্চারণের অ-

ভিধান আবশ্যক না হয় তাহার কি কোন চেষ্টা করা যাইতে পারে? এত, মেথর, কেন, দেও ইত্যাদি শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণ একারের উচ্চারণ স্থিরতর রাখা সম্ভব নহে। ভাষা ব্যবহারের দাসী। ব্যবহারকে ভাষার দাসী করা সঙ্গতও নহে এবং সম্ভবও নহে। সম্ভব হইলে একার একারই থাকিত হ্রস্ব (a) হইত না। তবে ইহার একটি উপায় আছে। উর্দ্দু ভাষায় আবশ্যক মত পারস্য বর্ণমালার অতিরিক্ত টে, ডাল প্রভৃতি কএকটি বর্ণ সৃষ্ট হইয়াছিল। বাঙ্গলায় সেইরূপ একটি নূতন অক্ষর সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অকারের উপদ্রব আরও ভয়ানক। লুপ্ত অকারের পুনরুদ্ধার অসম্ভব ও তাহার চেষ্টা বৃথা। * উচ্চারণের অনুকরণে পদান্ত বর্ণ হসন্ত লিখিলে কি চলিবে? না, তাহা হইলে সমুদয় সন্ধি সূত্র পরিবর্ত্তন করিতে হয়। কএকটি সাধারণ সূত্রে কি পদান্ত অকারের উচ্চারণ অনুচ্চারণ নিয়মবদ্ধ করা যায়? নিয়ম বদ্ধ করা সম্ভব হইলেও সাধারণ বিধি হইতে বর্জ্জিত বিধি অধিক হইবে; এবং সমুদায়গুলি একত্র বহু সংখ্যক হইয়া পড়িবে। সূত্র বহুসংখ্যক হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রায় সমুদয় দোষ ও অসুবিধা রহিল। অতএব ইহাতে বিশেষ কোন লাভ দৃষ্ট হয় না।

কতগুলি কথা আছে যাহার অন্ত্য অকার কখন বা উচ্চারিত হয় কখন বা অনুচ্চারিত থাকে। যেখানে উচ্চারিত হয় সেই সমস্ত স্থল কোন কোন পুস্তকে 'ও' বর্ণ সন্নিবেশ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়া থাকে. যথা, কোন, কোনও। অকারকে বিদায় দিয়া ওকারের আশ্রয় গ্রহণ করা কতদূর সঙ্গত তাহার বিচারে লেখনীকে ব্যায়ামক্লিষ্ট না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উক্ত প্রণালীতে আমাদিগের প্রদর্শিত অসুবিধার অতি অল্পাংশে মাত্র সাহায্য হয়। আমাদিগের বিবেচনায় ইহার একটি মাত্র সহজ উপায় আছে। পদান্ত অকারের অধিকাংশই অনুচ্চারিত থাকে, অল্প সংখ্যক মাত্র উচ্চারিত হয়। উচ্চারিত পদান্ত অকারের একটি চিহ্ন সৃষ্টি করিলে উচ্চারণের অভিধানের দুঃসহ জ্বালা হইতে আমরা রক্ষা পাইতে পারি। কমা, কোলন, সেমিকোলন, প্রশ্নের চিহ্ন, বিস্ময়ের চিহ্ন, ইত্যাদি তো অতি অল্পদিন হইল বঙ্গভাষায় গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে, উচ্চারিত অকারের একটি চিহ্ন করিলে তাহাও যে অতি অল্পকাল মধ্যে প্রচলিত হইবে সন্দেহ নাই।

প্রথমেই বলিয়াছি যে বর্ণমালা পূর্ণ হইলে উচ্চারণের অভিধানের প্রয়োজন

* যদি কেহ 'অতএব এক্ষণ তোমার নাম কহ' (৫ সূ দেখ) এই কথাটির সমুদয় পদান্ত অকারের উচ্চারণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে উড়িষ্যাবাসী বলিয়া ভ্রম হইবার একান্ত সম্ভাবনা।

হয় না। বঙ্গভাষায় যে দুইটি অভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা উপরে নির্দ্দেশ করিলাম। ভবিষ্যতে আরও অভাব হইতে পারে। অভাব মোচনের জন্য যদি বর্ণমালা বর্দ্ধিত না হয় তাঁহা হইলে ক্রমশঃ উচ্চারণের অভিধান আবশ্যক হইবে। উপরে যে একটি বর্ণের ও একটি চিহ্নের সৃষ্টির কথা কহিলাম তাহা এক জনের কার্য্য নহে, সমস্ত সাহিত্য সমাজের কার্য্য। এক ব্যক্তি প্রথম পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাকে অনুসরণ না করিলে সাহিত্য সমাজ ভবিষ্য বংশের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইবেন না। ইংলণ্ডে কতকগুলি লোক ইংরেজী শব্দের উচ্চারণানুসারে বর্ণবিন্যাস করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের বর্ণবিন্যাসের প্রণালীর নাম ফনেটিক সিস্টেম্। এই সম্প্রদায়ের চেষ্টা যে সফল হইবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। তাঁহারা বিফলপ্রযত্ন হউন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ও উদ্যমে প্রমাণিত হইতেছে বর্ণমালার অভাবে ভাষায় কি অকথ্য বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করে। বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ যদি বর্ণমালা পরিবর্দ্ধিত না করেন তাহা হইলে আধুনিক ইংরেজেরা উচ্চারণ লইয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছেন ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীরা ততদূর না হউক কিন্তু তদ্রূপ এক গোলযোগে যে পড়িবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীবি—

প্রেততত্ত্ব।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আমরা এই প্রস্তাবে মধ্যস্থ এবং আয়োজনের কথা বলিব। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, মধ্যস্থে না ডাকিলে প্রেতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। ইংরেজী অনভিজ্ঞ পাঠককে ‘মধ্যস্থ’ কথা বুঝান বড় দুরূহ। মূল কথা যাঁহার অনুপস্থিতিতে প্রেতাগমের ব্যাঘাত জন্মে, তিনিই মধ্যস্থ (Medium)। যেখানে দশজনে মিলিয়া প্রেতাহ্বান করিতে থাকেন, সেস্থলে যে সকলকেই মধ্যস্থ হইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। তবে ন্যূনপক্ষে একজনকে ঐ শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে হইবে। তাঁহার অভাবে প্রেতাবির্ভাব হইবে না। সাধারণতঃ যাঁহারা দুর্ব্বল, বা অধিক চিন্তাশীল, বা যাঁহাদের প্রেতে অন্ধবিশ্বাস, বা যাঁহাদের স্নায়ু বা ধমনী সকল শীঘ্র উত্তেজিত হয় (Nervous) তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া থাকেন। এ মধ্যস্থের সহিত প্রেতের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যদি দশজন বাজে লোক প্রেতের জন্য গলবস্ত্র হইয়া

ধ্যান করিতে থাকেন,তথাপি তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না। কিন্তু তিন জনের মধ্যে যদি একজন মধ্যস্থ থাকেন, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত দশজনে যাঁহা করিতে না পারিয়াছে এই তিনজনে তদধিক করিতে পারিবে। সুতরাং যখন যেরূপ আয়োজন করিয়া প্রেতাহ্বান করিতে থাকি না কেন, সকল সময়েই ন্যূন কল্পে একজন মধ্যস্থ চাই। তাঁহার উপস্থিতি অপরিহার্য্য।

এক্ষণে আয়োজনের কথা—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যেমন তেমন করিয়া ডাকিলে প্রেতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এই কারণে প্রেতাহ্বানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের প্রচলন আছে। আমরা তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিতেছি।

১ম। তিন চারিজন একটি চৌপায়ার চতুর্দ্দিকে বসিয়া তদুপরে এরূপভাবে হস্ত রক্ষা করে যেন পরস্পরের হস্তের সহিত যোগ থাকে, এবং সকলেই কোন বিশেষ প্রেতের কথা মনে মনে স্মরণ করিতে থাকে। আর একজন হয়ত প্রেতাহ্বানকারীদিগের মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ দুঃখরসাত্মক কোন পুস্তক পড়িতে থাকে বা কোন গান গাহিতে থাকে। অল্পক্ষণপরেই একজনের অঙ্গ শিথিল হইতে থাকে এবং সে ক্রমে অজ্ঞানাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে প্রেত আসিয়াছে স্থির করিতে হইবে। এবং এই অজ্ঞানাবস্থকে যাহা প্রশ্ন করা যায় প্রায় তাহার সকলগুলিরই সে যথাবিধি উত্তর দিয়া থাকে। প্রেততত্ত্ববাদীমতে ইহাই প্রেতের উত্তর। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান জন্মে এবং সে স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়; চেতনা হইলে তখন আর অজ্ঞানাবস্থার কথা কিছুই স্মরণ থাকেনা।

আমি স্বয়ং একবার এইরূপ প্রেতাগম দেখিতে গিয়াছিলাম। যথাসময়ে একজন অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তাহাকে এইরূপ প্রশ্ন করা হয়।

প্র। তুমি কাহার আত্মা?

উত্তর নাই।

প্র। আপনি যদি কাহারও আত্মা হন, অনুগ্রহ করিয়া উত্তর দেন, আমরা আপনার অপেক্ষা করিতেছি।

উ। মহাত্মা রামমোহন রায়ের।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই অজ্ঞান ব্যক্তি এক উপদেশপূর্ণ বাচনিক বক্তৃতা দিল; তাহাতে বাস্তবিক আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। এইরূপ বক্তৃতা শিক্ষিতব্যক্তিও আয়োজন ব্যতীত দিতে পারে কিনা সন্দেহস্থল। এতদ্ব্যতীত আমরা জীবনে তাহার নিকট কোনরূপ বক্তৃতা শুনি নাই।

আর একবার এইরূপ সভায় গিয়া দেখিলাম, যে অজ্ঞানব্যক্তি একজনকে ক্রমাগত প্রহার করিতেছে, দশ বার জনে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। অবশেষে সে ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহ হইতে এক খানা পালঙ্ক বাহিরে আনিয়া ফেলিল। পর দিবস সে পালঙ্ক গৃহে লইয়া যাইতে পাঁচজন লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল।

২। প্রেতাহ্বানের আরও একরূপ আয়োজন হইয়া থাকে; তাহাতে সকলই পূর্ব্বমত, কেবল প্রেতমহাশয় স্কন্ধে চাপিয়া কাহাকেও অজ্ঞান করেন না; চৌপায়ার পদাঘাতে উত্তর দিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্তরূপ কিয়ৎক্ষণ বসিলেই টুল নড়িতে থাকে। তখন প্রশ্ন করা হয় 'আপনি যদি কোন প্রেত আসিয়া থাকেন, কাষ্ঠপাদ একবার আঘাত করুন'। কাষ্ঠপাদে একবার আঘাত পড়িল। তখন প্রেতের উপস্থিতি স্থির হইল। তৎপরে কিরূপে কথোপকথন চলিবে তাহারই উপায় স্থির হইতে থাকে। হয়ত আহ্বানকারীরা বলেন 'হাঁ হইলে যেন একবার শব্দ হয়, না হইলে দুইবার, এবং সংশয়যুক্ত হইলে তিন বার' তার পর প্রশ্ন হইতে থাকে, এবং এই নিয়মমতে প্রেত মহাশয় উত্তর দেন। তখন বলা হয় যে, 'আপনার যে অক্ষরে লিখিবার ইচ্ছা, আমরা অক্ষর পড়িয়া যাইব, আপনি আপনার মনস্থ অক্ষরে আঘাত দিবেন, আমরা আবার গোড়া হইতে আরম্ভ করিব, আপনি আবার বক্তব্য অক্ষরে আঘাত দিবেন' এইরূপ। ইহাতে উত্তমরূপ কথোপকথন চলিতে পারে। আহ্বানকারীরা জিজ্ঞাসা করিবেন, রাম শ্যামের কত টাকা ধারে? এই বলিয়া অ হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর পড়িতে আরম্ভ করিল, 'শ'এ এক আঘাত পড়িল। আবার গোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিল 'ত'এ এক আঘাত পড়িল,—হইল শত টাকা।

৩য়। আর একরূপ কথোপকথনের উপায় প্লাঞ্চেট (Planchette)। এই অভিনব দ্রব্য কি তাহা সাধারণকে বুঝান অনাবশ্যক। কিছু দিবস হইল একজন সাহেব এই অদ্ভুত জিনিষ কলিকাতায় আমদানী করিয়া বড় মন্দ লাভ করিয়া যান নাই। ইহা একখানি ছোট তক্তা। তিনটি পায়া আছে। পায়াতে সূক্ষ্ম চক্র দেওয়া আছে। তাহা এত মসৃণ যে হাত দিলেই সে চাকাগুলি ঘুরিতে থাকে এবং তক্তা গড়াইয়া যায়। এই তক্তার মধ্যস্থলে একটি পেন্সিল বসান আছে। যেমন চাকা ঘুরিয়া এই তক্তাকে সরাইতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পেন্সিলও সরে এবং কাগজের উপর হইলে সেই পেন্সিলে প্রশ্নের উত্তর অতি সুন্দর অক্ষরে লিখিত হয়। এই প্লাঞ্চেটে একবার আমি কএকটি বন্ধু * লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরেই প্ল্যাঞ্চেট্ ঘুরিতে আরম্ভ হইল। তখন তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। যে সকল উত্তর পাইলাম তাহার প্রায় সকল গুলিই ঠিক। পাঠকগণকে তাহার নমুনা দেখাইতেছি।

প্র। মহারাণী কোন্ বর্ষে সিংহাসনে আরোহণ করেন?

প্ল্যাঞ্চেট্ প্রশ্ন শুনিয়াই ঘুরিয়া ঘুরিয়া

* তাহাদিগের অন্যতম বাবু রাজকৃষ্ণ রায়। (অবসর সরোজিনী রচয়িতা)।

কিয়ৎক্ষণ পরে '১' অক্ষরটি লিখিয়া পরে ৮; ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার দুইটি অক্ষর বাহির হইল, পড়িলাম ১৮৩৭। পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলাম।

কোন্ বৎসরে বায়রণের মৃত্যু হয়? উত্তর। ১৮২৪।

প্র। বায়রণ বড় কবি না সেলী?

উ। দুইজন দুই প্রকার কবি; তুলনা অসম্ভব।

পাঠকগণকে বলা বাহুল্য, যে আমাদিগের কেহই উত্তর সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক লিখি নাই। এমন কি যে সকল প্রশ্নের উত্তর আমরা জানিতাম সেরূপ একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা হয় নাই; অথচ প্রায় অধিকাংশ উত্তর গুলিই ঠিক২ লিখিত হইয়া ছিল।

একটি বেঠিক উত্তরের কথাও বলি। সেই স্থানে আমাদিগের আর একটি বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমি মরিব কবে?

প্ল্যাঞ্চেট স্বভাবমত ঘুরিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ঘুরিয়া২—প্রায় আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এমন সময়ে একটি ১অক্ষর লিখিত হইল। আবার পূর্ব্বমত ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু আমরা নাছোড়বন্দা, প্লেঞ্চেট্ ধরিয়াই আছি। বহুক্ষণ পরে '৮' অক্ষর লিখিত হইল। পুনর্ব্বার ঐ রূপ উৎপাৎ। চারিটি অক্ষর শেষে সমাপ্ত হইলে পড়িলাম ১৮৭৫। আমরা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই পরীক্ষা করিতে ছিলাম। পাঠকগণকে ইহাও জানান আবশ্যক যে আমাদিগের বন্ধু এখনও জীবিত আছেন।

আমাদিগের একটি প্রেততত্ত্ববাদী বন্ধু এইরূপ প্লেঞ্চেট্ ধরিয়া প্রেতাহ্বান করিতে ছিলেন। তিনি প্ল্যাঞ্চেট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন।

তুমি কি পরকালের সমস্ত কথা জান? যে হেতু তুমি প্রেত।

উ। জানি।

প্র। আমাদিগকে বলিয়া দেওনা কেন?

উ। তাহইলে সব গোল মিটিয়া যাইবে।

এই শেষ উত্তরটিতে আমাদিগের উক্ত বন্ধু একেবারে গলিয়া গেলেন। তিনি বলেন প্রেত ব্যতীত এরূপ উত্তর দেওয়া আর কাহারও কি সম্ভবে? ফল কথা কথাটি তাহাকে বড় মধুর লাগিয়াছে কাজেই প্রেতে তাঁহার বিশ্বাস এক ডিগ্রী উচ্চ হইয়াছে।

৪র্থ। তৃতীয় আয়োজনে যে যে উপকরণ আবশ্যক, ইহাতেও তাই, কেবল প্ল্যাঞ্চেটের মধ্যস্থলে পেন্সিল না থাকিয়া একটি দণ্ড প্রোথিত থাকে। এবং টেবিলের উপর ক, খ, প্রভৃতি অক্ষর লিখিয়া প্ল্যাঞ্চেট ধরিলে, ঐ দণ্ডটি এক অক্ষরের পর আর এক অক্ষরের নিকট গিয়া আপন অভিমত প্রকাশ করিয়া দেয়।

উপযুক্ত আয়োজন ও মধ্যস্থ ব্যতীত অনেকরূপে প্রেতাগম জানিতে পারা যায়। কখন কখন প্রেতাক্রান্ত মধ্যস্থ ছবি আঁকে। কখন কখন বা পীড়িতের জন্য

ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেন। এরূপ চিকিৎসায় অনেকেই আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

প্রেতাহ্বান সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ আয়োজনের কথাও বলিয়া রাখি।

যে গৃহে প্রেতাহ্বানের জন্য আয়োজন করা হইবে, সেটি নির্জ্জন হওয়া চাই। অধিক উষ্ণ হইবে না, কারণ তাহাতে মনের স্থৈর্য্য রক্ষিত হয় না। তীক্ষ্ণ শীত বায়ুও বহিবে না। চারি পাঁচ ছয় যত জনে ইচ্ছা চৌপায়ের (টুল বা টেবিলের) চতুর্দ্দিকে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে একমন হইয়া ধ্যানলগ্ন হইবে যেন মাঝে কেহ বিরক্ত না করে। দুই শত্রুতে একত্রে আহ্বান করিবেনা। প্রেতে যাঁহারা অবিশ্বাসী গৃহ মধ্যে তাহাদের উপস্থিতিও প্রেতাগমের ব্যাঘাতকারী। *

এক্ষণে দেশীয় ও বিদেশীয় প্রেত সম্বন্ধীয় কএকটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

১। প্রায় দশ বার বৎসর হইল, হুসেন খাঁ নামক জনৈক মুসলমান দৈবশক্তি বিশিষ্ট বলিয়া পরিচিত ছিলেন। যিনি যাহা চাহিতেন তিনি তাঁহাকে তাহাই দিতে পারিতেন *। তাঁহাকে অনেকেই দেখিয়াছেন। তন্মধ্যে একজনের নিকট আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি একবার হুসেনখাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এবং হুসেনখাঁ আসিলে তিনি আঙ্গুরের রস খাইতে প্রার্থনা করেন। কিছু পরেই হুসেনখাঁ সত্য সত্যই আঙ্গুরের রস আনিয়াছিলেন। এজন্য তিনি একবার বাহিরেও যান নাই। আমাদিগের বন্ধুটি সেবন করিয়া দেখিলেন যে, উহা বাস্তবিকই আঙ্গুরের রস। বন্ধুটিকে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না।

২। আর একটি ঘটনা পাঠকগণের সমীপে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। এটিও প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধীয়। একবার ত্রিবাঙ্কুররাজার কোন আত্মীয়ের মৃত্যু হয়, উক্ত রাজবংশের এইরূপ বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তি দগ্ধ হইলে তাহার কিয়দংশ ভস্ম কোন পবিত্র (হিন্দুমতে) নদীজলে ভাসাইয়া দিলে উক্ত মৃত ব্যক্তির পরকালে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। তদনুসারে ত্রিবাঙ্কুররাজ জনৈক সন্ন্যাসী দিয়া তাঁহার মৃত আত্মীয়ের ভস্ম গঙ্গাজলে নিক্ষেপ জন্য পাঠান। সন্ন্যাসী যথাসময়ে কাশীধামে উপস্থিত হন এবং ত্রিবাঙ্কুর-রাজদত্তপত্রসহায়ে কাশীরাজের বাটীতেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই সময়ে একজন ফরাসীও কাশীরাজের

* এই কথাটিতে প্রেততত্ত্ববাদীরা সাধারণকে অত্যন্ত কায়দায় রাখিয়াছেন। কেহ প্রেত সম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপের পরীক্ষা করিতে যাইলেই প্রায় সেবারে প্রেত মহাশয় নিয়মমত দেখা দেন না। প্রেততত্ত্ববাদীরা অমনি বলেন, আপনি প্রেতে বিশ্বাস করেন না, আপনার উপস্থিতিই আমাদিগের সফলতার প্রতিরোধক।

* দুঃখের বিষয় এই, প্রস্তাবলেখক তাঁহাকে দেখেন নাই।

বাটীতে আশ্রয় পাইয়াছিলেন। কাজেই উক্ত সন্ন্যাসীর (ফকির) সহিত ফরাসীর কিঞ্চিৎ সৌহার্দ্দ জন্মে। ক্রমে ফরাসী শুনিলেন যে, ফকির দৈব-শক্তি-বিশিষ্ট। তখন তাহার ক্ষমতার কিছু নিদর্শন দেখিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ফকির স্বীকার পাইলেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসে একটি জল-পূর্ণ বৃহৎ ধাতু-নির্ম্মিত পাত্রাধারের পার্শ্বে উভয়ে দাঁড়াইয়াছিলেন, ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট কি আছে? ফরাসীর হস্তে একটি উডেন্ পেন্সিল ছিল, তিনি তাহাই ফকিরকে দিলেন। ' ফকির পেন্সিল লইয়া অপরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ' বলুন দেখি এ পেন্সিল জলে ফেলিলে ভাসিবে না ডুবিবে? '

ফরাসী বলিলেন—ভাসিবে।

পেন্সিল জলে ফেলিবা মাত্র ডুবিয়া গেল।

ফকির পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, এবারে ভাসিবে না ডুবিবে?

ফ। ডুবিবে।

এবারে পেন্সিল ভাসিল।

ফরাসী দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তৎপরে সন্ন্যাসী সেই পেন্সিল দিয়া উক্ত জলধার স্পর্শ করিলেন, অমনি তাহার একদিক উর্দ্ধে উঠিয়া, অপরদিক পূর্ব্বমত রহিল। পাত্র ঠিক থাকিল, জলের এক দিক উঠিয়া রহিল অপর দিক নিচু রহিল। এইরূপ সেই জল লইয়া অনেকরূপ রহস্য দেখাইতে লাগিলেন।

ফরাসী বলিলেন "আপনি যখন প্রেত সহায়ে এত অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম সমাধা করিতে পারেন, তখন প্রেত আপনার একান্ত বাধ্য বলিতে হইবে। যদ্যপি প্রেতকে আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমার প্রেতে বিশ্বাস হয়। ফকির উত্তর করিলেন, প্রেতের দেখা পাওয়া না পাওয়া প্রেতের ইচ্ছাধীন। কিন্তু আপনি তাহার উপস্থিতি অনুভব করিতে পারিবেন।

ফরাসী। কিরূপে?

ফকির। তাহার কার্য্যকলাপে, এরূপ অমানুষিক কার্য্য দেখিবেন যে প্রেত ব্যতিত অন্য কাহার দ্বারা সে কর্ম্ম অসম্ভব।

প্রেত দেখাইবার নির্দ্দিষ্ট দিবস স্থির হইল।

সেই দিবস ফরাসী এক চতুস্তল বাটির উর্দ্ধতম গৃহে গিয়া রাত্রি কাটাইবেন স্থির করিলেন। যাহারা কাশীধামে গিয়াছেন তাঁহারা হয়ত জানেন যে তথাকার উর্দ্ধতম গৃহের যে দ্বার, তাহা নামাইয়া দিলেই ত্রিতলের সহিত সিঁড়ির কার্য্য করে। আবার উঠাইয়া লইলেই দ্বার হইয়া যায়, এবং নিম্নের সহিত সকল সম্বন্ধ ও যোগাযোগ বন্ধ হয়। ফরাসী যে গৃহে আশ্রয় লইলেন, তাহা এইরূপ। প্রথমতঃ বাটিতে প্রবেশ করিয়াই তিনি চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, কেহ কোথাও লুকাইয়া নাই। পরিশেষে সর্ব্বো-

পরিস্থ গৃহে উঠিলেন এবং সিঁড়ি তুলিয়া লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। গৃহে পিস্তল বন্দুক প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল যথা-কালে রক্ষিত হইল।

সন্ধ্যা হইল। ফরাসী শয্যার উপর ব-সিয়া রহিলেন, রাত্রি গাঢ় না হইতে হই-তেই ছাদের উপরে মনুষ্যের পদশব্দ হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে তিনি ছাদ ও উত্তমরূপ পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি-লেন। পরে জানালায় আঘাত হইতে লাগিল। ফরাসীর বন্দুক প্রস্তুত ছিল। সহসা জানালা খুলিয়াই বন্দুক ছুঁড়িলেন, কিন্তু কোথাও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে সকল জানালাতেই 'ধুপ' 'ধাপ' করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ব-ন্দুক পিস্তল সকলই ছুঁড়িলেন, কাহাকেও দেখিলেন না। অবশেষে দ্বার খুলিয়া ছাদে উঠিলেন। সেখানেও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। কেবল দূরে চা-হিয়া দেখিতে পাইলেন, সেই ফকির গ-ঙ্গাতীরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন *।

* এই ঘটনাটি 'The Spiritualist' নামক পত্রে দৃষ্ট হয়। এক্ষণে উহা নি-কটে না থাকায় যথাযথ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এবং কোন্ সংখ্যায় আছে তাহাও বলিতে পারিলাম না। যাঁহারা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উক্ত প-ত্রের ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৫ সনের সংখ্যা-গুলির সূচিপত্র দেখিয়া বাহির করিয়া লইবেন।

একটি বিদেশীয় দৈবিক ঘটনারও উ-ল্লেখ করিতেছি। সেটিও বড় কম বিস্ময়-জনক নহে।

রুসিয়ার কাউন্‌টেস্ ব্ল্যাভা-স্কী (Countess Blavatsky) সাধার-ণতঃ একজন ক্ষমতাশালিনী মধ্যস্থ ব-লিয়া পরিচিতা। তাঁহার সম্পাদিত দু-ইটি দৈবিক কার্য্য বড় বিস্ময়াবহ। প্র-থম, রুমালের সূচিকার্য্যে লিখিত একটি নামের পরিবর্ত্তে আর একটি নাম স্থাপন। ঘটনাটি অতি অল্প সময় মধ্যে এবং অ-নেকগুলি পণ্ডিত লোকের সমক্ষে সম্পা-দিত হয়। তন্মধ্যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কালেক্টর সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয়টি এইরূপ। যখন উক্ত মধ্যস্থ লণ্ডন হইতে বোম্বাই নগরে আসিতেছি-লেন, তখন একজন ব্যারিষ্টার তাহার পিতার (সুপরিচিত পার্লিয়ামেণ্টের মে-ম্বার) অঙ্কুর আরোগ্য করিতে অনুরোধ করেন। ব্ল্যাভাস্কী তাহাতে স্বীকৃতা হই-লেন, এবং বলিলেন যে, 'ভারতবর্ষে গিয়া আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দেশে থাকিয়া উভয়ের কথো-পকথনের জন্য একটি উপায় আবশ্যক। রোগীর কোন দ্রব্য পাইলেই আমি সং-বাদ চালাইতে পারি।' ইহাতে রোগীর হস্তাবরণ (Gloves) দেওয়া হইবে। ব্ল্যা-ভাস্কী দস্তানা লইয়া ভারতবর্ষে আসি-লেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কর্ণেল অ-লকট্ (Col. Olcott) সাহেবের সমক্ষে

তিনি উক্ত দুইটি দস্তানাই একটি গৃহ মধ্যে টেবিলে রাখিয়া গৃহে চাবি দিলেন। কিছু দিবস পরে বিলাত হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারির এক পত্র আসিয়াছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যারিষ্টার লিখিয়াছেন, যে তিনি একটি হস্তাবরণ পাইয়াছেন। ইহাতে যে সকল স্বাক্ষীর উল্লেখ আছে তাহা কোন ক্রমেই অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না।

আর্য্যায়ুর্ব্বেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বোধ হয় ভাবপ্রকাশরচয়িতা একদিকে ধন্বন্তরিকে কাশীরাজগোত্রী ও অপরত্র বিষ্ণুপুরাণে কাশীপুত্র ধন্বন্তরির উল্লেখ দর্শনে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন; এবং ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ভিন্নজাতীয় হইয়াও যে সূর্য্য চন্দ্রাদি বংশীয় ও শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রান্তর্ভূত হইতে পারেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ ধন্বন্তরি ক্ষত্রিয় হইলে, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্র সুশ্রুত তাঁহার পাদগ্রহণ করিয়া প্রণাম করিতেন না। যদি আমরা এরূপ কল্পনা করি যে ধন্বন্তরি দুই বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আদৌ বৈদ্যবংশ প্রবর্ত্তকরূপে, দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয়নৃপতিরূপে আয়ুর্ব্বেদে উপদেশ দিয়াছেন, এরূপ হইলে ভাবপ্রকাশ ও পুরাণের মিমাংসা হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আপত্তি উপস্থিত হয়। কুত্রাপিও ধন্বন্তরির দ্বিতীয় অবতারের উল্লেখ নাই। সুশ্রুতে ও পুরাণে একবাক্যে স্বর্গবৈদ্য ধন্বন্তরিরই উল্লেখ আছে। সুশ্রুতের নানা স্থান হইতে আমরা নিম্নলিখিত বাক্য সংগ্রহ করিলাম।

ধন্বন্তরিং ধর্ম্মভৃতাং বরিষ্ঠং অমৃতোদ্ভবং
চরণাবুপসংগৃহ্য সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি ॥

নিদানস্থান

চিকিৎসিতাৎ পুণ্যতমং ন কিঞ্চিদপি শুশ্রুমঃ
ঋষেরিত্র প্রভাবস্যামৃতযোনের্ভিষক্গুরোঃ ॥

কল্পস্থান।

যেনামৃতমপাং মধ্যাদুদ্ধৃতং পূর্ব্বজন্মনি।
যতোহমরত্বং সংপ্রাপ্তাস্ত্রিদশাস্ত্রিদেবেশ্বরাৎ ॥ উত্তরতন্ত্র।

সুতরাং সুশ্রুত, চরক, গাকর ও মার্কণ্ডেয় একই ধন্বন্তরির উল্লেখ করিতেছেন। ভাবপ্রকাশকার অন্যান্য সমুদয় বিবরণই প্রাগুক্ত গ্রন্থকারদিগের অনুরূপ লিখিয়াছেন, কেবল মাত্র কাশীরাজ পুত্র ধন্বন্তরির সহিত গোল করিয়া তাঁহাকে বাহুজ মনে করিয়াছেন। বোধ হয় পুরা-

গোলিখিত অলৌকিকাংশে অনাস্থা হওয়াতেই এরূপ গোলে পতিত হইয়াছিলেন।

এই সমস্ত অনুসন্ধানের পর আমরা এই মহাত্মার জীবনী সম্পর্কে এই মাত্র জানিলাম যে তিনি মহর্ষি গালবের পুত্র, বৈশ্যবংশ ললামভূতা বীরভদ্রা ইঁহার জননী। ইনি অম্বষ্ঠ বংশের আদি পুরুষ। অলৌকিক প্রতিভাবলে শরীর বিজ্ঞানের বহুবিধ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া মানব জাতির মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইহার তিন পরিণয়, একের নাম সিদ্ধবিদ্যা, দ্বিতীয়া সাধ্যবিদ্যা ও তৃতীয়া কষ্টসাধ্য বিদ্যা, ইহাদের গর্ভে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, ধর, কর, দেব, রক্ষিত, প্রভৃতি চতুর্দ্দশ পুত্র জন্মে। ভরদ্বাজ, গালব, আত্রেয় প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিবর্গ তৎপ্রতি অতীব ভক্তিমান্ হইয়া তাঁহাকে আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায় সম্প্রদান করেন। তাঁহার সহজ বৈরাগ্য সন্দর্শন করিয়া মুনিসমাজ তাঁহাকে কাশীরাজ্যে অভিষিক্ত করেন; তদবধি তাহার বিষয়বৈরাগ্য কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল হইয়াছিল। তথাপি তিনি নামতঃ রাজা থাকিয়া সমস্ত জীবন কার্য্যতঃ আয়ুর্ব্বেদানুশীলনে অতিবাহিত করেন। তিনি বারাণসীর আশ্রমে বসিয়া ঔপধেনব, পৌষ্কলবত, করবীর্য্য, গোপুররক্ষিত ও সুশ্রুত প্রভৃতি ১০০ শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দেন। যদিচ তৎপ্রণীত সংহিতা আজ কাল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, তথাচ চতুর্দ্দশ খৃঃঅব্দে তাহা বঙ্গদেশে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল।

আত্রেয় ও ভরদ্বাজ।

বর্ত্তমান কালে আয়ুর্ব্বেদীয় যত সংহিতা বর্ত্তমান আছে তন্মধ্যে আত্রেয় সংহিতাই প্রাচীনতম। আত্রেয়, ভরদ্বাজ, গালব ও ধন্বন্তরি প্রায় সমসাময়িক। সুতরাং ধন্বন্তরিসংহিতা ও আত্রেয়সংহিতা এক সময়ের গ্রন্থ। এই প্রস্তাবে আমরা এই প্রাচীনতম সংহিতার বিষয়সকল সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভরদ্বাজ ও আত্রেয়ঘটিত একটি সাধারণ প্রচলিত সন্দেহের আলোচনা করিতে চাই। পাঠক কিয়ৎকাল অবহিত চিত্তে দেখিবেন যে মুদ্রাযন্ত্রাভাবে এদেশের কত অনিষ্ট ঘটিয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পণ্ডিতবর শিবদাস নানাবিধ গ্রন্থের টিকাকার। তৎপ্রণীত চক্রপাণিকৃত সংগ্রহের টিকা অতীব উপাদেয় গ্রন্থ; এবংবিধ ব্যাখ্যান মূল পুস্তক হইতেও অধিক মূল্যবান্, পাঠকের সমধিক উপকারী। তৎপ্রণীত চরকসংহিতার টিকাতে দৃষ্ট হয় যে পুনর্ব্বসু ও ভরদ্বাজ একই* ব্যক্তি। চরকসংহিতাতে উল্লিখিত আছে যে পুনর্ব্বসু অগ্নিবেশ প্রভৃতির উপদেষ্টা, এবং কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে পুনর্ব্বসু

* পুনর্ব্বসুঃ ভরদ্বাজঃ অনেক শিষ্যদ্বারা পুনর্বিস্তার কারিত্বাৎ তস্য পুনর্ব্বসুসংজ্ঞা। ইতি শিবদাস গুপ্তঃ।

আত্রেয় মুনির উপাধি মাত্র। আমাদের বিবেচনায় পরোক্ত মতই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। কারণ, চরকসংহিতায় স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে ভগবান্ ভরদ্বাজই আদৌ ইন্দ্রসমীপে গমন করেন ও ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আত্রেয়প্রমুখ ঋষিদিগকে উপদেশ দেন। তদনন্তর আত্রেয়, অগ্নিবেশ, ভেল জাতূকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি নামক ছয়জন শিষ্যকে আয়ুর্বেদে উপনীত করেন। সুতরাং আত্রেয়কেই অনেক শিষ্যদ্বারা পুনর্বিস্তারক বলা যাইতে পারে। অতএব পুনর্বিস্তারক হেতু পুনর্ব্বসু সংজ্ঞা ভরদ্বাজ অপেক্ষা আত্রেয় প্রতিই সমধিক প্রযোজ্য। পুনর্ব্বসু ও ভরদ্বাজ যদি একই ব্যক্তি হইবেন, তবে চরকসংহিতাতে 'হেতুগভস্য নির্বৃত্তৌ রক্ষো জন্মনি চৈবযঃ। পুনর্ব্বসু মতির্যাচ ভরদ্বাজমতিশ্চ যা।' এরূপ শ্লোক কোন মতেই সম্ভবিতে পারে না। পক্ষান্তরে পুনর্ব্বসু ও ভগবান্ আত্রেয় যে একই ব্যক্তির উপাধি ও নাম তাহা চরকের নানা শ্লোকে প্রতিপন্ন হইতেছে। চরক প্রথমতঃই 'ইতিহস্মাহ ভগবানাত্রেয়ঃ' বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করিলে কোনরূপেই পুনর্ব্বসু সংজ্ঞা আত্রেয়তে প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারা যায় না; 'তমেবমুক্তবন্তমগ্নিবেশং ভগবান্ পুনর্ব্বসুরাত্রেয় উবাচ।' চরকে—শারীরস্থানে 'ইত্যগ্নিবেশস্য বচঃশ্রুত্বা মতিমতাংবরঃ। সর্ব্বং যথাবৎ প্রোবাচ প্রশান্তাত্মা পুনর্ব্বসুঃ।'

'যাবন্তঃ পুরুষাস্তাবন্তো লোকা ইতি এবং বাদিনং ভগবন্তং আত্রেয়মগ্নিবেশ উবাচ।' 'সর্ব্বশরীর সংখ্যানপ্রমাণজ্ঞান হেতোর্ভগবন্তমাত্রেয়ং অগ্নিবেশঃ পপ্রচ্ছ। তমুবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ শৃণুমত্তোঽগ্নিবেশ **'

চরকে।

এবংবিধ বহুপ্রয়োগ চরকসংহিতায় ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সুতরাং পুনর্ব্বসু ও আত্রেয়ের একত্ব ও ভরদ্বাজের বিভিন্নত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় তিষ্ঠিতে পারেনা। তবে আয়ুর্ব্বেদপারদৃশ্বা শিবদাস যে কেন প্রাগুক্তরূপ ভ্রমাত্মক টীকা লিখিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় বড় কঠিন হইবে না। যিনি আমাদের দেশের হস্তলিখিত প্রাচীনগ্রন্থ পাঁচ সাত খানা পড়িয়াছেন তাঁহাকে এবিষয়ে আর বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবেকনা। 'তিন নকলে আসল খাস্তা' একথা বোধ হয় অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন; আমাদের বোধ হয় কোন প্রাচীন লেখক লিখিতে লিখিতে ভ্রান্ত বা উন্মনস্ক হইয়া 'পুনর্ব্বসুরাত্রেয়ঃ' স্থানে 'পুনর্ব্বসুঃ ভরদ্বাজ' লিখিয়া ফেলিয়াছেন; অথবা যিনি বক্তা তিনিই আত্রেয় স্থলে ভরদ্বাজ বলিয়া লেখককে ভ্রমপ্রণোদিত করিয়াছেন। কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহা শিবদাসের ভুল না বলিয়া কেন আমরা এরূপ কষ্টকল্পনা করিতেছি, তদুত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে

সত্য বটে 'মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ', তথাপি এস্থলে শিবদাসের ভ্রম হওয়া অপেক্ষা লিপিকরদিগের ভ্রম হওয়াই অধিক সম্ভবপর।

ভগবান্ আত্রেয় ও ধন্বন্তরির ন্যায় একখানা সংহিতা প্রণয়ন করেন। কিন্তু বাঙ্গালাতে এই গ্রন্থ অতীব দুষ্প্রাপ্য। পশ্চিম ভারতবর্ষে বোম্বাই অঞ্চলের সেনেউ * দিগের এই পুস্তকই চিকিৎসা ব্যবসায়ের প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থ ছয় পুস্তকে বিভক্ত ও পনর শত শ্লোকাত্মক। প্রত্যেক পুস্তক আবার কএক অধ্যায়ে বিভক্ত; অধ্যায়সংখ্যা সকলপুস্তকে সমান নহে। ভগবান আত্রেয়, এই গ্রন্থে জল, বায়ু, ঋতু, বয়স ও প্রকৃতির সহিত মানব শরীরের সম্বন্ধ ও ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জল, দুগ্ধ, ইক্ষুরস প্রভৃতি দ্রবদ্রব্যের গুণাগুণ ও নানা প্রকার ওষধিতরুধর্ম্ম ও বহুবিধ অরিষ্টের ক্রিয়া ও উপযোগিতা অতিসংক্ষেপে অথচ সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপরে চিকিৎসা প্রণালীর উপদেশ দিয়া সর্ব্বশেষে ওষধি বিশেষের প্রতিক্রিয়ার উপায় (Antidotes) নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহাকে 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' নাম দেওয়া যাইতে পারে।

ভরদ্বাজকৃত কোন সংহিতা ছিল কি না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, থাকিলেও সম্প্রতি লুপ্ত হইয়াছে। ভরদ্বাজ ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ লাভ করেন এরূপ প্রথিত আছে। তিনিই আত্রেয়কে এই শাস্ত্রে উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণসমাজে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের মূল কারণ হয়েন। এই ভরদ্বাজ, এবং কাব্য ও নাট্যশাস্ত্রসংহিতাকার ভরদ্বাজ, একই ব্যক্তি কি না নিশ্চয় করিবার কোনও উপকরণ নাই। যদি নাটকাভিনয়ের উপদেষ্টা ভরদ্বাজ বাল্মীকির সমসাময়িক হন, তবে ইহাদিগকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কারণ আয়ুর্ব্বেদোপদেষ্টা ভরদ্বাজ মনুর সুতরাং বাল্মীকির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী।

* 'সেনেউ বোম্বাই অঞ্চলের বৈদ্যদিগের উপাধি আচারব্যবহার প্রায়ই ব্রাহ্মণবৎ'। কিন্তু তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সহিত আদান প্রদান করেন না, অথচ এক পঙ্ক্তিতে আহারাদি করেন। বোধ হয়, ইহারা সেনবংশীয় বৈদ্য হইবেন।

ভালমানুষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গতবারে দেখান হইয়াছে যে, স্বার্থ-ত্যাগ ও প্রলোভন-জয় যে ‘ভাল-মানুষের’ ব্রত, সেরূপ ভাল-মানুষ সংসারে থাকিয়া হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেই এরূপ বলা হইল না যে সংসার-ত্যাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায়। সংসার-ত্যাগে ভাল-মানুষ হওয়া যায় কিনা তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। আমরা নিম্নে এই প্রশ্নের যথাসাধ্য মীমাংসা করিব।

এই প্রশ্নের মীমাংসা কালে, আমরা শুদ্ধ যুক্তির উপর নির্ভর না করিয়া প্রধানতঃ ইতিহাসের সাহায্য অবলম্বন করিব। পৃথিবীর অতি আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা ‘ভাল-মানুষ’ হইবার আশায় কখন বা একক, কখন বা দলে দলে সংসার-ত্যাগ করিয়াছে। গ্রীসের সিনিক (Cynics) রোমের ষ্টোইক্ (Stoics) ইউরোপের ভিক্ষুক পাদ্রী এবং সর্ব্বশেষে ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী, যতী, ভিক্ষু প্রভৃতি এইরূপ সংসারত্যাগীর দৃষ্টান্ত। ইহাদের সংসার-ত্যাগে কি ফল হইয়াছিল বা হইতেছে আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিব।

১মতঃ ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় একরূপ সংসার-ত্যাগী। ইহকালের সুখ দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। এসকল বিস্মৃত হইয়া পরকালের উপায় কর, ইহাই ভারতবর্ষের প্রধানতম শিক্ষা। আজি যে এই পাশ্চাত্য স্রোত এত প্রবল হইয়া বহমান হইতেছে, আজি যে এই ধর্ম্ম-সংস্কার নব-বাঙ্গলায় এক প্রকার বিলুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিতেছে, ইহার মধ্যেও সাংসারিক সুখ দুঃখে অবহেলা দেখিতে পাওয়া যায়। সাংসারিক সুখ দুঃখ ক্ষণ-বিধ্বংশী। এই উপদেশ ভারত-বর্ষের আবাল বৃদ্ধের হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া রহিয়াছে। সুতরাং সংসার-ত্যাগীর অনুসন্ধান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু ভারত-বর্ষের ইতিহাস নাই। সুতরাং ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত কেহ শুনিবে না। নতুবা দেখাইতাম যে, তপশ্চরণশীল, গলিতপত্রভোজী, গ্রীষ্মে ‘পঞ্চতপকারী’ শীতে তরাগ-বাসী মুনি ঋষিরাও স্বর্গবেশ্যার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত জপ তপ ত্যাগ করিতেন। নতুবা দেখাইতাম যে,

ভরত-রাজা রাজ্যস্বজন ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিতে করিতে এক মৃগ-শিশুতে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। নতুবা দেখাইতাম যে দুর্ব্বাসা, বিশ্বামিত্র, অষ্টাবক্র প্রভৃতি ঋষিরা সর্ব্বত্যাগী হইয়াও রিপুজয়ে অসমর্থ ছিলেন। নতুবা দেখাইতাম যে, 'রক্তমাংসের' শরীর বনে গেলেও অল্প বা অধিক পরিমাণে 'রক্তমাংসের' প্রভাব দেখাইয়া থাকে।

কিন্তু আমরা ইউরোপের দাস। ইউরোপের পোষাক না হইলে পরিধান করিতে ইচ্ছা করে না, ইউরোপের খাদ্য না হইলে খাইতে ইচ্ছা করে না, লেখার মধ্যেও ইউরোপের ঢং(Idioms)না থাকিলে পড়িতে ইচ্ছা করে না। আর, ইউরোপ সভ্যতার আকর, জ্ঞান বুদ্ধির রঙ্গভূমি। ইউরোপ উন্নতি-স্রোতের নিদস্থা। ইউরোপ ছাড়িয়া দরিদ্র, পদানত, অর্দ্ধসভ্য ভারতবর্ষের কথা শুনিবে কে ?

ইউরোপে সর্ব্ব প্রথম গ্রীসদেশে সভ্যতার আলোক প্রভাসিত হয়। বহুদিন ধরিয়া জগতের আদি অন্ত প্রভৃতি তত্ত্ব গ্রীসে পর্য্যালোচিত হয়। পরে সক্রেতিসের সময় হইতেই গ্রীসের অবনতির ও সূত্রপাত আরম্ভ হয়। গ্রীস ক্রমশঃই হতবল হইয়া এক শত্রুর পর অন্য শত্রুদ্বারা পদদলিত হইতে থাকে। গ্রীসের বলহানির সঙ্গে সঙ্গেই মানসিক ও নৈতিক অবনতি দেখিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে আলেক্জাণ্ডারের আবির্ভাবের প্রায় বিংশতি বর্ষের পূর্ব্বে গ্রীসের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। ধর্ম্ম বিশ্বাস গুণানুশীলনার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের মন হইতে দূরীভূত হইতেছিল ; নৈতিক শাসন প্রায় কিছুই ছিল না। এই সময়েই আবার এপিকিউরিয়ানেরা (Epicureans) শিক্ষা দিল 'Eat, drink & be merry' 'হেঁসে খেলে কাল কাটাও, মন, মনের সুখে। বহুদিন হইতেই গ্রীসবাসীরা ভোগবিলাসী হইতেছিল। এপিকিউরিয়ানদের নীতি-উপদেশে ভোগ-বিলাসের শিখা আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। গ্রীসবাসীরা বিমুক্তরজ্জু বলীবর্দ্দের ন্যায় পাপের পথে অপ্রতিহত বেগে চলিতে লাগিল।

এই সময়ে জিনো (Zeno) নামে এক মহাত্মা গ্রীসে আবির্ভূত হয়েন। তিনি গ্রীসকে পুনরায় নীতির পথে ও ধর্ম্মের পথে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংসারে থাকিয়া নীতি-শিক্ষা হয় না। সুতরাং জিনো শিক্ষা দিলেন—'সাংসারিক বিপদে অভিভূত হইও না ; সাংসারিক সম্পদে অভিমান করিও না ; এই যে সমস্ত সাংসারিক ঐশ্বর্য্য দেখিতেছ এ সমস্ত বাজিকরের খেলা, সমস্ত নাট্যশালার অভিনয়। এ সমস্তে চিত্ত নিয়োজিত করিও না। নৈতিক উন্নতি মনুষ্য জীবনের প্রধান লক্ষ্য। যাহাতে সেই লক্ষ্য সুচারুরূপে সংসাধিত হয় সেই চেষ্টা কর ; সংসারে থাকিতে চাও থাক কিন্তু সংসারী হইও না ; কারণ

সংসারী হইলে রিপু-জয় করিতে পারিবে না।' গ্রীস এ উপদেশ শুনিল। (কারণ উপদেশ-দাতার অভাব কোথায়? এই যে ভারতবর্ষ এত অবনত,ইহাতেই কি উপদেশ-দাতার অভাব আছে? প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচক জানেন যে এ অভাব ভারতবর্ষে—বাঙ্গালায—অতি অল্প) কিন্তু গ্রীসের তখন উচ্ছেদ-দশা উপস্থিত। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' গোবিন্দলালের ন্যায় গ্রীসবাসীরা ক্রমশঃই পাপের পথে অগ্রসর হইতেছিল। পাপী কবে ধর্ম্মের কাহিনী শুনিয়াছে? সুতরাং জিনোর মত গ্রীস ছাড়িয়া রোমে যাইয়া আশ্রয় লইল। তখন রোম উন্নতির অভিমুখে নব অনুরাগের সহিত ধাবমান। রোম শুনিবা মাত্রই, জিনোর মতকে আদরের সহিত স্বদেশে স্থান দিল। ক্রমে রোমীয় প্রধান লোকেরা সকলেই জিনোর মত অবলম্বন করিল।

জিনোর মত রোমে কিছুকাল রাজত্ব করিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি অতি অল্পমাত্রই সংসাধিত হইল। মনুষ্য তাহার মনুষ্যত্ব ছাড়িতে পারিল না। দেবতা হইবার আশয়ে কিছুকাল অসাধারণ পরিশ্রম ও মনঃকষ্ট স্বীকার করিয়া মনুষ্য পূর্ব্বের ন্যায় রিপুর অধীন হইতে লাগিল। সয়তান ও তাঁহার চিরবিশ্বস্ত পরিচারকেরা পুনরায় মনুষ্য-মনে স্বরাজ্য সংস্থাপন করিল। বামন কিছুকাল প্রাংশুলভ্য ফলের আশয়ে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পুনরায় বস্তি অবলম্বনে সাধারণ ভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল।

মনুষ্য ভাল মানুষ হইতে পারিল না বটে, কিন্তু ভাল মানুষ হইবার আশা তাহার হৃদয় হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইল না। মনুষ্য বুঝিল যে শুদ্ধ সংসার-ত্যাগে ভাল মানুষ হওয়া যায় না। ভাল মানুষ হইবার আশায় মনুষ্য আর একবার সংসার ত্যাগ করিল। কিন্তু এবার শুদ্ধ সংসার ত্যাগের উপর নির্ভর না করিয়া মনুষ্য জগদীশ্বরের সাহায্য অবলম্বন করিল। সংসার ত্যাগ করিব এবং সংসার ত্যাগ করিয়া মহান্ প্রেমপূর্ণ ঈশ্বরের পদে বলুণ্ঠিত হইব, ভাল-মানুষত্ব-লোভীরা এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লইল।

ইউরোপে যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সংসার হইতে বিদায় লন, খ্রীষ্টীয় ভিক্ষুক পাদ্রী (Pater) তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। সাংসারিক চিন্তা-সমূহের মধ্যে দুইটি প্রধান। প্রথম অন্নচিন্তা, দ্বিতীয় পরিবার প্রতিপালন। খ্রীষ্টীয় পাদ্রী, ধর্ম্মশাসনের দোহাই দিয়া, সমাজ হইতে অন্নের যোগাড় করিয়া লইলেন। দ্বিতীয় চিন্তাও খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর ছিল না। কারণ খ্রীষ্টীয় পাদ্রী দারশূন্য। বিষয় স্পৃহা একবারে ত্যাগ করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় পাদ্রী আর এক উপায় অবলম্বন করিল। সে শিক্ষা দিল যে একজনের পাপ অন্যে হরণ করিতে পারে। কিন্তু এইরূপ পাপ হরণের ক্ষমতা সকলের নাই।' যাঁহারা সংসারত্যাগী ও অলোভী, শুদ্ধ তাঁহারাই

এই ক্ষমতা লইতে পারিতেন। সুতরাং সংসারত্যাগী খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর দুই মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

১ম। ভাল মানুষ হইয়া নিজের মুক্তি সাধন। অলোভী হইবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা আমাদের উচিত, খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর সে সমস্ত ছিল। তিনি অন্যের অন্নে প্রতিপালিত। তিনি গৃহশূন্য, জাতিশূন্য ও সমাজশূন্য। সংসারত্যাগে বিতৃষ্ণতা উৎপাদন করিবার জন্য খ্রীষ্টীয় পাদ্রী অন্য অন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিয়াছিল।

কিন্তু এ সকল করিয়াও খ্রীষ্টীয় পাদ্রী ভাল মানুষ হইতে পারিয়াছিল কি? উদ্দেশ্য মহৎ, উপায় অমোঘ, কিন্তু কার্য্য উদ্দেশ্য ও উপায়ের অনুযায়ি হইয়াছিল কি? যাঁহারা Froude's History of England পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে অনেকস্থলেই খ্রীষ্টীয়পাদ্রীর নৈতিক উন্নতি অতি সৎসামান্য হইয়াছিল। যাঁহারা Confessions of Maria Monk পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন মঠধারী খ্রীষ্টীয় পাদ্রীরা তাড়কেশ্বরের মোহন্ত ও তাঁহার অনুচরবর্গ হইতে পাপাচরণে অধিক বড় ছিলেন না।

যদি সংসার ত্যাগ করিয়া কাহারও ভাল-মানুষ হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে তাহা এ পাদ্রীদের ছিল। বাহির হইতে দেখিতে খ্রীষ্টীয় পাদ্রীর জীবন অতীব রমণীয়। মাসে মাসে, দিনে দিনে, ক্ষণে ক্ষণে, খ্রীষ্টীয় পাদ্রীরা নব নব ধর্ম্মালোচনা আবিষ্কার করিত। জন্ম, মৃত্যু, সমাধি প্রভৃতি নিত্য কার্য্য সমূহে নব নব ধর্ম্মপ্রণালী প্রদর্শিত হইত। এতদ্ভিন্ন, রোগীর শুশ্রূষা, আর্ত্তের সহায়তা, দরিদ্রের অর্থানুকূল্য, মুমূর্ষুর সান্ত্বনা, পীড়িতের সেবা প্রভৃতি কার্য্য কাথলিক পাদ্রীর নিত্যব্রত ছিল। কিন্তু এ সকল উদ্দেশ্য, এবং এ সকল উপায় এত মহৎ ও এত প্রবল হইলেও পাদ্রীরা নৈতিক উন্নতির পথে অতি অল্পদূর মাত্রই অগ্রসর হইয়াছিল। Burns (বারনস) এক প্রকার আহ্লাদের সহিত বলিয়াছেন 'A man is a man for all that' আমরা আক্ষেপের সহিত বলি—'A man is a man for all that'*.

পূর্ব্বে এক প্রকার দেখান হইল যে সংসার ছাড়িলেও ভাল-মানুষ হওয়া যায় না। তবে কি স্থির করিতে হইবে যে মনুষ্য কোন অবস্থাতেই ভাল-মানুষ হইতে পারে না। এই মহামূল্য তত্ত্ব দেখাইবার জন্যই কি হাবড়হাটি লিখিয়া নিজের ও পাঠকের শিরঃপীড়া উৎপাদন করিতেছিলাম? যদি শুদ্ধ এই মাত্রই আমার উদ্দেশ্য হয়, যদি বীভৎস মানব-চরিত্রে আর একটি কলঙ্ক দেখান আমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে এ প্রস্তাব না লিখিলেই ভাল হইত। 'আমরা কখন ভাল মানুষ হইতে পারি না,' ইহা সত্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু ইহা কাহাকেও

* সমস্ত (সম্পদ, বুদ্ধি, সৌন্দর্য্য) সত্ত্বেও মনুষ্য মনুষ্য-মাত্র

যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া শিখাইবার প্রয়োজন নাই। তবে আমার উদ্দেশ্য এই মনুষ্য যদি ভাল-মানুষত্ব রূপ আকাশকুসুমের অনুসন্ধান না করিয়া যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে মানসিক প্রবৃত্তি, ও তদনুযায়ি চরিত্র গঠনের আলোচনায় চিত্ত নিয়োজিত করে, যদি সকলেই এক প্রকারের ভাল-মানুষ হইবার চেষ্টা না করিয়া নিজ২ প্রকৃতি অনুসারে ভাল-মানুষত্ব অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে, তাহাহইলেও অনেক মনস্তাপ, অনেক মর্ম্মভেদী যাতনা, অনেক সাংসারিক অকুশল পৃথিবীহইতে দূরীভূত হয়।

প্রাণিজগতের ইতিহাস।

প্রাণিবৃত্তান্ত প্রকৃতি জগতের এক অত্যাশ্চর্য্য উপন্যাস, এবং বিজ্ঞানভাণ্ডারের এক অতুল সম্পত্তি। প্রকৃতির আদি নাই, অন্ত নাই, এবং চিন্তার অতি প্রশস্ত ক্ষেত্রেও ইহার যথেষ্ঠ স্থান নাই। এই যে অনন্ত সমুদ্র, অনন্তের তুলনার জন্য কবি-কল্পনার এক মাত্র উপমান, ইহাও প্রকৃতি-জগতের একটি যৎসামান্য অংশ মাত্র; কে তবে ইহার ইয়ত্তা করিবে, অথচ এই বিশাল দৃশ্য সম্মুখে রাখিয়া কেই বা অন্ধের ন্যায় চক্ষু মুদিয়া রহিবে? মনুষ্যের গবেষণার জন্য ইহা হইতে প্রশস্ততর ক্ষেত্র আর নাই—মনুষ্যের তৃপ্তির জন্য ইহা হইতে অধিকতর উপাদেয় সামগ্রীও কুত্রাপি সম্ভবে না। যাঁহারা নিভৃতকক্ষের অপবিত্র বায়ু সেবনে হৃৎপীড়ায় কাতর হইয়া নৈসর্গিক বায়ু সেবন করিতে অভিলাষী হয়েন, যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন শান্তিনিকুঞ্জে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখক্লিষ্ট হইয়া স্বভাবের বৈচিত্র দেখিতে চাহেন, এবং যাঁহারা কবিকল্পনার তরল আমোদে পরিতৃপ্তি উপভোগ না করিয়া প্রকৃতির রম্য উপবনে ভ্রমণ করিতে সুখানুভব করেন, উল্লিখিত প্রকৃতি-তত্ত্বের পর্য্যালোচনা অপেক্ষা তাঁহাদের সুখের ও আশার মহত্তর কোন সামগ্রী থাকিতে পারেনা। এ তত্ত্ব সহজ নহে ও সামান্য নহে এবং মনুষ্যের ক্ষণব্যাপি জীবনও ইহার গবেষণার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ প্রকৃতির বিভাগানুসারে আপনাদের কার্য্যেরও বিভাগ করিয়া নিয়াছেন। প্রকৃতি দুইভাগে বিভক্ত, চেতন ও অচেতন। এই চেতন আবার প্রাণী ও উদ্ভিদ এই শ্রেণীদ্বয়ে অংশীকৃত। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সৃষ্টি ও স্থিতির মূলানুসন্ধানের নামই প্রাণিতত্ত্ব। যাঁহারা জড় জগতের নির্জ্জীবতায় কোনরূপ আমোদ অনুভব করেন না, উড্ডীয়মান ও উৎপ্লবমান প্রাণিবৃন্দের প্রকৃতি অবগত হইতে তাঁহাদেরও কৌতূহল জন্মে। এই বিস্তীর্ণ জগত অসংখ্য প্রাণিমণ্ডলের আবাস-স্থল। এমন সূচাগ্র পরিমিত ভূমি স্পর্শ করিতে



হস্তী।

ভূমণ্ডলে হস্তীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জন্তু, এবং বহুকাল হইতে মানবজগতে বিশিষ্ট-রূপে পরিচিত। যদি শতসহস্র বৎসরের পুরাতন হিন্দুশাস্ত্র পাঠ কর, তবে সেখানেও প্রমাণ পাইবে যে এই জন্তু দীর্ঘকাল হইতেই মনুষ্যের ব্যবহারে আনীত হইয়াছে। দ্বাপরযুগে কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধাদির সময়ও হস্তীর ব্যবহারের সবিশেষ প্রমাণ পরিলক্ষিত হইবে। ত্রেতাযুগের রামায়ণাদি গ্রন্থেও অনেক স্থানে হস্তীর বিষয় উল্লিখিত রহিয়াছে। এবং এতদপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদাদিতেও হস্তী সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে। অতএব আমরা এই সমস্ত কারণে, এই প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড জন্তুর ইতিহাস সর্ব্বপ্রথমে লিখিতে আরম্ভ করিলাম।

ইহাদের বন্যস্বভাব, গৃহাগত হইলে স্বভাবের বৈপরীত্য এবং আধুনিক যে যে প্রণালীতে উহাদিগকে আবদ্ধ করা যায়, তাহার সমস্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত হইল।

হস্তী-শরীরের উচ্চতা সাধারণতঃ ৭ ফিট হইতে ১২ ফিট পর্য্যন্ত, কিন্তু ৯।১০ ফিটের অধিক উচ্চ হস্তী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের ৪টি পাই স্থূল এবং স্তম্ভের ন্যায় গোল। সম্মুখের পা হইতে পাছের পাগুলি কিছু খর্ব্ব। সম্মুখের পায়ে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশটি নখ এবং পাছের দুই পায়ে ৪টি করিয়া ৮টি নখ। কিন্তু সমুদয় নখগুলি সমান অবয়ববিশিষ্ট নহে। মধ্যের গুলি কিছু বড় এবং অন্যান্যগুলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া গিয়াছে।

ইংরাজী বহুবিধ প্রাণিবৃত্তান্তে দেখা যায় হস্তীর চারিটি পায়ের প্রত্যেক পায়ে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি থাকে। বাঙ্গলাভাষায় যে কএকখানি সামান্য আকারের প্রাণি-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও ঐরূপ লিখিত। কিন্তু আমরা বহু হস্তী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কোন হস্তীরই ১৮টি নখের অধিক পাইলাম না। সুতরাং অন্যের কথার উপর নির্ভর না করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই যথাযথ বিবৃত করিলাম। আমি শুনিয়াছি, কদাচিত কোন হস্তীর বিশটি নখ দেখা যায়।

হস্তীর শরীরের বর্ণ গাঢ় ধূসর; যতই ইহাদিগের বয়োবৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই কপালের এবং কর্ণের অপর পৃষ্ঠের চর্ম্মগুলি বিন্দু বিন্দু করিয়া শুভ্র বর্ণ হইয়া যায়। এবং কোন কোন হস্তীর এই সমস্ত

স্থান এত অধিক ধবলবর্ণ হয় যে, যখন তাহার উপর কোনরূপ ময়লা পড়িয়া না থাকে, তখন সেই চর্ম্ম হস্তীর এক শরীরের চর্ম্ম বলিয়াই অনুমিত হয় না। দূর হইতে এইরূপ হস্তীগুলিকে বড় সুন্দর দেখায়।

হস্তীর লাঙ্গুল প্রায় ৩ফিট দীর্ঘ ও নিম্নগামী; উহার অগ্রভাগে একগোছা মোটা চুল সন্নিবিষ্ট আছে, কিন্তু তাহা লাঙ্গুলের চতুর্দ্দিক জড়াইয়া নহে, দুই পার্শ্বে। এই কারণেই স্থূলদৃষ্টিতে লাঙ্গুলের অগ্রভাগটি চেপ্টা বলিয়া বোধ হয়। শরীরের অন্যান্য স্থানও মোটা মোটা লোম দ্বারা আবৃত। কিন্তু সেইগুলি এত দূর-সন্নিবিষ্ট যে, নিকট হইতে না দেখিলে ভাল করিয়া দেখা যায় না। ইহাদের শরীরের বর্ণের সঙ্গে চুলের বর্ণ একেবারে মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং বোধ করি চুলগুলি লক্ষিত না হইবার ইহাও একটি কারণ। মাথার উপরে যে সমস্ত চুল আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ঘন ও দীর্ঘ এবং স্থূল-দৃষ্টিতেই দৃশ্যমান।

হস্তীর মস্তকের গঠন অতি আশ্চর্য্য। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। দুইটি কুম্ভ একত্র করিয়া উল্টাইয়া রাখিলে উহাদের উপরিভাগ যেরূপ দেখা যায়, হস্তীর মাথার উপরও ঠিক সেইরূপ। এইজন্য প্রাচীন কবিরা উহাদিগকে করিকুম্ভ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে দুইটি সুগোল বস্তুর উপরে কাপড় দিয়া কসিয়া ধরিলে, উহার উপরিভাগ যেরূপ দেখায়, হস্তীর মাথার উপরিভাগও ঠিক সেইরূপ।

কপালের মধ্যস্থানে গোল একটি উচ্চ স্থান আছে, উহাকে ইদানীন্তন হস্তীরক্ষকেরা 'পিতোয়ান' কহে। (বাঙ্গলায় ইহার আর কোন প্রতিশব্দ নাই, এই শব্দটিই বেশ্ প্রচলিত)। এই স্থান হইতে শুণ্ডনামক হস্তীশরীরের একটি আশ্চর্য্য প্রত্যঙ্গ বাহির হইয়াছে। হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন উহা হস্তীর অস্বাভাবিক অতিরিক্ত একটি প্রত্যঙ্গ, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ শুণ্ড মুখের উপরিস্থ ঠোঁট এবং নাসিকার অত্যাশ্চর্য্য অপরিমিত বর্দ্ধিতাংশ। হস্তীর স্কন্ধদেশ অত্যন্ত খর্ব্ব; সুতরাং সম্মুখ ব্যতিরেকে অন্য কোন দিকে একেবারে সর্ব্বশরীর না ফিরাইয়া কিছুই অবলোকন করিতে পারে না। এবং ঐকারণে অন্যান্য পশুর ন্যায় ঘাড় নোয়াইয়া মৃত্তিকা হইতে আহার্য্য বস্তু তুলিয়া লইতেও ইহারা অক্ষম। কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধা উহার একমাত্র শুণ্ডই নিবারণ করিতেছে। হস্তী যখন শ্লথভাবে শুণ্ড ছাড়িয়া দেয়, তখন শুণ্ডের অগ্রভাগ মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়াও অর্দ্ধ হস্ত পরিমাণ ভূমিতে গড়াইয়া রহে, কিন্তু আবার বক্র করিয়া সংকোচন করিলে মৃত্তিকা হইতে প্রায় দুই হস্ত উর্দ্ধে থাকে।

শুণ্ড ইহাদের পক্ষে যে কত উপকারী তাহা বলিয়া শেষ করাযায় না, এমন কি উহা না থাকিলে কোন প্রকারে উহারা

যে জীবনধারণ করিতে পারিত এমন সম্ভাবনা ছিল না। হস্তী ইচ্ছামত শুণ্ডকে এদিক সেদিক ঘুরাইতে পারে। এবং ইহা দ্বারা বৃক্ষাদির শাখা ভাঙ্গিতে, মৃত্তিকা হইতে ঘাস তুলিয়া খাইতে এবং প্রয়োজন হইলে শত্রু বিতাড়িত করিতে অক্লেশে সমর্থ হয়। শুণ্ডের অগ্রভাগে বাহিরের দিকের মধ্যস্থলে, অঙ্গুলির ন্যায় প্রয়োজনসাধক একটি সূক্ষ্মাগ্রভাগবিশিষ্ট বর্দ্ধিত চর্ম্ম আছে। উহা দ্বারা অতি সূক্ষ্ম বস্তু, এমন কি সিকি আধুলি প্রভৃতিও অতি সহজে উঠাইয়া লইতে পারে। শুণ্ড যখন নাসিকা ও উপরিস্থ ওষ্ঠের বর্দ্ধিতাংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তখন নাসারন্ধ্র ও যে উহার মধ্য দিয়া মস্তিষ্ক স্পর্শ করিয়াছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। জলপান করিবার সময়েও ইহারা শুণ্ডদ্বারা জলপান করিয়া থাকে। জলের মধ্যে শুণ্ডের অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া দিয়া জল আকর্ষণ পূর্ব্বক শুণ্ডকে বাঁকাইয়া নিয়া মুখের মধ্যে জল ছাড়িয়া দেয়, এবং যে পর্য্যন্ত পিপাসার নিবৃত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত এইরূপে জল আকর্ষণ করিয়া নিয়া মুখের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে থাকে! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যবীজ (ধান চিনা প্রভৃতি) খাইতে হইলেও ঐরূপ শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করিয়া মুখের ভিতরে ছাড়িয়া দেয়। শরীরের কোন স্থান চুলকাইলেও শুণ্ড দ্বারা একখণ্ড কাষ্ঠধরিয়া শরীর চুলকাইয়া লয়। বলিতে কি মনুষ্যেরা শরীর সম্পর্কে যে যে কার্য্য হস্তদ্বারা সম্পাদন করে, হস্তী শুণ্ড দ্বারাই সেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। প্রাচীন কালের শব্দস্রষ্টা পণ্ডিত মহাশয়েরা বোধ হয় করিশুণ্ডের এইরূপ ব্যবহার দেখিয়াই উহার নাম 'কর' রাখিয়াছিলেন, ইদানীংও মাহুতেরা শুণ্ডকে হস্তীর হাত বলিয়া থাকে। হস্তীর শরীরের আকার যেরূপ প্রকাণ্ড, চক্ষুর অবয়ব তেমনি আবার ক্ষুদ্র। ইহারা সর্ব্বদাই চক্ষুর জন্য ব্যতিব্যস্ত। কোনপ্রকারে চক্ষুর মধ্যে ক্ষুদ্র কীটাদি প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য ইহারা সর্ব্বদা কর্ণকে বিলোড়ন করিয়া চক্ষু রক্ষা করিয়া থাকে।

হস্তীর কর্ণদ্বয় অত্যন্ত বৃহৎ, আকারে প্রায় আমাদের দেশীয় শূর্পের ন্যায়। ইহারা ইচ্ছামত ইহাকে সম্মুখে ও পশ্চাদ্দিকে সঞ্চালন করিতে পারে।

হস্তীর নিম্নের ঠোঁট অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ইহা শুণ্ডের শতাংশের একাংশও কার্য্যোপযোগী নহে। উহার আকৃতি ইংরাজী, V অক্ষরের ন্যায়। অর্থাৎ মাড়ির অর্দ্ধহস্ত পরিমিত প্রশস্ত স্থান হইতে দীর্ঘেও অর্দ্ধহস্ত পর্য্যন্ত ক্রমশঃ সরু হইয়া নামিয়াছে। আহার্য্য বস্তু মৃত্তিকায় পড়িতে না দেওয়াই নিম্নঠোঁটের প্রধান কার্য্য। হস্তীর জিহ্বা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও স্থূল। মুখহইতে উহা বাহির হইতে পারে না এবং অন্যান্য পশুর ন্যায় কোন বস্তু লেহন করিতে সক্ষম হয় না। হস্তীর সম্মুখের কোন পাটিতেই দন্ত নাই, কেবল মাত্র মাঢ়ীতে

দুই দিকের উপরে ও নীচে ছয়টা করিয়া পেষক দন্ত আছে। এই দন্ত ব্যতীতও পুং হস্তী গুলির শুণ্ডের দুইপার্শ্ব দিয়া অতি প্রকাণ্ড দুইটি দন্তের ন্যায় দুইটি গোল অস্থি নির্গত হয়। কোন কোন হস্তীর এই অস্থিগুলি ৭।৮ ফিট পর্য্যন্ত দীর্ঘ ও দেড় ফিট পর্য্যন্ত পরিধি বিশিষ্ট দেখা গিয়াছে। এই দুইটি হাড়কেই আমরা গজদন্ত বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই দুইটির সঙ্গে হস্তীর যথার্থ দন্তের কোন সম্পর্কই নাই। ইহা দন্ত হইলে অবশ্য মাড়ি হইতে নির্গত হইত, কিন্তু ইহার নির্গমন স্থল মাড়ি নহে। হস্তীর কপালের হাড় হইতে চক্ষুর নিম্নে এই অস্থি উৎপন্ন হয়; এবং শুণ্ডের ভিতর দিয়া একটি ছিদ্র দ্বারা উহা বাহির হইয়া পড়ে। যদি কেহ ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চাহেন, তবে একটি হাতীকে মুখ ব্যাদন করিয়া দেখিলেই সকল সন্দেহ দূর হইবে। এই বার আমরা হস্তীর করোটির আকৃতি প্রকাশ করিতে পারিলাম না, সময়ান্তরে পাঠকসমীপে উপস্থিত হইলে, তখন হস্তীর দন্ত সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইব। যাহা হউক এক্ষণ আমরা উহাকে গজদন্ত বলিয়াই উল্লেখ করিব। এই গজদন্তের বহির্ভাগ নিরেট এবং যে খানি চর্ম্ম ও মাংসাবৃত সেই খানিই শূন্যগর্ভ।

হস্তিনী গুলিরও মধ্যে মধ্যে এইরূপ দন্ত নির্গত হইয়া থাকে, কিন্তু উহা হস্তীর দন্তের এক দশমাংশও স্থূল ও দীর্ঘ নহে। এবং সর্ব্বদাই নিম্নমুখী।

হস্তিনী আঠার মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক কালে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে। হস্তিনীর বক্ষস্থলে দুইটি স্তন আছে, যে পর্য্যন্ত উহারা গর্ভবতী না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহাদের স্তনদ্বয় ভালরূপ দেখা যায় না। প্রসবকাল যতই নিকটবর্ত্তী হয় স্তনযুগল ততই স্ফীত হইতে থাকে। হাতীর দুগ্ধ অতিশয় পাতল; কলেবরের সহিত তুলনায় স্তন যুগলও অত্যন্ত ক্ষুদ্র।

আমাদের আর্য্য ভাষায় হস্তিশাবকে করভ কহে। করভের শরীরের বর্ণ—ধূসরের উপরে একটুকু রক্তিমাভ; মুখের মধ্যে এবং শুণ্ডের অগ্রভাগে জন্মকালের কিছুদিন পর পর্য্যন্ত মেটে সিন্দুরের ন্যায় লাল থাকে। প্রসবের অব্যবহিত পরেই করভেরা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে, এবং মুখ দিয়া মাতৃদুগ্ধ চুষিয়া খায়। পূর্ণাবয়ব হস্তী যেমন শুণ্ডদ্বারা পানীয় আকর্ষণ করিয়া লয়, করভেরা সেইরূপ করে না; তাহারা তাহাদের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময় শুণ্ডটি ঊর্দ্ধে উঠাইয়া অন্যান্য পশুর মত মাতৃস্তন মুখে লয়, এবং চুষিয়া চুষিয়া দুগ্ধ পান করে। করভগুলি সর্ব্বদা উহাদের মাতার নিকটে নিকটে থাকে, মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যত্র গমন করে না। বৃদ্ধগুলি জলে নামিবার সময়ও উহারা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া সন্তরণ করে, এবং পরিশ্রান্ত হইলে মাতৃপৃষ্ঠে ভর করিয়া বিশ্রাম করে।

হস্তিজাতি অপরিসীম বলশালী। বহুতর লোক একত্র হইয়া যে বস্তু একটুকুও নাড়িতে না পারে, হস্তী অবলীলাক্রমে সেই বস্তু লইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে এই জগতে হস্তীর ন্যায় বলশালী অন্য কোন জন্তু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহারা অত্যন্ত বলশালী হইলেও স্বভাবতঃ ভীরু এবং মৃদুল। এমন কি, কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর শব্দ শুনিলেই অমনি ভয়ে জড়সড় হইয়া পলায়ন করে, এবং পলাইবার সময়ে সম্মুখে প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি থাকিলেও ভাঙ্গিয়া পথ করিয়া যায়।

হস্তী সর্ব্বদা দলবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে। হস্তীর দলের মধ্যে কখন কখন একশত হস্তীর অধিক ও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাতে একটির অধিক দুইটি পুংহস্তী সচরাচর দেখা যায়না। পুংহস্তীগুলিকে সাধারণ ভাষায় 'গুণ্ডা' বলিয়া থাকে। যদি অকস্মাৎ সেই দলে অন্য একটি গুণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন উভয়ের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধারম্ভ হইয়া থাকে, এবং সেই যুদ্ধে যে জয়লাভ করে, সেই ঐ দলের দলপতি হইয়া পড়ে, এবং অপরটি পলাইয়া যায়। দলের মধ্যে আরও অল্পবয়স্ক পুংহস্তী থাকে বটে, কিন্তু সেই গুলির সঙ্গে বড়টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। এইরূপ অল্পবয়স্ক পুংহস্তীগুলিকে, ইদানীং মাহুতেরা পাঠ্‌ঠা কহে। গুণ্ডাগুলির প্রকাণ্ড দুইটি দন্ত আছে বলিয়াই হস্তীর তথাবিধ বৃহৎ দল হইতে, প্রথম দৃষ্টিতেই উহাদিগকে হস্তিনী হইতে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদি উহাদিগের এইরূপ দন্ত না থাকিত, তবে স্থূলদৃষ্টিতে গুণ্ডাগুলিকে পৃথক করিয়া লওয়া যাইতনা। পুংহস্তীর মধ্যে কোন কোন গুলির ঐরূপ বৃহৎ দন্ত নির্গত হয় না, এই প্রকার পুংহস্তীগুলিকে 'মখনা' কহে। যে কারণে কোন কোন পুরুষের দাড়ি গোপ হয় না, সেই কারণে কোন কোন পুংহস্তীরও দন্ত বাহিরে আইসে না। এই প্রকার পুংহস্তীগুলিও পূর্ব্বোক্ত দলের মধ্যেই যাতায়াত করে।

কোনরূপ ভয়ের কারণ হইলে অল্পবয়স্ক এবং দুর্ব্বল হস্তীগুলিকে মধ্যে রাখিয়া সবলগুলি চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া থাকে। স্থানান্তরে যাইবার সময়ও সবল গুলি অগ্রপশ্চাৎ থাকিয়া দুর্ব্বলগুলিকে মধ্যে রাখে। হস্তীর গতি অতি মনোহর এবং মৃদু। যখন স্বাধীনভাবে নিশ্চিন্তমনে গমন করিতে থাকে, তখন প্রকৃতই বড় সুন্দর দেখায়। প্রাচীন কবিরা হস্তীর মন্থর গমনের সঙ্গে রূপসী কুলকামিনীগণের পাদচালনার তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। হস্তীর গমনের দুই তিনটি বড় আশ্চর্য্য রীতি আছে। প্রথমতঃ, একদল একস্থান দিয়া চলিয়া গেলেও পায়ের বিশেষ কোন শব্দ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অগ্রবর্ত্তী হস্তীটি যেস্থানে পদ নিক্ষেপ করিবে, চলিয়া যাইবে, পশ্চাদ্বর্ত্তীগুলিও ঠিক সেই স্থানে পা ফেলিয়া চলিবে। সুতরাং

বহুসংখ্যক হস্তী এক স্থান দিয়া চলিয়া গেলেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না দেখিলে একটি হস্তী ভিন্ন দুইটি হস্তীর পদচিহ্ন বলিয়া অনুমান করা যায় না। তৃতীয়তঃ, ইহারা কোন জঙ্গলাবৃত স্থান দিয়া চলিয়া যাইবার সময় শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা পদনিক্ষেপোপযোগী স্থান স্পর্শ করিয়া লয়, যদি জানিতে পারে যে এই স্থানে পা ফেলিলে, পায়ে কোনরূপ আঘাত লাগিবে, কিংবা স্থান অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইলে পা বাড়িয়া পড়িবে, তাহা হইলে আর কোন ক্রমেই সেই পথ দিয়া যাইবে না। হস্তী গুলি যখন স্বাভাবিক গতিতে চলিয়া যায় তখন তাহাদের সম্মুখের পা যেস্থানে পড়ে, পাছের পাও ঠিক সেই স্থানেই নিক্ষিপ্ত হয়।

হস্তীর ভীরুতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং উহারা সামান্য ভয়েই যে পলাইয়া যায়, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি; আর একান্তই যদি পলাইবার কোন পথ না দেখে, তবে তাহারা সেই ভয়দর্শকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। উহাদিগের আঘাত করিবার প্রধানতম অস্ত্রই দন্ত, এবং দন্তীগুলিই প্রথমে আসিয়া আক্রমণ করে। যদিও পা এবং শুঁড়ের দ্বারা হস্তিনীগুলি আঘাত করে, কিন্তু তাহা গুণ্ডাদন্তের আঘাতের ন্যায় তত ভয়ানক নহে। দুইটি গুণ্ডার যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দন্তই উহাদের প্রধান শস্ত্র। এতদ্ব্যতিত অন্য কোন সময়ে উহাদিগকে দন্ত ব্যবহার করিতে দেখা যয় না।

হস্তী-জাতির শরীরাভ্যন্তরে স্বভাবতঃ অধিক মাত্রায় বসা আছে, এই জন্যই উহারা অধিক ক্ষণ রৌদ্রের উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। একটু উত্তপ্ত হইলেই জলে গিয়া সর্ব্বশরীর ডুবাইয়া রাখে। হস্তিজাতি অত্যন্ত সন্তরণ-পটু। ক্রমাগত ২।৩ প্রহর কাল তেমন স্রোতস্বতী নদীতেও সন্তরণ করিতে পারে। সন্তরণের সময় উহাদের প্রায় সমস্ত শরীরই জলে ডুবিয়া রহে। কেবল পৃষ্ঠের উচ্চভাগ ও মস্তকের একটু অংশ জলের উপরে থাকে। আবার কখন কখন তাহাও দৃষ্টি-গোচর হয় না। শ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িতে হইলে এক এক বার শুণ্ডটিকে জলের উপর উঠাইয়া লয়।

হস্তীর সর্ব্বাঙ্গে কখনও স্বেদ জল নির্গত হয় না, যদি কখনও অতিরিক্ত মাত্রায় পরিশ্রম করে, ও জলে নামিতে না পায়, তাহা হইলে উহাদিগের পায়ের নখের গোড়া হইতে এক প্রকার জল নির্গত হইতে থাকে। হস্তী-শরীরের ঘর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিতে হইলে উহাকেই বলা উচিত।

উদ্ভিদই হস্তিদিগের একমাত্র আহার্য্য। এবং ইহারা প্রত্যেকেই প্রতিদিন ৪।৫ মণ করিয়া আহার করিতে পারে। যে কোন স্থানে যাইয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই স্থানেই উদরপূরণ অপেক্ষা পদমর্দ্দনাদি হইতে অধিকতর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। ইহারা কিছুই না দেখিয়া খায় না। আ-

হার্য্য বস্তু কোনরূপ দুর্গন্ধ যুক্ত হইলে, তাহা অমনি ফেলিয়া দেয়। শুণ্ডের দ্বারা আহারের জন্য এক বোঝা ঘাস ধরিয়া লইলে তাহা পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে পায়ের মধ্যে এমন করিয়া ঝাড়িতে থাকে যে, উহার অর্দ্ধেক ঘাসও মুখে তুলিয়া দিতে পারে না, সকল গুলিই পড়িয়া যায়। কিন্তু তথাপিও অপরিষ্কার খায় না। কদলী বৃক্ষ, ঘাস, বাঁশপাতা, এবং দানাই ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। শীতকালে যখন ঘাস ইত্যাদি অন্যান্য দ্রব্য খাইতে না পায়, তখন কেবল কদলীবৃক্ষ আহার করিয়া থাকে। কখন কখন বট অশ্বত্থ ও ডুমুর গাছের ডাল ও আহার করিয়া থাকে, কিন্তু ইহাতে যে কি সুখ তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যদি ইহার কেহ কিছু জানেন, তবে জানাইলে বাধিত হইব।

হস্তীর শরীরাভ্যন্তরে পানীয় জল সঞ্চিত রাখিবার জন্য, পাকস্থলী ভিন্ন অন্য একটি স্বতন্ত্র যন্ত্র আছে। শুণ্ড দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া ঐ যন্ত্রটি পরিপূর্ণ করিয়া রাখে, এবং আবশ্যক মত তথা হইতে আবার শুণ্ড দ্বারাই জল বাহির করিয়া লইতে পারে। যদি উহারা রৌদ্রের উত্তাপে উত্তপ্ত হইয়া জলে নামিতে না পায়, অথবা পালিত হস্তীকে কার্য্যানুরোধে যথাসময়ে স্নান করিতে না দেওয়া হয়, তবে সেই যন্ত্র হইতে জল আনিয়া সর্ব্ব শরীরে সিঞ্চন করিয়া দিতে থাকে। হস্তিজাতির অত্যাশ্চর্য্য অপত্যস্নেহ। উহাদের বংশপরম্পরা অবচ্ছিন্ন ভাবে একত্র থাকিলে একে অন্যকে চিনিতে পারে।

হস্তীর বয়ঃকাল ১০০ শত বৎসর। কিন্তু এত দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে আমরা স্বচক্ষে দেখি নাই। শুনিতে পাই ইহা অপেক্ষাও নাকি আরও অধিক দিন ইহারা বাঁচিয়া থাকে। পৃথিবীর দুইটি মাত্র মহাদেশ ইহাদের বাসস্থান, এসিয়া এবং আফ্রিকা। প্রবন্ধের প্রারম্ভে যে হস্তীর প্রতিমূর্ত্তিটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমাদের এসিয়ার হস্তী। ভবিষ্যতে আফ্রিকার হস্তীর প্রতিমূর্তি সহ উহাদের বিবরণ যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহা বিবৃত করিতে যত্নবান থাকিব।

হস্তীর সাধারণ স্বভাব সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত কথা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা এক প্রকার সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা কি মনুষ্যের অপরিসীম বুদ্ধকৌশলে ও অসাধারণ চাতুর্য্যে যে কি প্রকারে এই ভয়ঙ্কর বলশালী প্রকাণ্ডাবয়ব জন্তু ধৃত হইয়া সহস্র প্রকারের কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার বিস্তীর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল। কি প্রণালীতে এই জন্তু অতি প্রথম মনুষ্যের করায়ত্ত হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আজি পর্য্যন্তও জানিতে পারিনাই। আমরা অনুসন্ধানে থাকিলাম, যখনই জানিতে পারিব তখনই সাধারণ সমীপে প্র-

কাশ করিব। ইদানীং ইহাদিগকে যে প্রণালীতে আবদ্ধ করা হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

হস্তী ধরিবার নিমিত্ত এক্ষণ তিনটি প্রণালী প্রচলিত আছে। ইহার একটির নাম পরতালা শিকার, অন্যটির নাম ফাঁসি এবং তৃতীয়টির নাম খেদা শিকার।

১ম। পরতালা শিকার—এই শিকারে কেবল গুণ্ডা হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। ইহাতে কেবল ৩ টি পালিতা কুন্‌কীর আবশ্যক। কুন্‌কী দেখিলে বন্যগুণ্ডা হস্তী দৌড়িয়া পলায়ন করে না, বরং দাঁড়াইয়া থাকে। এই সময় মাহুতেরা দুইটি কুন্‌কীকে গুণ্ডার দুই পার্শ্বে এমন ভাবে চাপাইয়া রাখে, যেন গুণ্ডা কোন মতেই মাহুতদিগকে দেখিতে না পায়; অর্থাৎ পার্শ্বস্থ কুন্‌কী দুইটির মুখ, গুণ্ডার মুখের বিপরীতদিক করিয়া রাখে। গুণ্ডা যদি পিছু পিছু করিয়া অগ্রসর হয়, তবে পার্শ্বস্থ কুন্‌কী দুইটির মুখ না ফিরাইয়া উহাদিগকে পিছেরদিকে হটাইয়া নিয়া যায়। কিন্তু কোন মতেই পার্শ্বের চাপা ছাড়িয়া দেয় না। এই সময়ে তৃতীয় পালিতা হস্তিনীটি একেবারে গুণ্ডার পিছনে আনিয়া রাখে, এবং উহার উপরেই দাইদার (হস্তী বন্ধনকারী) দড়ি কাছি প্রভৃতি লইয়া প্রস্তুত রহে, গুণ্ডাটি একটুকু স্থির হইয়া দাঁড়াইলে, অমনি সে হস্তী হইতে নামিয়া গুণ্ডার পাছের দুই পা একত্র করিয়া কাছি জড়াইতে থাকে। হতভাগা গুণ্ডা ঐ কুন্‌কী দেখিয়া এমনি মোহিত হইয়া যায় যে, উহার পাদদেশে কি ঘটনা হইতেছে তাহার অণুমাত্রও অনুসন্ধান করে না। পায়ের নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত কাছি জড়াইয়া ফেলিতে পারিলেই উহাকে আবদ্ধ করা হইল। ইহার পরে যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপে উহার গলা ও বক্ষ জড়াইয়া দড়ী লাগাইতে থাকে ও কএকটি বৃহৎ বৃক্ষের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে।

২য়। ফাঁসি শিকার—এই শিকারে কেবল কুন্‌কী হস্তী ধৃত হইয়া থাকে। বন্য-কুন্‌কীগুলি পালিতা কুন্‌কীর পৃষ্ঠদেশে লোক দেখিতে পাইলেই প্রাণপণ করিয়া দৌড়িতে থাকে, তখন মাহুতেরাও উহার পিছে পিছে পালিতা কুন্‌কী ধাবিত করিয়া দেয়, এবংপালিতা কুন্‌কীটি দৌড়িয়া গিয়া বন্য কুন্‌কীর পাশাপাশি হইলে, অমনি একজন মাহুত বন্য হস্তিনীটির মস্তক এবং শুণ্ডের উপর দিয়া মোটা রজ্জু নির্ম্মিত ফাঁসি ফেলিয়া দেয়। আর ফাঁসিটি ক্রমশঃ টান লাগিয়া গলায় কসিয়া ধরে। ফাঁসি গলায় লাগাইবার সময়ে যদি বন্যহস্তিনীটি উহা শুঁড়দিয়া ফেলিয়া দেয়, তবে অনায়াসেই রক্ষা পাইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিহীনা হস্তিনী তাহা না করিয়া ভয়ে শুণ্ড সংকোচন করে, আর অমনি ফাঁসিও গলায় লাগিয়া যায়। এই প্রকার শিকারে প্রত্যেক হাতীতে দুইটি লোকের আবশ্যক। একটি চালক ও এ-

কটি বন্ধনকারী। যদি বন্য হস্তিনীটি দুর্ব্বল হয়, তবে একটি পালিতা হস্তিনী দিয়াই উহাকে ধরা যায়, কিন্তু বলিষ্ঠ হইলে দুইটি পালিতা হস্তিনীর আবশ্যক।

এই প্রকারে গলায় ফাঁসি লাগাইয়া পূর্ব্বোক্ত শিকারের ন্যায় ইহাদিগকেও বড় বড় গাছের সঙ্গে আনিয়া বান্ধিয়া রাখে।

পরতালা এবং ফাঁসি শিকারে একবারে একটি হস্তীর অধিক আবদ্ধ করা যায় না। বোধ হয় পাঠক মহাশয়েরা এই শিকারের প্রণালী পাঠ করিয়াই ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন।

৩য়। খেদা শিকার:—এই শিকার পূর্ব্বোক্ত শিকারদ্বয় হইতে একবারে স্বতন্ত্র, এবং ইহাতে এক সময়ে অনেকগুলি হস্তী ধরা যাইতে পারে। যে স্থানে হস্তীগুলিকে দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতে দেখা যায়, শিকারীরা সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে বহু পরিমাণ ভূমি বেস্টন করিয়া অন্ততঃ ৭।৮ হাত অন্তর এক একজন প্রহরী রাখিয়া দেয়, ঐ প্রহরীরা প্রত্যেকে স্ব স্ব নিকটবর্ত্তী স্থানে দুই একখানা করিয়া খাম গাড়িয়া রাখে, এবং সেই খামে লতা পাতা জড়াইয়া একটা বেড়া প্রস্তুত করে। এই বেড়াকে পাতবেড় কহে। হস্তীগুলি 'আবদ্ধ হইতেছি' ইহা যেন বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য প্রহরীরা এই সময় নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। যদি কোন হস্তী এই সময় এই বেড়ার বাহির হইতে চায়, তবে যাহার নিকট দিয়া বাহির হওয়ার চেষ্টা করে, সে হয় বন্দুকের শব্দ করিয়া, না হয় অন্য কোন প্রকারে ভয় দেখাইয়া হস্তীটিকে বেড়ার কেন্দ্রাভিমুখে তাড়াইয়া দেয়। ইহার পরে এই পাতবেড়ের মধ্যে কোন স্থানে একটি সুদৃঢ় খোঁয়াড় প্রস্তুত করা হয়, এই খোঁয়াড় হস্তী শীঘ্র ভাঙ্গিতে পারে না। খোঁয়াড়ের একদিকে একটি দরজা থাকে, এবং একটি কবাট উহার উপরে এমন কৌশলে স্থাপিত করা হয়, যেন উহা ছাড়িয়া দিবামাত্র দরজা একবারে বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর কৌশলে আবার ঐ পাতবেড় হইতে সমগ্র হস্তীগুলি এই খোঁয়াড়ে আনিত হয় এবং আনিয়াই কবাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পরে পালিতা কুন্‌কী ঐ খোঁয়াড়ে নিয়া বন্য হস্তীগুলিকে ইচ্ছামত পায়ে কি গলায় দড়ী লাগাইয়া বড় বড় গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা হয়।

বন হইতে ধরিয়া আনিলে ইহারা সহজেই মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে, কখনও বা সদ্ব্যবহারে এবং কখনও বা কঠিন শাসনে উহাদিগকে সন্তুষ্ট এবং অসন্তুষ্ট করিতে হয়। প্রথমতঃ, ধৃত হস্তীর গলার সঙ্গে পালিত হস্তীর বক্ষ একত্র বন্ধন পূর্ব্বক মনুষ্যালয়ে আনয়ন করা হয় এবং কিছুদিন কেবল উহাদিগের আহার যোগাইয়া পরে একটি বংশখণ্ডের অগ্রভাগ ৯।১০ ভাগে চিরিয়া দূর হইতে উহাদের

গা ঘর্ষণ পূর্ব্বক শুড়শুড়ি নিবারণ করা আবশ্যক। এইরূপে শুড়শুড়ি কিছু ভাঙ্গিলে পালিতা কুন্কীর পৃষ্ঠে বসিয়া ক্রমে ক্রমে উহার পৃষ্ঠে চড়িতে যত্ন করিতে হয়, এবং পালিতা কুন্কীর সঙ্গে বাঁধিয়া উহার সহিত এদিক ওদিক ফিরাইতে হয়। এইরূপ ফিরাইবার সময় উহার অগ্রে অগ্রে একজন মানুষ দৌড়াইয়া যায় ও উহার পৃষ্ঠদেশেও একজন মানুষ উপবিষ্ট থাকে। এই সময় মানুষের ইচ্ছার বহিভূর্ত কোনরূপ আচরণ করিতে চাহিলে উহাদিগকে অঙ্কুশ বা বল্লম দ্বারা আঘাত করিতে হয়। এইরূপ কয়েক দিন অভ্যাস করিলেই বন্য হস্তীরা মানুষের সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া পড়ে। পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উহাদিগকে বসিবার প্রথা শিক্ষা দিতে হয়। কএক দিন ভাল করিয়া স্নানাদি না করাইয়া প্রায়শঃই রৌদ্রে বাঁধিয়া রাখিতে হয়, পরে একদিন জলে লইয়া গেলে, উহারা আপনা হইতেই জলে বসিবার উপক্রম করে, আর অমনি মাহুতেরা 'বট, বট,' করিতে থাকে। এবং কিছু দিন এইরূপ করিলে উহারা জলে ও শুষ্কস্থানে 'বট্' বলিলেই বসিয়া পড়ে। যদি কোন হস্তী বসিতে না চায়, তবে বল্লমদ্বারা উহার পৃষ্ঠ এত জোরে গাঁতিয়া ধরিতে হয়, যে উহারা আর না বসিয়া থাকিতে পারেনা। কোন কোন হস্তীর স্বভাব আবার এমনি দুষ্ট যে উহারা অনাহারে মরিয়া যাইবে, তথাপি মানুষের বশ্যতা স্বীকার করিবে না। এবং কোনটি বশ্যতা স্বীকার করিলেও মনের কুটিলতা ছাড়িবে না। কিন্তু এই প্রকার অসরল এবং দুষ্টমতি হস্তী একশতের মধ্যে একটি হয় কিনা সন্দেহ। যাহা হউক, হস্তী বসিবার সময় সম্মুখের পা সম্মুখের দিকে ও পিছনের পা পিছের দিকে প্রসারণ করিয়া দেয়। এবং ভালরূপ বসিলে উহাদের উদরের চর্ম্ম মৃত্তিকা স্পর্শ করে।

হস্তীকে ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিলে উহারা প্রয়োজনোপযোগী বহুবিধ কার্য্য করিতে পারে। বৃক্ষাদি ভাঙ্গা, দ্বারোদ্ঘাটন করা ও শুণ্ডদ্বারা মশাল ধরা প্রভৃতি কার্য্য ইহারা অনায়াসে করিতে পারে।

কুন্কী এবং গুণ্ডা এতদুভয়ের মধ্যে কুন্কীগুলি পালিতেই অত্যন্ত সুবিধা। ইহারা শীঘ্রই বশ্যতা স্বীকার করে ও নানারূপ কার্য্য করিতে পারগ হয়, এবং একবার বাধ্য করিতে পারিলে আর অবাধ্য হয় না, বরং ক্রমশঃ অধিকতর বশীভূত হইতে থাকে। গুণ্ডাগুলি যদিও মনুষ্যের কঠোর শাসনে বাধ্য না থাকিয়া পারে না, তথাপি বৎসরের মধ্যে বিশেষতঃ শীতকালে উহাদিগের শরীরের এতদূর তেজ বৃদ্ধি হয় যে, তখন আর কোনরূপেই শাসনের অধীনেআসিতে চাহে না। যাহাকে সম্মুখে দেখে তাহাকেই মারিতে উদ্যত হয়।

হস্তীর কপাটির উভয় পার্শ্বে দুইটি

ছিদ্র আছে। গণ্ডাগুলি যখন তথাবিধ উত্তেজিত হয়, তখন সেই ছিদ্রদ্বয়দ্বারা অনবরত এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হইতে থাকে *; কিন্তু উত্তেজিত না হইলে উহা হইতে কিছুই নির্গত হয় না। কেবল ছিদ্রের চিহ্নমাত্র থাকে। কুন্‌কী হস্তীরও কপাটিতে এইরূপ দুইটি ছিদ্র আছে বটে, কিন্তু উহাদিগকে কখনও উত্তেজিত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ঐ ছিদ্র দ্বারা কোনরূপ পদার্থেরও নির্গমন দৃষ্টিগোচর হয় না। গণ্ডাগুলি যখন মনুষ্যালয়ে এইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করে, তখন উহাদিগকে 'কেতিলা' প্রভৃতি শীতল দ্রব্যাদি আহার করিতে দেওয়া আবশ্যক; শরীর শীতল হইলেই মৃদুভাবে আবার মনুষ্যের বশ্যতা স্বীকার করে।

প্রাচীন শাস্ত্রকর্ত্তারাও উত্তেজিত হস্তীতে আরোহণ করা নিষেধ লিখিয়াছেন, যথা—

'নারোহেৎ কামুকোন্মত্তম্ গজং রাজা কদাচন,
আরুহ্য কামুকং তন্তু পরত্রেহ বিনিন্দতি।'

মখ্‌না জাতীয় অন্য একপ্রকার পুংহস্তীর কথা যে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, উহারাও উত্তেজিত হইলে ভয়ানক রূপধারণ করে। উহারা দন্ত না থাকা প্রযুক্ত যদিও গণ্ডা অপেক্ষা অনেকাংশে হীনপ্রভ, তথাপি মনুষ্যাদি বিনাশ করিবার জন্য করপদসঞ্চালনে বিশেষ পটু। আমরা দেখিয়াছি, একটি উত্তেজিত মখ্‌না হাতী পৃষ্ঠস্থিত মাহুতকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া পদাঘাতে উহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া দিল।

অন্যান্য পশুর ন্যায় হস্তীর মুষ্ক বাহ্যিক দৃষ্টিগোচর হয় না, উহা পিছের পায়ের উভয় পার্শ্বে মাংসের সঙ্গে সন্নিবিষ্ট।

মনুষ্যেরা হস্তীর শরীরের গঠনকে ত্রিবিধরূপে বর্ণন করিয়াছেন। উহাদিগের নাম—'কুমারিয়া' 'মৃগা' 'দোনসলা'। ইহার প্রথম নামটি বোধ হয় 'কুম্ভীর' হইতে নেওয়া হইয়াছে। কুম্ভীরের চর্ম্ম যেমন বন্ধুর, 'কুমারিয়া' জাতীয় হস্তীরও শরীর সেইরূপ দৃঢ় ও বন্ধুর। হস্ত পদাদির গঠনও অতি বলিষ্ঠ ও স্থূল। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলেই এই জাতীয় হস্তীকে অসাধারণ বলশালী বলিয়া অনুমিত হইবে।

'মৃগা'—আমরা অনুমান করি মৃগ শরীরের গঠনাদি দেখিয়াই এই জাতীয় হস্তীর 'মৃগা' নাম দেওয়া হইয়াছে। 'মৃগা' হস্তীর শরীরের চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত পাতল; পাগুলি দীর্ঘ ও তত মাংসল নহে, শরীরের বর্ণ ঈষৎ রক্তিমাবিশিষ্ট, কিন্তু উহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া উঠিতে পারা যায় না। এইগুলির সামর্থও অনেক কম এবং ইহারা তত শ্রমসহিষ্ণু ও নহে।

'দোনসলা,—ইহাদের শরীরের গঠন পূর্ব্বোক্ত দুইজাতীয় হস্তিগঠনের মি-

* আমাদের প্রাচীন কালের কবিরাও ইহা বিশেষরূপ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন,—

"তাক্কং মত্তকরীন্দ্র গণ্ডযুগলং ভৃঙ্গচলং কর্ণয়োঃ বিশ্বোষামিকটেপি—"

প্রাণে উৎপন্ন। ইহারা ‘ মৃগা ’ জাতি হইতে অধিকতর বলশালী ও শ্রমসহিষ্ণু। হস্তী ধরিবার কালে ‘ কুমারিয়া ’ ও ‘দোনস্‌লাই ’ অধিক কার্য্য করিতে সক্ষম ও মনুষ্যালয়ে ইহারাই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ইদানীং মাহুতেরা হস্তীর কোন কোন লক্ষণকে নিতান্ত দূষিত বলিয়া মনে করে। এবং উহাদের মনের এই ধারণা যে এবংবিধ লক্ষণাক্রান্ত হস্তী পোষণ করিলে পোষ্টার কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। এইগুলি কোন অংশেও যে পূর্ণলক্ষণাক্রান্ত হস্তী হইতে বলবিক্রমাদিতে ন্যূন, এমত নহে। তবে কেন যে এই সংস্কার তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নিম্নে উক্ত লক্ষণগুলির নাম লিখিত হইল।

১ সতরখাম, ২ ষোলনখী, ৩ সেহাতালু, ৪ ঝাকদোম্‌, ৫ বালখণ্ডী।

১। যে গুলির মেরুদণ্ডাস্থি অস্বাভাবিক উচ্চ ও বক্র,সেইগুলিকে ‘সতরখাম’ কহে।

২। যে হস্তীর পায়ে ১৮টি নখ না থাকিয়া ১৬টি নখ থাকে, তাহাকে ষোলনখী বলে।

৩। যে গুলির তালুতে কাল কাল দাগ কিংবা তালু একেবারে কাল সেই গুলিকে ‘ সেহাতালু ’ কহে।

৪। যে হস্তীর লাঙ্গল চলিবার সময় মৃত্তিকা স্পর্শ করে, এবং বোধ হয় যেন এদিক ওদিক দুলিয়া ঝাড়ু দিতেছে সেই গুলিকে ‘ ঝাকদোম্‌ ’ কহে।

৫। যে গুলির লাঙ্গুলের উভয়পার্শ্বে লোম না থাকিয়া কেবলমাত্র একপার্শ্বেই লোম থাকে,সেইগুলিকে ‘বালখণ্ডী’ কহে।

হস্তীর মূল্য অত্যন্ত অধিক। অত্যুৎকৃষ্ট একটি হস্তী পঁচিশ, ত্রিশ হাজার টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়া থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত হস্তী অতি সুশ্রী হইলেও তাহাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। হস্তীর দন্ত এবং অস্থিও বহুমূল্যে বিক্রীত হয়, এবং উহা দ্বারা মনুষ্যের বহুবিধ কার্য্যোপযোগী বস্তু নির্ম্মিত হইয়া থাকে। হস্তীদন্তে অত্যুৎকৃষ্ট সিংহাসন, পাটী, কৌটা, হেণ্ডল, চিরুণী, খেলনা প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বকালে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাদি করা হইত,কিন্তু এক্ষণ ইহাদিগকে কেবল যুদ্ধসামগ্রী বহন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। কোন হিংস্র জন্তু হত্যা করিতে যাইতে হইলে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। হস্তী আরোহণ করিতে হইলে উহার পৃষ্ঠে গদি কিংবা চারজামা অথবা হাওদা বাঁধিয়া লইতে হব। ব্যাঘ্রাদি শিকার করিবার সময় হাওদাতেই কিছু কম বিপদের সম্ভাবনা। হস্তিজাতি অত্যন্ত ভীরু, সুতরাং কোন বন্য পশুর সম্মুখে পড়িলে ভয়ে এত জড়সড় হয় যে, কোন দিকে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে পারিলেই নিতান্ত শ্লাঘা মনে করে। কিন্তু মাহুতের অঙ্কুশ তাড়নে তাহা করিতে পারে না, অবশেষে ফোঁস ফোঁস করিয়া শুণ্ড-

দ্বারা ভূমিতে এমন জোরে আঘাত করিয়া থাকে যে সেখানকার মাটি একেবারে উঠিয়া যায়। কোন কোন হস্তী উপযুক্ত রূপ শিক্ষা পাইলে একেবারে নির্ভয় হয়। যদি প্রথম প্রথম শিকারের সময় পলাইবার উপক্রম করিলে মাহুতেরা কোন রূপেই পলাইতে যাইতে না দিয়া দৃঢ়শাসনে শিকারের সম্মুখেই দাঁড় করাইয়া রাখে, তবে দুই চারি বার এইরূপ করিলেই পরে অন্য পশু দেখিয়া আর ভয় পায় না।

হস্তীর স্বর অত্যন্ত কর্কশ, কিন্তু সচরাচর উহারা শব্দ করে না। কোন রূপ ভয় পাইলে অথবা তাহাদের দল হইতে বিচ্যুত হইলে, ভয়ানক এক প্রকার চীৎকার করিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া লয়। আবার আহ্লাদের সময়ও গুড় গুড় করিয়া এক অব্যক্ত শব্দ দ্বারা উহাদিগের আনন্দ প্রকাশ করে। আর মনুষ্যের নিজের কার্য্যসাধনের জন্য ডাকাইতে হইলে মাহুতেরা উহাদের কর্ণের মধ্যে একটু অল্প জোরে অঙ্কুশ দ্বারা আঘাত করিলেই চীৎকার করিয়া উঠে। হস্তীর বুদ্ধিশক্তি অত্যন্ত প্রবল; প্রতিপালককে (মাহুতকে) বিপদের সময় রক্ষা করিবার জন্য অনেক হস্তীকে অনেক প্রকার যত্ন করিতে দেখা গিয়াছে। আমরা নিম্নে উহার একটি অত্যাশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি।

পূর্ব্ববঙ্গে কোন এক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর বাটিতে পবন নামক * একটি বৃহদাকারের হস্তিনী আছে, উহা এক সময়ে বন্য হস্তী ধরিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল। মাহুত যেমনি শিকারের সময় ঐ হস্তীর পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া একটি বন্য হস্তীর পায়ে দড়ী বাঁধিতেছিল, অমনি পশ্চাৎ হইতে আর একটি বন্য হস্তী আসিয়া উহাকে মারিবার উপক্রম করে, মাহুত ইহা দেখিতে পাইয়া ছিলনা,—কিন্তু পালিতা হস্তিনী এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মাহুতকে শুণ্ডের অগ্রভাগ দ্বারা আপন পৃষ্ঠে আরোহন করাইয়া লইল। পালিতা হস্তিনীটি এইরূপ না করিলে মাহুতের আর বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিলনা।

হস্তী মনুষ্যালয়ে গর্ভবতী হইয়া সচরাচর সন্তান প্রসব করে না। আমরা একটি মাত্র হস্তিনীর মনুষ্যালয়ে গর্ভবতী হইয়া সন্তান প্রসবের বিষয় অবগত হইয়াছি। কিন্তু উহাদের ও বন্দী অবস্থায় সন্তান হয় নাই। পালিতা হস্তিনীর স-

* এই স্থানে উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যক যে বন্যহস্তী ধরিয়া মনুষ্যালয়ে আনিলে প্রত্যেকটির এক একটি নাম রাখা হয়। উহাদের নাম রাখিবার পদ্ধতি এইরূপ, কুন্কীর নাম,—যথা মহেশ্বরী, দৌলতভরি, রতনহার, আনর মালা, মনমতী, নাচভরি, ইত্যাদি। গুণ্ডা হস্তীর নাম যথা—জঙ্গবাহাদুর, গোলকুমার, রূপসুন্দর, ইত্যাদি।

স্থান হয় কিনা উহা পরীক্ষা করিবার জন্য একটি হস্তী ও একটি হস্তিনী দেশীয় সামান্য বনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং সেই অবস্থায় উহাদের গর্ভসঞ্চার হইলে, পরে মনুষ্যালয়ে আনিলে সন্তান প্রসব হয়। গর্ভবতী হস্তিনী বন হইতে ধরিয়া আনিলে উহাদের প্রসবক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে মনুষ্যালয়ে সম্পাদিত হয়। প্রসবের সময় উহারা দাঁড়াইয়া প্রসব করিয়া থাকে।

লোকালয়ে হস্তিনীর যে সন্তান হয়, তাহার কখনও বন্য বুদ্ধি হয় না, শিশুকাল হইতেই নিঃশঙ্ক চিত্তে মনুষ্যের সঙ্গে খেলা করিয়া থাকে। শিশুকাল হইতে মনুষ্য দেখিতে দেখিতে কোন কোনটী এমনি বেআদব হয়, যে সময় সময় কাহারও কথা না শুনিয়া মনুষ্যের অনেক অনিষ্ট করে। রাস্তাদিয়া যাইবার সময় কদলী প্রভৃতি উহাদের কোন খাদ্য বস্তু পাইলে অলক্ষিত ভাবে উহা চুরি করিয়া লইয়া আসিবে এবং মাতার বক্ষতলে আসিয়া অতি আহ্লাদে উহার একটীং করিয়া খাইতে থাকিবে; আবার মনে করুন, একটী মনুষ্য যেন নিঃশঙ্ক চিত্তে হাটিয়া যাইতেছে, এমন সময় হস্তিশাবকটী চুপেং উহার পিছের দিকে যাইয়া মস্তক দ্বারা উহাকে এমন আঘাত করিবে, যে তৎক্ষণাৎ সে ভূতলশায়ী হইবে। কিন্তু দুষ্টমতি করভ ইহাতে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া মায়ের বক্ষতলে গিয়া লুকাইয়া রহিবে। করভেরা যে ক্রুদ্ধ কিংবা কুটিল হইয়া মনুষ্যের এই রূপ অনিষ্ট করে এমত নহে, উহারা মনে করে মনুষ্যালয়েই উহাদের আলয় এবং শিশুরা যেরূপ স্বল্প আলয়ে আবদার করিয়া কখন কখন পরিবারস্থ সকলকেই বিরক্ত করিয়া তুলে, ইহারাও সেইরূপ আপন গৃহ ভাবিয়া লোকের সঙ্গে খেলিতে যাইয়া অনিষ্ট করিয়া বসে। এইরূপ অনিষ্টকারীদের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। ছয় বৎসর পরেই ইহাদিগকে মনুষ্যের প্রয়োজনোপযোগী কার্য্যাদি করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, ইহারা অপেক্ষাকৃত সহজেই কার্য্যাদি শিখিতে পারে। (ক্রমশঃ)

প্রতি সমালোচনা।

সুপ্রসিদ্ধ এডিসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, পাঠকদিগের হাতে কোন গ্রন্থ পড়িলেই লেখক কৃষ্ণ কি শুভ্রবর্ণ, শান্ত কি উদ্ধত, অমূঢ় কি বিবাহিত ইত্যাদি অনেক বিষয় তাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক হন, এবং যে পর্য্যন্ত জানিতে না পান, সে পর্য্যন্ত ঐ গ্রন্থ পড়িতে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জম্মে না। পাছে বা তীরে আসিয়া তরী ডুবিয়া

যায়, এই ভয়ে গ্রন্থের ভূমিকাতেই তিনি তাঁহার আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী অনুকরণপ্রিয়, আমি তাহার অনুকরণ করিয়া পূর্ব্বেই সাহিত্যসমাজে আমার পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু প্রথমতঃ এডিসন তাঁহার প্রকৃত নামটি গোপন রাখিয়াছিলেন,অনাবশ্যক বিবেচনায় আমি আমার নামটি পর্য্যন্ত সাধারণে প্রচার করিয়াছি। যাহা হউক এই গুরুতর বিষয়টি অন্যত্র বিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইবে। সম্প্রতি যে প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে কিছু আত্মপরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে। প্রবন্ধলেখকমহাশয়েরা মাপ করিবেন, কিন্তু আপনাদের একটি গুরুতর অপরাধ, অথচ একটি সাধারণ রোগ আছে। আপনারা পত্রিকা প্রভৃতিতে যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেন, তাহার অধিকাংশেরই নিম্নে বিঃ শ্রীঃ, ছাঃ, ইঃ, মঃ, টিঃ প্রভৃতি লিখিয়া আত্মনাম গোপন করিয়া রাখেন, আমি যদি সাহিত্যডিপার্টমেণ্টের পোলিষ দারোগা হইতাম, তাহা হইলে আপনাদিগকে এই উদারতার উচিত শিক্ষা দিতে পারিতাম; অর্থাৎ এই সমুদয় প্রবন্ধ নিজের নামে ছাপাইয়া স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে পুস্তক বাহির করিতাম। যাহা হউক আপনারা ভবিষ্যতে সাবধান হইবেন।

আমি সাহিত্যসমাজে বিশেষ পরিচিত, অর্থাৎ অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়াছি। আমি প্রথম কতকগুলি পুস্তক লিখিয়া সমালোচনার জন্য তদানীন্তন প্রায় প্রত্যেক সম্পাদকের নিকট এক একখানা পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু কেহই তাহার সমাদর করিল না। যাহা হউক তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি নাই; বঙ্গভাষা আজিও পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই, সুতরাং সমুদয় রস আজিও ইহাতে প্রবেশলাভ করিতে পায় নাই এবং লোকের রুচিও এক্ষণ পর্য্যন্ত সম্যক্ পরিপক্ক হইতে পারে নাই। দেশেরও দোষ বলি না; কারণ ইংলণ্ডেরও এক সময় এইরূপ অবস্থা ছিল; কবিগুরু সেক্ষপিয়র যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাহার মহীয়সী শক্তির কেহই অবধারণা করিতে সক্ষম হইল না, এমন কি তাহাকে কবি বলিয়াই কেহ গ্রাহ্য করিল না। আমারও ভরসা ভবিষ্য বংশীয়ের, অন্ততঃ আমার উত্তরাধিকারীগণের হস্তে।

যাহা হউক, সম্পাদকদিগের এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া দুঃখিত, বিরক্ত ও আংশিক ক্রুদ্ধ হইলাম, এবং তাঁহারা কোন মতে নিরস্ত থাকিতে না পারেন, ইহা মনে করিয়া পুনরায় গ্রন্থ লিখিতে বসিলাম। এবার আমার উদ্দেশ্য সফল হইল, প্রায় প্রত্যেক পত্রিকাতেই উহার সমালোচনা বাহির হইল; সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি একবাক্যে ইহার প্রশংসাধ্বনি করিয়াছিল বটে, কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, ভারতী, বান্ধব এবং ঐধরাণের কএকখানা মাসিক পত্রিকাতে উহার যেরূপ নিকৃষ্টরূপে সমালোচনা হইয়াছিল, তা-

ছার প্রতিসমালোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বান্ধব সম্পাদক মহাশয়, উল্লিখিত পত্রিকাচতুষ্টয়ের সর্ব্বশেষে বান্ধব নাম উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। ইহার কারণ আছে। প্রথমতঃ আপনার পত্রিকাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি ছাপাইবার মনস্থ করিয়া উহাকেই সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলাম না। দ্বিতীয়তঃ আপনি আমার অত্যন্ত অনিষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং আপনাকে সন্তুষ্ট করাও আমার ইচ্ছা নহে। তথাপি আপনার বান্ধব নামে আকৃষ্ট হইয়া এই সামান্য পত্রখানিকে প্রকাশ করিতে আপনাকে অনুরোধ করি।

পূর্ব্বে যে আত্মপরিচয়ের কথা বলিয়াছি, তৎসম্পর্কে এক সম্পাদক লিখিয়াছেন "গ্রন্থকার তাঁহার নাম গোপন রাখিলেই ভাল হইত।" নাম প্রকাশ করিবার ভয় লোকসমাজে তিরস্কৃত হওয়া। কিন্তু যখন লোকে অপদস্থ হইয়াও সমাজে খ্যাতিলাভ করিতেছে, তখন নাম গোপন করিবার প্রয়োজন কি? কিন্তু খুলিয়া বলিতে গেলে আমার যশোলাভের আর এক সুপ্রশস্ত পথ আছে। আমি গ্রন্থ লিখিয়াছি বলিয়া জগতের শত্রু হই নাই, আমার অনেক মিত্র রহিয়াছে, যাঁহারা আমার মিত্র, স্নেহবশতঃই হউক, কি লজ্জায় পড়িয়াই হউক, তাঁহারা আমাকে অবশ্য প্রশংসা করিবেন, আমি যদি শত্রুদিগের চক্কানিনাদ বন্ধুগণের প্রশংসাম্বুনিতে ডুবাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইল, তাহা হইলেই আমার নাম সাহিত্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আমাদের দেশে এ পদ্ধতি ত নূতন নহে, তবে আমার একার নিন্দা কেন?

আর এক কথা, মনে করুন দেশে যেন আমি এত করিয়াও সম্মান লাভ করিতে পারিলাম না। কিন্তু বিদেশীয়দিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সাধারণতঃ উদারপ্রকৃতি, এবং যাহারা স্বদেশে ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে ইচ্ছুক, সুতরাং যাহারা বঙ্গভাষার কোন পুস্তক পাইলে যৎপরোনাস্তি কৃতজ্ঞ হন, অথচ বঙ্গভাষা বুঝেন না, এইরূপ ব্যক্তি আমার এই যথাশক্তিপ্রসূত গ্রন্থও মহাসমাদরে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। যদি ছলে কৌশলে, ইহাদের নিকট কোন সম্মানিত উপাধিলাভ করিতে পারি, তবে জম্বুকস্বভাব এই বঙ্গবাসীকে কে ভয় করে? আমার যখন এতগুলি আশা সম্মুখে বর্ত্তমান, তখন আত্মপরিচয় দিতে ভয় করিব কেন?

আর এক সম্পাদক লিখিয়াছেন 'গ্রন্থখানি ইংরাজির অনুকরণ, এবং ইহার ভাষা অতি কদর্য্য।' আমি এইরূপ সমালোচনা শুনিয়া অবাক হইয়াছি। বান্ধব সম্পাদক মহাশয় শেষোক্ত বাক্যটি প্রয়োগ করিলে কতক খাটিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উহা অপরের মুখে শুনিতে

হইল। যাঁহারা কর্ত্তাকর্ম্ম ঠিক করিয়া লিখিতে জানেন না, এবং বাঙ্গালাভাষার অন্বয়ের সহিত ইংরাজির অন্বয় মিলাইয়া দিতে চান, তাঁহাদের ভাষাবিষয়ে কাহারও নিন্দা না করিয়া আপনাদিগের কলমের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি থাকিলেই ভাল হয়। আর অনুকরণের কথা, যে দেশের লোকেরা ভাষা ছাড়িয়া রুচি, রুচি ছাড়িয়া প্রকৃতি, এবং প্রকৃতি ছাড়িয়া অঙ্গের গঠন পর্য্যন্ত বিলাতি ছাচে ঢালিয়া লইয়াছেন, সেদেশে একে আবার অন্যকে অনুকরণপ্রিয় বলিয়া নিন্দা করে কেন? বঙ্গভাষার অক্ষরের সহিত সংস্কৃত অক্ষরের যে সম্বন্ধ, বঙ্গভাষার ভাবের সহিত ইংরাজি ভাবের সেই সম্পর্ক। কিন্তু উল্লিখিত দোষারোপটি আপাতবিষাক্ত হইলেও পরিণামমধুর। ইংরাজির অনুকরণ করিয়াছি, এ কথাতে অবমাননা না বুঝাইয়া প্রশংসা বুঝায়, অর্থাৎ যাঁহারা কালিকার বঙ্গভাষার দুই তিন খানা বহি পড়িয়াই পুস্তক ও সংবাদপত্র ছাপাইতে বসেন, তাহাদের হইতে অন্ততঃ উচ্চতর আসন লাভ করা হইল।

কিন্তু আমি এক সমালোচকের নিনিকট প্রকৃত প্রস্তাবে জব্দ হইয়াছি। অর্থাৎ আমার স্বকপোল কল্পিত একটি মতের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার জন্য নিচে এক ইংরাজি গ্রন্থকারের নামে একটি টীকা লিখিয়া দিয়াছিলাম, মনে ভরসা ছিল যে, ইনি সাহিত্যসমাজে বড় পরিচিত নহেন, এবং বিশ্বাস ছিল ভারতবর্ষে বোধ হয় ইহার অন্যতর পুস্তক আর নাই, সুতরাং অল্প লোকেই উহা পড়িয়াছে, অতএব তাঁহার নামে কিছু একটা লিখিয়া দিলে লোকে না পড়িয়াই প্রত্যয় করিবে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উল্লিখিত সমালোচক ঐ পুস্তক খানি সমস্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং আমার চাতুরি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আমি এবিষয়ে ইংরাজি পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া বঙ্গীয় নব্যলেখকদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিলাম।

এক সম্পাদক বলেন গ্রন্থকার অল্পবয়স্ক। মহাশয়, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমার বয়স এই বিংশতি বৎসর, আমি ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হই। জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গে কয়জন লেখক খুজিয়া পাওয়া যায় যাহারা ষোড়শবৎসর বয়সে বঙ্গীয় সাহিত্যরঙ্গভূমিতে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে নাই?

আর এক আপত্তি এই যে, বঙ্গে আজি কালি অনেকেই কেবল নাটক ও উপন্যাস লিখিয়া বেড়ান। বিজ্ঞান প্রভৃতি কঠোর বিষয়ে কেহই সাহস করিয়া হস্তক্ষেপ করেন না। ইহা হইতে অধিকতর প্রলাপোক্তি আর শুনি নাই। সাহসের কথা বুঝিনা; কিন্তু বিজ্ঞান লিখিতে যাওয়া এক ভণ্ড পরিশ্রম। বোধ হয় যাঁহারা এবিষয়ে মনোযোগ করেন না, তাঁহারা ইহাকে বিফলপ্রয়াস এবং সময়ের অপব্যয় বলি-

য়াই চেষ্টায় বিরত রহেন। উদ্যানের একটি পুষ্প দেখিয়া উহাতে কয়টি পাপড়ি আছে, গণিয়া সকলেই বলিতে পারেন, কিন্তু কয়জন লোক যুবতী কামিনীর আবেশময়ী মোহন মুরতির সহিত জ্যোৎস্না-বিধৌত রজনীর কুন্দকুসুমদামের তুলনা কল্পনায় আনিতে পারিয়াছেন। আর পৃথিবীতে কাহার সমধিক আদর; কবির না বৈজ্ঞানিকের; কয়জনে কালিদাস ও সেক্ষপিয়র অধ্যয়ন করে, আর কত জনেই বা শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাত্মতত্ত্ব ও নিউটনের আবিষ্কৃতি লইয়া মস্তিষ্ক বিলোড়িত করে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিতে কবি যত পটু, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য অপহরণ করিতে বৈজ্ঞানিক তত নিপুণ। কবি যাহা গড়ে, বৈজ্ঞানিক তাহা ভাঙ্গে, কবি যাহার প্রশংসা করে বৈজ্ঞানিক তাহার নিন্দা করে, এবং কবি যাহা ভালবাসে, বৈজ্ঞানিক তাহা ঘৃণা করে। কবি স্তুতিবাদক বৈজ্ঞানিক নিন্দুক; কবি বাগ্মী, বৈজ্ঞানিক মূক; কবি সহৃদয়, বৈজ্ঞানিক পামর।

আর আমাদের দেশে বিজ্ঞান আলোচনার প্রয়োজন কি? বিজ্ঞানের যেটুকু আবশ্যকতা, ইংরাজদ্বারা তাহা সম্পাদিত হইতেছে। সে সকল অঙ্গালের কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, স্বাস্থ্যরক্ষণপ্রিয় ভদ্রলোকের তাহাতে যোগদান করা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। এক ব্যক্তি কৃষিকার্য্য করিবে সহস্রলোকে তাহার ফলভোগ করিবে, এক ব্যক্তি বস্ত্র-বয়ন করিবে, শতলোকে সেই বস্ত্র পরিধান করিবে, ইহাই সমাজের নিয়ম; সেইরূপ, কতিপয় জাতি বিজ্ঞান আলোচনা করিয়া জগতে তাহার উপকার বিকীর্ণ করুক, অবশিষ্ট জাতি সমূহ কাব্যনিকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া মধুসংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগের ক্লান্ত দেহের শ্রান্তি বিদূরিত করিতে থাকুক। ফলতঃ, যাহারা কাব্য ও কবিতা লিখাকে সময়ের অপব্যয় মনে করিয়া বিজ্ঞানকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন, আমাদের বিবেচনায় তাঁহারা দেশের সর্ব্বথা শুভবিদ্বেষী, প্রবঞ্চক এবং মিথ্যাপবাদী।

উপসংহারে বক্তব্য এই সম্পাদকগণ মনে রাখিবেন যে গ্রন্থ সমালোচনা করা যত সহজ, গ্রন্থ রচনা করা তত সহজ নহে, এবং মুখের বায়ু দ্বারা নিমেষে যাহা উড়াইয়া দেওয়া যায়, হস্তের লেখনীদ্বারা তাহা শীঘ্র গঠিত করা যায় না।

শ্রীবঙ্গচন্দ্র—

মহম্মদের উত্তরাধিকারীগণ।

যাঁহারা ইতিহাসশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসেন, মুসলমানদিগের ইতিহাস তাঁহাদের অতিশয় আদরের বস্তু। পৃথিবীতে অন্য কোন জাতি মুসলমানদিগের ন্যায় এত অল্প সময়ে অধিকার, ধর্ম্ম ও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে নাই। মহম্মদের জন্ম হইতে আজি পর্য্যন্ত ১৩০৮ বৎসরের অধিক হয় নাই, কিন্তু এই কাল মধ্যে মুসলমানদিগের উন্নতি,অবনতি এবং পরিবর্ত্তন কত একবার ভাবিয়া দেখ। বালুকাময় প্রদেশের নদী অপেক্ষা অধিক পরিবর্ত্তনশীল মুসলমান জাতির ইতিহাস এক্ষণে সভাসমাজের আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ৬২২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের তিরোভাব হইতে ৭১০খৃষ্টাব্দ মধ্যে মাত্র ৮৮ বৎসর সময়; একজন দীর্ঘজীবী মনুষ্যকেও এই সময় অপেক্ষা অধিককাল জীবিত থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু এই অল্প সময় মধ্যেই মহম্মদের বংশধরগণ ইব্রো হইতে গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিয়াছিলেন; পরাক্রান্ত খসরুদিগের সুদৃঢ় সিংহাসন মুসলমানের পদাঘাতে রেণু রেণু হইয়া উড়িয়া গিয়াছিল; আসিয়া ও আফ্রিকায় বিস্তীর্ণ অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল; ভূমধ্যস্থসাগর মুসলমানদিগের সুসজ্জিত অর্ণবযানে সুশোভিত হইয়াছিল; ফলতঃ ইশ্‌মেল্‌গণের বলবীর্য্যে সমস্ত মেদিনী প্রকম্পিত ছিল। যে সময় এইরূপ অভাবনীয় পরাক্রম প্রদর্শিত হয়, তখন বিজ্ঞানের নিতান্ত শৈশব সময়। আরবীয়গণ শারীরিক বল এবং মানসিক অধ্যবসায় ব্যতীত কোন বাহ্যিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে অথবা তদ্দ্বারা পরিশ্রমের লাঘব সম্পাদন করিতে পারে এরূপ তাহাদের কিছুই ছিল না। তখন কামানাদি আগ্নেয় অস্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, ভল্লতরবারী প্রভৃতিই যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। তখন তাহারা একমাত্র ধর্ম্মের নামে পতাকা উড্ডীন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিত। ধর্ম্ম রক্ষায় যুদ্ধ, ধর্ম্মবিস্তারে 'কাফের' বিনাশ ও ধর্ম্মসাহায্যে পরকালে ঈশ্বরসমীপে সমাদর এবং কৃষ্ণনয়না অপ্সরীগণের সহবাসলাভ মুসলমানগণের মোহমন্ত্র ও জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা প্রাণের জন্য মমতা করিত না; তাহারা ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত ছিল, এবং ধর্ম্মার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমবেগে ধাবিত হইত। এই ধর্ম্মপ্রাণ ভীষণজাতি কিরূপে অভ্যুত্থিত হইয়া আপনাদের শক্তি, সাহস ও প্রতাপবলে সমস্ত

পৃথিবীতে কিরূপ মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। কিন্তু সম্প্রতি কএকটি প্রবন্ধে মহম্মদের পরবর্ত্তী প্রধান পদস্থ কএক জনের জীবনবৃত্ত সঙ্কলন পূর্ব্বক আমরা এই সুদীর্ঘ প্রস্তাবের অবতারণা করিলাম।

প্রথম অধ্যায়।

মহম্মদের তিরোভাব হইলে নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এবং প্রজাগণের রাজা উভয়েরই অভাব হইল। মুশলমান-রাজ্য নিতান্ত বিশৃঙ্খল, সুতরাং অচিরে বিনাশ প্রাপ্তির উপক্রম হইয়া উঠিল। আরবরাজ্যে শান্তি রহিল না। মহম্মদের প্রিয়নিকেতন মদিনা নগরীতে ভয়ঙ্কর গোলযোগ হইবার উপক্রম হইলে ওসামাইবিন্‌যেইদ মহম্মদের গৃহসমক্ষে জাতীয় পতাকা স্থাপন করিলেন, এবং স্থানে স্থানে সৈন্যসংস্থাপনপূর্ব্বক প্রজাগণের বিদ্রোহ ও কোলাহল নিবারণে কৃতকার্য্য হইলেন। কে রাজা হইবে এই প্রথম প্রশ্ন। মহম্মদের স্বগণমধ্যে চারি ব্যক্তি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। আবুবেকার, ওমার, ওথমান্ এবং আলী এই চারিজনের স্বত্ব সর্ব্বাগ্রগণ্য বোধ হইল। মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নী আয়েশার পিতা আবুবেকার, সুতরাং সেই সম্বন্ধে তাঁহার অনেক সহায় হইল। হাফ্সা নাম্নী মহম্মদের অন্য এক স্ত্রীর পিতা ওমারের হস্তে মহম্মদ পবিত্র গ্রন্থ কোরাণ বিশ্বাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং অনেকে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। ওথমান্ মহম্মদের দুইটি তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা উভয় এবং তাঁহাদের সন্তানগণ পরলোক গমন করাতে ওথমানের স্বত্ব অনেক লঘু হইলেও কেহ কেহ তাঁহার পক্ষে দাঁড়াইল। মহম্মদের খুল্লতাত-পুত্র আলী মহম্মদের একমাত্র তনয়া ফতেমাকে বিবাহ করেন; সম্পর্ক বিবেচনা করিলে আলীর স্বত্ব সর্ব্বাগ্রগণ্য হয় সংশয় নাই; সুতরাং বহুসংখ্যক লোক তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিল। এইরূপে চারিজন সৈন্যাধ্যক্ষ চারি বিভিন্ন স্বত্বে মুসলমানদিগের প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যশাসন করিতে লোলুপ হইলেন। একেত সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, তাহাতে আবার ধর্ম্মবুদ্ধি, ন্যায়পরতা এবং মনঃপ্রাণে মহম্মদের সাহায্য করা প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে আলীকেই মনোনীত করা কর্ত্তব্য হয়। যখন মুশলমানধর্ম্ম ধর্ম্মপ্রচারকের উন্নতির প্রত্যূষসময়ে নিতান্ত অবজ্ঞিত এবং অনাদৃত হইতেছিল, যখন অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপদ্রবে মহম্মদ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, তখন আলী তাঁহার সহায় হন। মহম্মদ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার প্রতিনিধি এবং ভ্রাতা বলিয়া ঘোষণা করেন। আলী কথায় এবং কার্য্যে যে পর্য্যন্ত মহত্ত্ব প্রদর্শন করিতেন, তরবারি হস্তে রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার উপযুক্ত পরাক্রমই দেখাই-

তেন। তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং সর্ব্বসাধারণের উপকারী ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মহম্মদ-তনয়া ফতেমার সজলনয়ন নিরীক্ষণে অনেকের হৃদয় আলীর প্রতি আকৃষ্ট হইল। সুতরাং কিরূপে নির্ব্বিবাদে আলী সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন, তাহা অবধারণার্থ ফতেমার গৃহে আলীর হিতৈষী এবং বন্ধুবর্গ সমবেত হইলেন।

অন্যান্য পক্ষও নীরবে বসিয়াছিলেন না। আবুবেকার আয়েশার পিতা ছিলেন। মহম্মদের শিষ্যগণমধ্যে তিনি সর্ব্বপ্রধান ও অনুরক্ত শিষ্য ছিলেন। মহম্মদ তাঁহার ভক্তি ও বন্ধুতাতে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া, মৃত্যুকালীন তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বীদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া যান। এক্ষণে আয়েশা আপন পিতার সাহায্যার্থ সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই অনুরোধের আরও অর্থ ছিল। যাহাতে আলী মহম্মদের উত্তরাধিকারী না-হন আয়েশার এই প্রধান কামনা ছিল। মহম্মদের প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি অবিশ্বাস উৎপাদনের আলীই প্রধান কারণ ছিলেন। রূপবতী আয়েশা মহম্মদের পবিত্র প্রণয়ের অবমাননা করিয়া অন্যের প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ অপবাদ আলীই প্রথমতঃ মহম্মদের কর্ণগোচর করেন। তদবধি আলীর প্রতি আয়েশার নিদারুণ বিদ্বেষ জন্মে। এক্ষণে সেই বিদ্বেষ-পরতা প্রযুক্ত যাহাতে আলী সিংহাসন নাপান তদ্বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

জনসাধারণ মধ্যে অনেকে ওমারের পক্ষপাতী ছিল তাঁহার গৌরবপূর্ণ মুখশ্রী, সিংহের ন্যায় পরাক্রম, অসাধারণ রণকৌশল, বালকের ন্যায় সারল্য এবং অপরিসীম সাহসাদি দৃষ্টে সকলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহার কন্যা হাফসা ও তাঁহার হিত সাধনে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

একদিকে ফতেমার গৃহে আলী ও তাঁহার বন্ধুগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা-নিরত ছিলেন; অন্যদিকে প্রধানপদস্থ মুসলমানগণ আবুবেকার এবং ওমারের জন্য বিশেষরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিল। তাহারা প্রথমতঃ উত্তরাধিকারের নিয়মমত সিংহাসনে অধিকৃঢ় না হইয়া জনসাধারণ কর্ত্তৃক শাসনকর্ত্তা মনোনীত হইবেন এইরূপ বিধান করিলেন। এতদ্দারা আলীর স্বত্ব একদা ধ্বংশ করা হইল। এক বংশ অন্য বংশ হইতে শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিবে, এই ভয়ে অনেকে আলীর বিপক্ষ হইয়াছিল, তাহাতে আবার ধূর্ত্ত-প্রকৃতি আয়েশার মন্ত্রণা ও চাতুর্য্য আলীর বিপক্ষে যুগপৎ কার্য্য করিতে লাগিল।

অনন্তর যাহারা মক্কা হইতে মহম্মদের সপক্ষ হইয়া পলায়ন করে এবং যাহারা মদীনায় তাঁহার সাহায্য করে এই দুই দলের মধ্যে কোন দল শাসন কর্ত্তা মনোনীত করিবে এবিষয়ে বিষমবিতর্ক উপস্থিত

হইল। প্রথমোক্তগণ বলিতে লাগিল মক্কা মহম্মদের জন্মস্থান, মক্কাতে প্রথমতঃ তাঁহার মত প্রচার হয়; বিশেষতঃ তাহারা মহম্মদের স্বগণ, প্রতিবেশী এবং তাহারা মহম্মদের নির্ব্বাসন সময়ে সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছে, সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচনে তাঁহাদেরই অধিকার। শেষোক্তগণ বলিতে লাগিল, মদীনা মহম্মদের আশ্রয়স্থান এবং মনোনীত বাসস্থান; তাহারা তাঁহার পলায়ন সময়ে সাহায্যদান করিয়াছে, প্রতিপক্ষগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিয়া সেই সকল অত্যাচারী শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়াছে এবং তাহাদের সাহায্যে সনাতন ধর্ম্ম বিস্তার হইয়াছে। সুতরাং রাজানির্ব্বাচনে তাহাদেরই অধিকার।

এই বিবাদ ভীষণাকার ধারণ করিল। উভয়পক্ষ অসি নিষ্কোষ করিয়া স্বপক্ষের প্রতি পরস্পর আক্রমণ করিতে লাগিল। মদীনাবাসীগণ বলিল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুইজন শাসনকর্ত্তা মনোনীত করা হইবে। ওমার এই প্রস্তাব হাস্য করিয়া উড়াইলেন, এবং বলিলেন "এক কোষে দুইখানা অসির স্থান হয় না।" আবুবেকারও রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন "রাজ্যের এখন নিতান্ত শৈশব কাল, দুইভাগে বিভক্ত হইলে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।" তিনি বলিলেন একজন শাসনকর্ত্তা মনোনীত করা কর্ত্তব্য, ওমার এবং আবু অবিদা এই দুই জনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা নির্ব্বাচন করা হউক। প্রথমতঃ যে কয়জন মহম্মদের শিষ্য হয় আবু অবিদা তাহার মধ্যে একজন ছিলেন। মক্কা হইতে পলায়ন সময়ে তিনি মহম্মদের সঙ্গে ছিলেন, এবং চিরদিন নিতান্ত অনুগত ও বিশ্বস্তভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

জ্ঞানবৃদ্ধ এবং বয়োবৃদ্ধ আবুবেকারের উপদেশে কিয়ৎকাল শান্তিরক্ষা হইল। কিন্তু আরবজাতি স্থির থাকিতে পারে না, আরব সাগরের ন্যায় সর্ব্বদা টলমল করে, পুনরায় দুইদল ক্ষেপিয়া উঠিল। তখন ওমার সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তিনি বলিলেন 'আবুবেকার সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানী; মহম্মদের অনুচরগণ মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা অনুগত ছিলেন, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই মনোনীত করা কর্ত্তব্য।' এই বলিয়া আবুবেকারের আনুগত্য স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ হস্ত চুম্বন করিলেন এবং তাঁহাকে রাজা বলিয়া আজ্ঞা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

ওমার আপন স্বার্থ প্রতিপক্ষের অনুকূলে উৎসর্গ করিলেন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইল, এবং প্রকৃত পক্ষে আবুবেকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহা তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। আবুবেকার কিরূপ সর্ব্বদা মহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, তাঁহার উপদেশে কিরূপে মুসলমানদিগের

শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত হয়; তাঁহার স্বার্থোৎসর্গ, জ্ঞান, শুক্লকেশ সকল বিষয় একবার মনে হইল। সুতরাং তিনি যে শাসনভার গ্রহণে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। সকলে ওমারের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। আবুবেকার শাসনকর্ত্তা হইলেন। তখন ওমার দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন 'অতঃপর যে ব্যক্তি সাধারণের সম্মতি ব্যতিত রাজ্য হইতে লোলুপ হইবে তাহার শিরশ্ছেদ হইবে, এবং যাহারা তাহাকে মনোনীত অথবা তাহাকে সাহায্য করিবে তাহাদিগের ও প্রাণদণ্ড হইবে।' একথা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিল; সুতরাং অন্যান্য রাজপদাকাঙ্খীগণের পক্ষে কোন গোলযোগ হওয়ার সম্ভাবনা রহিল না।

'উল্লিখিত কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে ওমারকে নিতান্ত নিঃস্বার্থ ও সদাশয় বোধ হইতে পারে, কিন্তু স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইবে' এইরূপ কোন কোন মুসলমান-গ্রন্থকার বলিয়া গিয়াছেন। উহাদের মত এই যে, আবুবেকার অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া ছিলেন, তাঁহার বয়স মহম্মদের সমান ছিল। আবুবেকার অনেকদিন বাঁচিয়া থাকিবেন তাহার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং অল্পদিন মধ্যে তিনি স্বয়ং সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন ওমারের এই আশা ছিল। তাঁহার শেষোক্ত কার্য্যে আলীর আশা সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আলী ফতেমার গৃহে বন্ধুগণ সহ অবস্থান করিতে ছিলেন, এই সমস্ত ঘটনাবলী পুণাক্ষরে জানিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার আশা চিরদিনের জন্য উচ্ছিন্ন হইল। ইতিহাসপাঠে যে পর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাতে ঐ সকল গ্রন্থকারগণের লিখিত গ্রন্থে ও ওমারের চরিত্রে স্বার্থপরতার চিহ্ন মাত্রও লক্ষিত হয় না। তিনি অতিশয় ন্যায়পরায়ণ সরল-প্রকৃতি মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি মুসলমানধর্ম্ম রক্ষা এবং বিস্তারের জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে ভ্রমেও কোনরূপ কৌটিল্যতা বা কপটতা প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার প্রকৃতি আরবীয় অনেকের প্রকৃতি অপেক্ষা উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ছিল। সুতরাং তাঁহার উদার চরিত্রে দোষারোপ করা সহৃদয় লেখকের কর্ত্তব্য হয় না।

আলী এবং তাঁহার বন্ধুগণ আবুবেকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া কোন প্রকার গোলযোগ ঘটাইবেন, এই ভয়ে আবুবেকার অতিশয় ভীত ছিলেন। তিনি একদল সৈন্যসহ আলীর বাসস্থানে পৌঁছিয়া সমস্ত নিরাকরণ করিতে ওমারকে অনুরোধ করিলেন। ওমার তাঁহার দলবল সহ ফতেমার বাটী অবরোধ করিয়া আবুবেকারের অভিষেকবৃত্তান্ত আলীকে জ্ঞাপন করেন, আলী আপনার স্বত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক আপত্তি করিলে ওমার তাঁহাকে বলেন যে আপত্তি পরিত্যাগ নাকরিলে তাঁ-

হার প্রাণদণ্ড হইবে, তাঁহার অনুচর বর্গের ও সেই দশা ঘটিবে, এবং জনসাধারণের ক্রোধবহ্নিতে তাঁহাদের গৃহ ভস্মসাৎ হইবে। তখন ফতেমা নিতান্ত আর্ত্তস্বরে মিষ্ট ভৎর্সনার সহিত বলিলেন 'আপনি কি এইরূপ কার্য্য করিবেন? আমার বিশ্বাস হয় না।' তখন ওমার বলিলেন যদি আপনারা জনসাধারণের সঙ্গে মিলিত না হন এবং তাহাদের মতের প্রতিপক্ষতা করেন, তবে আমি সত্য সত্যই ঐরূপ করিব সন্দেহ নাই।' আলীর বন্ধুগণ অগত্যা নত হইল এবং আবুবেকারকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিল। আলী নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া বিরলে ফতেমার গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক মাস অতিবাহিত হইলে তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী ফতেমার মৃত্যু হইল। অনন্তর নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত আবুবেকারের প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি আবুবেকারকে এই বলিয়া মিষ্টভৎর্সনা করিতেন যে তাঁহাকে না জানাইয়া নিতান্ত কপট এবং অসরলভাবে রাজপদ গ্রহণ করা কদাচ কর্ত্তব্য ছিল না। এই ভৎর্সনা অমূলক নহে। আলীর সম্মতি লইয়া কার্য্য করিলে তিনি এত দুঃখিত হইতেন না। তাঁহার যেরূপ মহৎ অন্তঃকরণ ছিল তিনি স্বচ্ছন্দে সম্মতি দিতেন। আবুবেকার বলিলেন, তিনি কেবল জনসাধারণের গোলযোগ নিবারণার্থ সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার চক্রান্ত কিছুই নাই, কোন উপযুক্ত এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তি জনসাধারণের বাসনানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকার করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন।

আলি এইরূপ ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হইলেন, এইরূপ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ ব্যাখ্যা হৃদয়ের সহিত ঘৃণা করিলেন, এবং আপন পুত্র মহম্মদের দৌহিত্রদ্বয় হাসেন ও হোসেনকে সঙ্গে লইয়া আরবদেশের মধ্যস্থলবর্ত্তী কোন নিভৃত প্রদেশে গমন করিলেন। হাসেন এবং হোসেন হইতে অনেক বংশ উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছেন। বংশমর্য্যাদার চিহ্নস্বরূপ তাঁহারা সবুজ বর্ণের শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া থাকেন।

আবুবেকার শাসনভার গ্রহণ করিলে সকলে তাঁহাকে রাজা উপাধি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল, তাহাতে তিনি অসম্মত হইলেন। অনেকে তাঁহাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া আহ্বান করিত, কিন্তু তাহাও তিনি স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিতেন তিনি ঈশ্বরের প্রতিভূ নহেন, মহম্মদের প্রতিভূ মাত্র। "আমি মহম্মদের উপদেশানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব, তাহাতে সকল কুসংস্কার এবং পক্ষপাত হইতে বিরত থাকিব। যতদিন আমি ঈশ্বর ও তাঁহার মহম্মদের আজ্ঞা পালন করিব, ততদিন তোমরা আমাকে মান্য করিও, যখন তাহা না করি কেহ আমার

কথাটিও শুনিও না! যদি আমি ভ্রমে পতিত হই আমাকে সংশোধন করিও, তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হইব না।”

তিনি খলিফা উপাধি (উত্তরাধিকারি) গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তীগণ এই উপাধির সহিত ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং পৃথিবীতে তাঁহার ছায়াস্বরূপ ইত্যাদি গর্ব্বদ্যোতক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ যেমন বিষয় এবং ধর্ম্ম উভয়ের রাজা ছিলেন, খলিফাগণও সেইরূপ রহিলেন।

আবুবেকারের অনেক নাম ছিল। কেহ সত্যধর্ম্মপ্রচারক, কেহ অন্যান্য অভিধানও প্রদান করিত। আবুবেকার শব্দের অর্থ কুমারীর জনক। মহম্মদের স্ত্রীগণমধ্যে মাত্র আয়েশাকে কুমারী অবস্থায় বিবাহ করেন, অন্যান্য সকল বিধবাবিবাহমাত্র। অন্যান্য হইতে প্রভেদ করার জন্য সকলে আয়েশার পিতাকে আবুবেকার বলিত, এই নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন।

আবুবেকারের বয়স সিংহাসন গ্রহণসময়ে ষিবট্টি বৎসর ছিল। তিনি দীর্ঘকায় এবং ক্ষীণাঙ্গ ছিলেন। তাঁহার মুখশ্রী উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল ছিল। পূর্ব্বদেশীয় অনেক মুসলমান যেমন শ্মশ্রুরঞ্জিত করে, তিনিও সেইরূপ করিতেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছিলেন। প্রত্যেক কার্য্য সম্পাদন সময়ে এতদূর সতর্ক হইতেন যে, সহসা তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দৃষ্টে কেহ তাঁহাকে ধূর্ত্ত মনে করিতে পারিত না। কিন্তু তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ নিঃস্বার্থ সাধুপ্রকৃতি শাসনকর্ত্তা মুসলমানদিগের মধ্যে অতি বিরল ছিল। নীচপ্রকৃতি সংসারীর ন্যায় তাঁহার একটি কার্য্যও ছিল না। তিনি ঐশ্বর্য্য, জাঁকজমক, বিলাসবাসনা প্রভৃতি কিছুরই জন্য ব্যস্ত ছিলেন না, কার্য্য করিয়া কোন অর্থও সাধারণের ধনাগার হইতে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার একটি ক্রীতদাস এবং একটি উষ্ট্রমাত্র ছিল। তাহাতে যে কিঞ্চিৎ ব্যয় লাগিত এবং নিজের যৎসামান্যরূপ ভরণপোষণে যাহা আবশ্যক হইত, মাত্র তাহাই রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিতেন। রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত হইত তাহা পণ্ডিত, গুণবানব্যক্তি এবং দরিদ্রদিগকে প্রতি শুক্রবার বিতরণ করিতেন। তদ্ভিন্ন স্বকীয় পরিশ্রমে যে কিছু আয় হইত তাহা সর্ব্বদা দুঃখীগণকে দিতেন। যাহাতে দরিদ্রদিগকে যথানিয়মে দান করা হয়, অনর্থক তাঁহার শাসন সময়ে কোন অর্থ ধনাগারে বসিয়া না থাকে, তাহা অবহিত হইয়া দেখিবার জন্য আপন দুহিতা আয়েশাকে উপদেশ করিলেন।

উল্লিখিত গুণগ্রাম সত্বেও আরবীয়দিগকে শাসনাধীন রাখা আবুবেকারের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। যাহাদিগকে তরবারির সাহায্যে মুসলমান করা হইয়াছিল, জয়ীসেনাপতির শাণিত খড়্গ এবং ভবিষ্যদ্বক্তা মহম্মদের ধর্ম্মোপদেশ ব্যতীত তাহারা স্থির থাকিবে কেন? মহম্মদের

তিরোভাবের পর তাঁহার স্থলবর্ত্তীকে কেহই ধর্ম্মরাজ বলিয়া মানিল না, চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে মক্কা, মদিনা এবং তায়েফ্ ব্যতীত অন্য সকল স্থান স্বাধীন হইল।

মালেকইবিন্ নাওইরা নামক একব্যক্তি আপন দলবলসহ মদীনা নগরীর বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী, সদ্বংশজাত এবং বীরপুরুষ ছিলেন, তেমনই সুকবি এবং সুপুরুষ বলিয়া আরববাসীগণ তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিত। তাঁহার স্ত্রী সমস্ত আরবললনা অপেক্ষা রূপবতী ছিলেন।

আবুবেকার এই বিষয় অবগত হইয়া দুর্ব্বল, বৃদ্ধ এবং রমণীগণকে দুরাক্রম্য পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রেরণ করিলেন, এবং নগরী দুর্গপরিবেষ্টিত করিতে লাগিলেন। মহম্মদ বর্ত্তমান ছিলেন না সত্য, কিন্তু মুসলমানতরবারি তাঁহার সহিত অস্তমিত হইয়াছিল না। ওয়ালেদ নামক বীরপুরুষ পূর্ব্বপরাক্রমের পুনরাভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনসার্দ্ধ চারিসহস্র সৈন্যসহ বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। রাজাও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তিনি কৌশলপূর্ব্বক বিপক্ষকে হস্তগত করিয়া জয়লাভ করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। খালেদইবিন্ ওয়ালেদকে বলিয়াছিলেন, মালেককে কোন প্রকারে হস্তগত করিতে পারিলে তাঁহার প্রতি যেন যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করা হয়; কিন্তু খালেদ সে প্রকৃতির ছিলেন না। তিনি বিপক্ষকে পরাজয় করিয়া তাহাদের দেশ লুণ্ঠনার্থ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন। মালেক এবং তাঁহার সুন্দরী পত্নী অন্যান্য অনেকের সঙ্গে বন্দী হইলেন।

খালেদ ইবিন্ ওয়ালেদ মালেক পত্নীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছিলেন, কোন প্রকার মালেককে বিনাশ করা তাঁহার সঙ্কল্প হইল। মালেক অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কথাবার্ত্তায় রাজার ক্ষমতা স্বীকার করিলেন না, খালেদের আদেশে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল।

আবুবেকার এই কার্য্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, ওয়াকন নামক ইথিয়োপীয়ো বাসী এক ব্যক্তি মহম্মদের পিতৃব্যকে হত্যা করে কিন্তু মহম্মদ তাহাকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কোরাণের উপদেশানুসারে এক্ষণে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া ব্যভিচার জন্য অথবা একজন মুসলমানের জীবন হনন জন্য অপরাধীর প্রাণদণ্ড করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এব্যক্তি ভ্রমান্ধতা প্রযুক্ত এই পাপ কার্য্য করিয়াছে। অতএব ঈশ্বরের কার্য্যে যে তরবারি নিষ্কোষিত হইয়াছে তাহা বন্ধ করা কর্ত্তব্য হয় না।

মহম্মদ যখন পীড়িত ছিলেন তখন মোসিলমা নামক এক ব্যক্তি আপনাকে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া ঘোষণা করে। অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়া লোহিত সাগর হইতে পারস্য সাগর পর্য্যন্ত সকল ভূভাগ

অধিকার করিয়া লয়। এক্ষণে এই ব্যক্তির দমনার্থ তরবারির প্রয়োজন হইল।

কথিত আছে যে মোসিলমার শিষ্যগণ মধ্যে আবুকাদলার রূপবতী ও গুণবতী পত্নী সেজ্জা প্রধানা ছিলেন। তিনি কবিত্ব সম্পন্না এবং তামিমজাতীয় লোক মধ্যে অতিশয় প্রিয়া ছিলেন। ইহুদিগের রাজা সালমনের তাঁহার জ্ঞান গৌরবে বিমুগ্ধা হইয়া শিবার রাজ্ঞী তাঁহাকে দেখিবার জন্য যেমন গমন করিয়াছিলেন, সেজ্জাও মোসিলমাকে সেইরূপ দেখিতে গেলেন। ধর্ম্মের পবিত্র আকর্ষণে না হইলেও রূপজ স্নেহে উভয়ের নয়ন ও মন উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পরস্পর পরস্পরের সহবাস ভাল বোধ করিল; অধিকাংশ সময় একত্র অতিবাহিত হয়। সেজ্জা তাঁহার নবীন প্রণয়ীর নিকট ভবিষ্যদ্বাণী ক্ষমতা লাভ করেন, মোসিলমা ও প্রণয়িনী হইতে কবিত্ব শক্তি প্রাপ্ত হন।

ধর্ম্মের পবিত্র আবরণে আবৃত থাকিয়া প্রণয়ি যুগল যখন কবিতা ও ভবিষ্যদ্বাণীর সুখময় স্বপ্ন দেখিতেছিলেন খালেদ ও তাঁহার অগণ্য সৈন্য সেই সুখের অবিরাম স্রোতে প্রতিরোধ জন্মাইল। মোসিলমা ততোধিক সৈন্যসহ প্রত্যাগমন করিলেন। যামামার রাজধানীর সমীপে আক্রেবায় একটি ঘোরতর যুদ্ধ হইল। প্রথমতঃ বিদ্রোহীর পক্ষেই বিজয়-চিহ্ন লক্ষিত হইল, বার শত মুসলমান ভূতলে শয়ন করিল। কিন্তু খালেদ তাঁহার সৈন্যগণকে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ করিলেন, বিপক্ষগণ সম্পূর্ণ পরাভূত হইল, তাহাদের দশ সহস্র সৈন্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মোশিলমা প্রাণপণ যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িলেন। কথিত আছে ইথিওপিয়াবাসী ওয়াক্সা মহম্মদের পিতৃব্যকে ওহুদের যুদ্ধে যে অস্ত্রে নিপাত করে, ঠিক সেই অস্ত্রদ্বারা মোসিলমাকে হত্যা করিল। মহম্মদের পিতৃব্য হামজাকে বধ করা সত্বেও মহম্মদ ওয়াক্সাকে ক্ষমা করেন, ওয়াক্সা তদবধি গোঁড়া মুসলমান হয়।

মোসিলমার অবশিষ্ট সৈন্যগণ ও শিষ্য সমুদয় আগ্রহের সহিত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। খালেদের নিষ্ঠুর প্রকৃতিতে ও অসভ্যভাবে মালেককে হত্যা করাতে তাঁহার প্রতি সাধারণের যে ঘৃণারভাব হইয়াছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সেকথা সকলে ভুলিয়া গেল। তিনি আরও অনেক জয়লাভ করিলেন। যখন যেখানে যাহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ স্বরূপ প্রেরণ করা হইত, খালেদ হয় তাহার সহিত মিলিত হইতেন না হয় সৈন্য দ্বারা বা অন্য প্রকার সাহায্য প্রদান পূর্ব্বক জয়লাভ করিতেন। এইরূপে খলিফাদিগের রাজ্য স্থাপনাবধি এক বৎসর কাল মধ্যে যেখানে যে উচ্ছৃঙ্খলভাব ছিল সে সমস্ত প্রশমিত হইয়া সমস্ত আরবদেশে খলিফাক্ষমতা অব্যাহতরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল।

মোসিলমাকে পরাজয় করার অব্য-

বহিত পরেই আবুবেকার বাচনিক, লিখিত উপদেশ এবং দৈববাণী প্রভৃতি হইতে কোরাণের মূলতত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। তৎপূর্ব্বে কোরাণের কতকাংশ খণ্ড খণ্ড কাগজে লিখিত এবং অপরাংশ মহম্মদের শিষ্য ও সঙ্গীগণের স্মৃতিফলকে অঙ্কিত ছিল। পরমধার্ম্মিক ওমার এই কার্য্য সাধনে তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। আক্রেবার যুদ্ধে মহম্মদের প্রাচীন সঙ্গীয়গণ মধ্যে অনেকে হত হয় দেখিয়া ওমার নিতান্ত ভীত ও দুঃখিত হন। অনন্তর তিনি বলেন " এক্ষণে যাঁহারা জীবিত আছেন, যাঁহাদের স্মৃতিক্ষেত্রে মহম্মদের দৈবাদেশ, কার্য্যকলাপ এবং উপদেশ সকল লিখিত রহিয়াছে, সেই সকল সনাতন ধর্ম্মের সারতত্ত্বের সাক্ষীগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া যাইতে পারে এবং তৎসঙ্গে ইস্‌লেম ধর্ম্মের মূলগ্রন্থ বিলোপ হইতে পারে। " সুতরাং ওমার নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে আবুবেকারকে অনুরোধ করেন, যে সকল জ্ঞাতসার ব্যক্তি জীবিত আছেন তাঁহাদিগহইতে এবং যে সকল অংশ লিখিত আছে তাহা হইতে কোরাণ সংগ্রহ হউক। তদনুসারে কোরাণ সংগ্রহ আরম্ভ হয়। বৃদ্ধ আবুবেকার এই কার্য্য সমাপন করিতে পারেন না। তাঁহার উত্তরাধিকারী খলিফা এই আরব্ধ সাধু কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীর—

শিশুশিক্ষা। *

বাঙ্গালীর প্রধান দোষ এই যে তাহারা শিখিতে জানে না এবং শিখাইতে জানে না। কিরূপ শিখিলে সংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া যায়, এবং সুখে দিন নির্ব্বাহ করিয়া থাকিতে পারা যায়, তাহা তাহাদিগের বুদ্ধির অগম্য। এক অনুকরণে তাহাদিগের সর্ব্বনাশ হইল। মহাপুরুষেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, আমাদিগের ও সেই পন্থানুবর্ত্তী হওয়া বিধেয়, এই মূলমন্ত্র তাহাদিগের হৃদয়ের চালক স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং ইহারই বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে "যাহা হইয়াছে তাহা হইবেই, কিন্তু যাহা হয় নাই তাহা হইবারও নহে।"

মহাপুরুষদিগের অনুবর্ত্তী হওয়াকে আমরা নিন্দা করিতেছি না। বরং অনেক সময়ে ইহাই একমাত্র শ্লাঘনীয় কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাই বলিয়া সকল সময়েই তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট উচ্চারণ করিয়া আপনাদিগের পক্ষ সমর্থন করা কোন প্রকারেই যুক্তি সংগত নয়। দেশকাল, পাত্রভেদে নিয়মের এবং কার্য্যের প্রভেদ হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে কন্যাহরণই বিবাহের উৎকৃষ্ট আদর্শ স্থল ছিল। কিন্তু সেই কন্যাহরণ এক্ষণে দণ্ডবিধি অনুসারে গর্হিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা ভারতচন্দ্রের অপূর্ব্ব কবিতালহরী পাঠ করিয়া নাসিকায় বস্ত্র দিয়া 'অশ্লীল' 'অশ্লীল' বলিয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, তাহারা বুঝেন না যে, ভারতচন্দ্রের সময় আমাদিগের সময় নহে। এবং এই কথা না বুঝিয়া অশ্লীলতানিবারিণী সভায় কবিবরের অতুল্য যশস্তম্ভস্বরূপ বিদ্যাসুন্দর দগ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। ধন্য কুশাগ্র বুদ্ধি! যাহারা আবার ভাবেন, যে মৎস্যমাংস ত্যাগ করিয়া প্রাচীন যোগীঋষিদিগের অনুকরণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। প্রাণিহিংসা পরম অধর্ম্ম এই মহামন্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল মহাপুরুষেরা পরকালের জন্য ধ্যান নিমগ্ন ছিলেন তাঁহাদিগের কার্য্যের উপর বাক্য ব্যয় করা আমাদের পক্ষে নিতান্ত ধৃষ্টতার কার্য্য। যাহারা এরূপ বিবেচনা করেন তাহারা বঙ্গদেশের আধুনিক অবস্থা এক বার ভাবিয়া দেখেন না। বাঙ্গালী দুর্ব্বল, বাঙ্গালী ক্ষীণ, বাঙ্গালী শ্রমশীল সুতরাং এ অবস্থায় বঙ্গে মাংস

* এই প্রবন্ধের সারাংশ, দৃষ্টান্ত সমেত, হর্বার্টস্পেন্সর প্রণীত 'Education' নামক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইল।

ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয়। এইজন্যই আমরা বলিয়াছি যে, সকল কার্য্যে মহাপুরুষদিগের অনুকরণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

এই অনুকরণের বশবর্ত্তী হইয়া বাঙ্গালী আপন অবস্থাকে উন্নত করিতে শিখে নাই। আদালত উকীলে পরিপূর্ণ, তথাপি বাঙ্গালী উকীল হইবে; কেননা তাঁহাদিগের পিতা মহাশয়েরা ওকালতী ক দিন কাটাইয়াছেন। বিলাতে থাকি যেন সিবিলিয়ান ও বারিষ্টার হওয়া জাতীর প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। আজি কালি ইংরাজপ্রিয় বাবুরা এই ব্যবসায়ের যেরূপ নিন্দা করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালী অধঃপাতে গেল বলিয়া সংবাদ পত্রে ঘোর গর্জ্জন করিতে থাকেন, আমরা ইহাতে সে পরিমাণে দোষ দেখি না। বাঙ্গালীর আধুনিক অবস্থা অনেকটা রাজপ্রসাদাৎ। কার্য্যকরী বিদ্যায় রাজার দৃষ্টি নাই। যিনি সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া শিল্পি বা কৃষি শিখিলেন, তিনি হয়ত পরে মানসম্ভ্রম রাখিয়া দিনপাত করিতে অক্ষম হয়েন, এবং কাজেই এখন ভাবেন যে তিনি আপনার পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। যেখানে এত বিপদ এবং সঙ্গে সঙ্গে মুর্খের করতালি, সেখানে কে অগ্রসর হইবে? * কিন্তু কথাটা এই যে এমনি পোড়া দেশ যে বাঙ্গালী জোড়াতাড়া মিলাইয়া অর্থের সদ্ব্যয় এখনও শিখিল না?

সুতরাং বাঙ্গালী যে শিখিতে জানে না তাহা একপ্রকার স্থির। যাহারা শিখিতে জানে না তাহারা অন্যকে কিরূপে শিখাইবে? বাঙ্গালী নিজে যেরূপ শিখে পুত্র পৌত্রকেও সেইরূপ শিখাইতে যত্ন করে। সুতরাং পিপীলিকাশ্রেণীর মত তাহারা সংসারে লীলা খেলা করিয়া চলিয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক বা বৃদ্ধ হইতে বাঙ্গালার যে কোন উপকার হইবে না তাহা এক প্রকার আমাদিগের বিশ্বাস। যদি বাঙ্গালার কিছুমাত্র উন্নতি হয় তবে সে ভবিষ্যৎ বংশ হইতে। আমরা ত নিজ দেশের কিছুই করিলাম না, যদি পুত্র পৌত্রাদি হইতে কিছু হয় তবে তজ্জন্য কেন চেষ্টা না করিব? কিন্তু এউন্নতি শিক্ষা সাপেক্ষ। প্রত্যেক বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য যে তাহার শিশুদিগকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দেয়। এই শিশু শিক্ষা সম্বন্ধেই আমাদিগের দুই চারিটী বক্তব্য আছে।

প্রথমতঃ কিরূপ শিক্ষা বড় আবশ্যক? সর্ব্বাগ্রে বঙ্গে শিশুদিগকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এইটি ব্য-

* এস্থলে বক্তব্য যে কৃষি বিদ্যা পারদর্শী বাবু শ্রীনাথ দত্ত (যিনি তিন বৎসর কাল বিলাতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছেন।) তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্টের মুখ চাহিতে হয়। কি আশ্চর্য্য বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি হইতেছে তথাপি প্রয়োজনীয় একখানি সাময়িক পত্রের গ্রাহক জুটে না।

জানার কোথাও দৃষ্ট হয় না। শিশু চারি পাঁচবৎসর বয়সের হইলেই তাহাকে অমনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বা স্কুল পণ্ডিতের অধীনে সমর্পণ করা হয়। গুরুমহাশয়ের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া যায়, স্মরণশক্তি ম্লান হয় এবং এই কোমল বয়সে গুরুতর মানসিকপরিশ্রমে শরীর দুর্ব্বল হয় এবং আনুষঙ্গিক শত অকল্যাণ আসিয়া জুটে। সেই অল্পবয়সে তাহাদিগের শিক্ষিত বিষয়ে রসবোধ হয় না। শিখিলে আনন্দ বোধ হয় না। সুতরাং তাহারা পণ্ডিত মহাশয়দিগকে ফাঁকি দিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া থাকে। পণ্ডিত মহাশয় জানিতে পারিলে আর রক্ষা রাখেন না। বেত্রধারীরূপী হইয়া সেই কোমল পৃষ্ঠে নির্দ্দয় রূপে প্রহার আরম্ভ করেন। শিশুদিগের কাজেই বিদ্যার অশ্রদ্ধা জন্মে, শিক্ষকের প্রতি অভক্তি জন্মে। এবং যে পিতা মাতারা সন্তানের এইরূপ কষ্টের কারণ হন, তাহাদের উপরেই বা অভক্তি না জন্মিবে কেন? এই সকল শিশুরা বয়প্রাপ্ত হইলে মূর্খ, ধূর্ত্ত, এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া বংশে কালি দিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদিগের পিতা মাতারা বুঝেনা* যে, তাহাদিগের দোষেই সন্তান দুর্বৃত্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন যে, সাত আট বৎসরের পূর্ব্বে সন্তানকে কখন স্কুলে পাঠান উচিত নয়, কারণ ইহার পূর্ব্বে মানসিক পরিশ্রম করিলে সন্তান ক্ষীণ, দুর্ব্বল এবং অল্পজীবী হয়।

কেবল তাহাই নয়। বঙ্গে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশেষতঃ শিশুদিগের কোন উপায় অবলম্বিত হয় না। শৈশবে স্বাস্থ্য রক্ষার যেরূপ প্রয়োজন এরূপ আর কখন নহে। মৃত্যু সংখ্যার তালিকা লইলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের অধিকাংশই শৈশবে এবং বার্দ্ধক্যে ঘটিয়াছে। পিতা মাতারা শিশুদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখেন না, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নয়। শিশু প্রাতঃকালেই শয্যা হইতে উঠিলে হিম লাগিবে বলিয়া তাহাদিগের পিতা মাতা পুনরায় শয়ন করিতে অনুরোধ করিয়া থাকেন। এবং সেকথা প্রতিপালিত না হইলে প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং শিশু আর প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করে না। শিশু পরিশ্রমজনক ক্রীড়া করিতেছে দেখিলে হয়ত বঙ্গীয় পিতা বলিবেন "বসিয়া খেলা নাই কেবল উৎপাত", এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত দুই চারি চপটাঘাত পড়িল, অমনি শিশু পরিশ্রম হইতে ক্ষান্ত হইল। এইরূপে তাহাদিগের মনের সুখ এবং শরীরের সুখ একবারে নষ্ট করা হয়। যদি তাহারা জীবিত থাকে তাহা হইলে অত্যন্ত দুর্ব্বল হওয়ারই সম্ভাবনা। নহিলে পিতা মাতাকে কাঁদাইবার হইলে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

কেবল তাহাই নয়। খাদ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুরা প্রায় অ-

পরিমিত ভোজন করে না, কিন্তু তাহাদিগকে নিয়মিত ভোজনে বাধা দিলেই তাহারা সুবিধা পাইলে অপরিমিত ভোজন করিয়া থাকে। এইজন্য শিশুদিগের খাদ্য সম্বন্ধে কোন বাধা দেওয়া উচিত নহে। এতদ্ব্যতীত বঙ্গদেশে মাংস ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনেকে বলিবেন বঙ্গদেশে উত্তাপ প্রধান; এখানে মাংস ব্যবহারে বিপরীত ফল ফলিবার সম্ভাবনা। যাহারা এরূপ ভাবিবেন, তাহারা ডাক্তারদিগের পরামর্শ লইলেই তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। তবে সকল প্রকার মাংস এখানে উপকারী না হইতে পারে। কিন্তু ছাগ প্রভৃতি লঘুমাংস বঙ্গের যে উপযোগী তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মাংস যে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকারক তাহা বুদ্ধিমানকে বুঝান নিষ্প্রয়োজনীয় ইহা বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, জগতে জিত জাতিরা প্রায় সকলেই মাংসভোজী। ইংলণ্ডীয় রুসিয় প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত স্থল। মাংসে যে কেবল শারিরীক বল বৃদ্ধি করে তাহাই নহে, ইহাতে শরীরের আয়তন বৃদ্ধিকরে এবং সঙ্গেসঙ্গে অস্থি ও ধমনীগণকে পরিপুষ্ট করে। ডার্বিন একজাতির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে তাহাদিগের আয়তনও শরীরের উচ্চতা সাধারণ মনুষ্যের অর্দ্ধেক। তাহারা নিরামিষাশী। অনেকে দেখিবেন যে, ইংরাজ এবং কাবেলীর তুলনায় বাঙ্গালীর শরীরে আয়তন অনেক কম। দেশভেদে এবং ঋতুভেদে শরীরের অনেক পার্থক্য জন্মে, স্বীকার করি। কিন্তু খাদ্যানুসারেও যে পার্থক্য জন্মে তাহাও নিশ্চয়। এতদ্ব্যতীত মাংস ভোজনে সাহস ও বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বী হয়। অক্ষয়কুমার বাবু লিখিয়াছেন যে * কোন ব্যাঘ্রকে শিশুকালেই আনিয়া তৃণভোজন করিতে শিখান গিয়াছিল, তাহাতে দেখা গেল যে, সে বড় হইলে আর কাহাকেও দংশন করিতনা এবং তাহার সাহস একেবারে নষ্ট হইয়া গৃহপালিত পশুর মত হইয়া দাড়াইয়াছিল। মাংসে যে বুদ্ধিবৃত্তি তীক্ষ্ণ হয় তাহা মাংস ভোক্তামাত্রকেই পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন। একবার বিলাতে কোন ব্যক্তিকে ছয়মাস কাল ফল মূল তণ্ডুল খাইয়া রাখাগিয়াছিল। তাহাতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষীণ, ও স্মরণ শক্তি ম্লান হয়। পরে আবার মাংস ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া ছয়মাস মধ্যেই আপনার সেইপূর্ব্ব শক্তি গুলিকে পূর্ব্বাবস্থায় পাইল। সুতরাং ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গে মাংস ব্যবহার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু শৈশবে সেই মাংস ব্যবহার করিলে যে পরিমাণে উপকার হইবার সম্ভাবনা, এতদ্ভিন্ন আর কোন সময়ে নহে। কারণ শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বল, মানসিক বুদ্ধিনিচয়ের কথা বল, প্রথম হইতে [illegible] করিলে

---

* বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।

সেরূপ উৎকর্ষ লাভ করিবার সম্ভাবনা এমত আর কোন রূপে নহে। অনেকে জানেন, যে সন্তান শিশুকালে দুর্ব্বল থাকে, সে আর কখন বলবান হইতে পারে না। কিন্তু যে শৈশবে বলবান থাকে সে মাঝে দুর্ব্বল হইলেও যত্ন করিলে পুনরায় আপনার স্বাভাবিক বললাভ করিতে পারে। ইহাও অনেকে জানেন যে, একবার রোগ হইলে শরীর কখন ঠিক পূর্ব্বের মত হয় না। এইজন্য শৈশবাবস্থা হইতেই সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

এই সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। এই কথা শিশুদিগের সম্বন্ধে এবং লব্ধবয়ঃ যুবক সম্বন্ধেও প্রযোয্য। অতিরিক্ত মানসিকপরিশ্রমে আধুনিক ছাত্রেরা শরীরকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহারা শরীরকে এরূপ কষ্ট দিয়া থাকে যে, হয় পরীক্ষার সময়েই নয়পরীক্ষার পরেই তাহাদিগকে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। 'মন্ত্রং বা সাধয়েম শরীরং বা পাতয়েম' এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সমাজের কি পরিমাণ অনিষ্ট করে তাহা একবার চাহিয়াও দেখে না। শিশুদিগের সম্বন্ধে এতদ্বিষয়ে পিতা মাতার দৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। (*)

* এই দোষের কিয়দংশ শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষীয়দের উপর অর্শে না কি? তাঁহারা একটু অনুগ্রহ করিলেই ত ছাত্রেরা এই বিপদ হইতে নিস্কৃতি পায়।

দ্বিতীয়তঃ বঙ্গে এক্ষণে কিরূপ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। বিলাতেও এই বিষয়ে তর্ক হইতেছে। তাহারা বলিতেছে যে বিলাতে এক্ষণে কাব্যের কিছু উন্নতি আবশ্যক। আমরা বলিতেছি কাব্যে আমাদিগের হাড় জ্বালাতন হইয়াছে, আমরা কাব্য আর চাহি না। মূল কথায় সকলেরই সীমা আছে। কাব্যের যতদূর সীমা, বিলাতে ততদূর যায় নাই। আমাদিগের কাব্য সীমা ছাড়াইয়া এতদূর চলিয়া গিয়াছে যে কাব্যের জ্বালায় আমরা অস্থির। সেই যে জয়দেব 'ললিত লবঙ্গলতা' বলিয়া প্রেমের বাঁশরী বাজাইয়াছিলেন অমনি রসিক বাঙ্গালী কবি 'প্রেম' 'প্রেম' 'প্রেম' করিয়া পাগল। বিরহ বর্ণনা বসন্ত বর্ণনা বাঙ্গালীর লেখনীর অগ্রে বর্ত্তমান (*) কিছু দিনের জন্য আমাদিগের উচিত গভীর বিষয় আলোচনা করা। বঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি চাই। সেই তপস্যায় এক্ষণে নিমগ্ন হওয়া কর্ত্তব্য। কেবল যে আমরা কবিদিগের জ্বালার জ্বালাতন তাহা নহে, কাব্যপাঠকদিগের জ্বালায়ও কিয়ৎ পরিমাণে অস্থির। চতুর্দ্দশবর্ষীয় রসিক নাটক হাতে করিয়া দ্বারবদ্ধ করতঃ 'হা প্রেয়সী' 'হা প্রেয়সী' বলিয়া ভবিষ্যৎ প্রণয়িনীর সহিত আলাপ করে এবং তাহার বিরহে কাঁদিতে থাকে, ইহা কি কম জ্বালা-

* সুকবিরা ক্ষমা করিবেন। তাঁহাদের কথা আমরা বলিতেছি না। তাঁহারা বঙ্গের কুলতিলক।

জনক এবং শোচনীয় ব্যাপার? সুতরাং যাহাতে শিশুরা কাব্য পড়িয়া এইরূপ 'কবিত্ব' না পান তদ্বিষয়ে পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শৈশব হইতেই তাহাদিগকে বিজ্ঞানে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাত আট বৎসরের পূর্ব্বে সন্তানকে বিদ্যালয়ে পাঠান কর্ত্তব্য নয়। ইহাতে অনেকে বলিবেন, যে 'ক' 'খ' শিখিবার উপযুক্ত নয় সে বিজ্ঞান শিখিবে কিরূপে? আমরা তাহাদিগকে উপায় বলিয়া দিতেছি। বিদ্যালয়ে পাঠাইবার পূর্ব্বে যে শিশুর কোনরূপ শিক্ষা হইবে না তাহা নহে। মুখে মুখে সন্তানকে যত শিখান যায় ততই ভাল। মুখে মুখে শিখিতে মস্তিষ্কের পরিশ্রম হয় না এবং শিখিতেও আমোদ হয়। সুতরাং সে সময়ে যাহা শিখে তাহা আর জন্মে ভুলেনা। শিশু ঠাকুরমার নিকট কত আগ্রহের সহিত রাজা ও রাণীর গল্প শুনে। যাহারা শিখাইতে জানেন, তাহাদিগের শিশুরাও তাহাদিগের নিকট হইতে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শিক্ষা গ্রহণ করে। আমরা উদাহরণ দিতেছি। মনে কর তোমার শিশুকে তুমি বাগানে লইয়া গিয়াছ। একটি বৃক্ষের পত্র ছিড়িয়া তাহার হাতে দিয়া বলিবে এইরূপ পাতা বাগানে যদি আর থাকে লইয়া আইস। শিশু অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত একার্য্য করিবে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই পাতার সহিত অন্য পাতার সাদৃশ্য পাইলেই তুলিয়া আনিবে। অতি সামান্য মাত্র বিভিন্নতা থাকিলে সে বুঝিতে পারিবে না। তখন দুইটি পাতার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিবে। প্রথমে হয়ত সে বলিবে কিছুই নাই। পুনরায় তুমি ভাল করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিবে, তখন সে বহুকষ্টে একটি বিভিন্নতা দেখাইতে সমর্থ হইবে। তখন তুমি বলিবে আর কিছু আছে কি না? এইরূপে শিশু যতক্ষণ আপনি বলিতে পারে ততক্ষণ বলাইবে, পরে বলিয়া দিবে। এইরূপে শিশুর বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা জন্মিবে। একপ্রকার পাতার বিষয় শিখাইলে অন্যরূপ পত্রের বিষয় শিখাইবে। এইরূপে সে শীঘ্রই উদ্ভিজ্জ বিদ্যার মূলমন্ত্র হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া ফেলিতে পারিবে। এইরূপে তাহাকে ক্ষেত্রতত্ব, রসায়নবিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতি সকলেরই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ নীতিশিক্ষা। এসম্বন্ধেও শিশুদিগের উপর পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সন্তান বড় হইলে যাহাতে গুরুজনের অবাধ্য না হয়, সেইজন্য শৈশব হইতেই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে শিক্ষা কিরূপ? স্পেন্সর বলেন স্বভাবের শিক্ষা। অনেক পিতা মনে করেন যে, প্রহারে সকল শাসন হয়। যে সন্তান পিতার অবাধ্য তাহাকে প্রহার কর, ইহাই তাহাদিগের উপদেশ। এটি যে ঘোরতর ভ্রম তাহা বলা বাহুল্য। সন্তানকে কখন

প্রহার করিবে না। স্বভাবের শিক্ষায় শিশুকে শাসন করিবে। আমরা একটি উদাহরণ দিতেছি। মনেকর তোমার শিশু-সন্তান প্রদীপের নিকটগিয়া কাগজ পুঁড়িতেছে। যদি সে সময়ে তুমি তাহাকে প্রহার কর, তাহা হইলে সে ভাবিবে যে আমি কোন দোষ করিনাই তথাপি মার খাইলাম। কাজেই পিতার উপর তাহার অভক্তি জন্মিবে। এরূপ আর দুই চারিটি ঘটনা হইলেই পিতার উপর ক্রমেই অশ্রদ্ধা দৃঢ় হইয়া যাইবে। এবং তখন পিতার একান্ত অবাধ্য হইয়া উঠিবে। এবং সেই অবাধ্যতা শাসন করা পিতার সাধ্যাতীত। সুতরাং সন্তান যখন এইরূপ প্রদীপ লইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিবে, তখন পিতার উচিত যে তাহাকে মুখে বারণ করিয়া দেয়। পিতা বলিবে, 'দেখ এরূপ করিও না হাত পুড়িয়া যাইবে' শিশু হয়ত শুনিবে না। কিছু পরেই হাত পুড়িবে, এবং তখন পিতা যে ঠিক কথাটি বলিয়াছিল, এই জন্য পিতার প্রতি ভক্তি হইবে। এবং পিতার কেন অবাধ্য হইয়া ছিল তজ্জন্য দুঃখ করিবে। এবং সেই স্বভাবের শিক্ষা পাইয়া সে আর কখন অগ্নির নিকট যাইবে না। এইরূপে তিন চারি বার পিতার কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিয়া, এবং যখনই পিতার কথা অমান্য করিয়াছে তখনই বিপদ ঘটিয়াছে, এটি দেখিয়া পিতার প্রতি তাহার অচলা ভক্তি জন্মিবে।

মানসিক শিক্ষা ও নীতি শিক্ষা পরস্পর দুইটি ভগিনী। যেখানে মানসিক শিক্ষা সেই খানেই নীতি শিক্ষার আবির্ভাব, এবং যেখানে নীতি শিক্ষা সেই খানেই মানসিক শিক্ষার উন্নতি। জ্ঞানী হইলেই সৎ হয় এবং সৎ হইলেই জ্ঞানী হয়। সুতরাং পিতা মাতাদিগের কর্ত্তব্য যে, যাহাতে তাহাদিগের সন্তান দিগের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তি সকল যুগপৎ উন্নতিলাভ করে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন লওয়া। নৈতিক বৃত্তি ব্যতিত মানসিক বৃত্তির স্ফূরণ হয় না। মানসিক বৃত্তি ব্যতিত নৈতিক বৃত্তির স্ফূরণ হয় না।

কিরূপে শিশুদিগকে শিক্ষাদান করিতে হয় আমরা সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিলাম। যাহারা ইংরেজী জানেন না তাহাদিগের জন্যই এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। যাহারা ইংরেজী জানেন, তাহাদিগের প্রতি আমাদের অনুরোধ যেন তাঁহারা একবার স্পেন্সর কৃত মূলপুস্তক পাঠ করেন।

উপসংহার কালে আমাদিগের একমাত্র বক্তব্য যে এতদূর আসিয়া চিত্রটি ঔপন্যাসিক হইয়াছে বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করিবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, শিশুকে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা দেওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। ইহাতে যে যে উপকরণ আবশ্যক করে তাহার সকলগুলি একজনের ভাগ্যে ঘটা অসম্ভব। যে পিতার অর্থ আছে, তাহার হয়ত নিজের ভাল শিক্ষা নাই সে সন্তানকে কিরূপে

শিখাইবে?' যাহার শিক্ষা আছে তাহার সময় নাই ইত্যাদি শত শত বিঘ্ন যে ঘটে তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যতদূর সম্ভব ততদূর শিক্ষা কেন না দেই? যাহাদের উপরি বঙ্গের সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগের উন্নতির জন্য যে যত্ন না করিল সেকি মানুষ? শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের অনেক কথা বলিবার রহিল।

শ্রীম, চ—

জয়পুর।

৪র্থ খণ্ডের ৭ম সংখ্যার ৩৩৯ পৃষ্ঠার পর।

কুন্তলদেবের পরলোক গমনের পর তদীয় পুত্র পূজন সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। রাজপুত-কবিকুল-চূড়ামণি চাঁদ পুজন-চরিত্র যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে পুজনকে বীরকুলপুজনীয় বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। পুজনের সমগ্র বীরকীর্ত্তির অবতারণা করিতে হইলে সাময়িক পত্রের পত্র পৃষ্ঠার অবলম্বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক খানি স্বতন্ত্র গ্রন্থের প্রচার আবশ্যক হইয়া উঠে। সুতরাং তাহাতে আমাদের নিরস্ত হইতে হইয়াছে, অতএব পুজনের পরিচয় সংক্ষেপে বর্ণন করিতে হইল বলিয়া আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলাম।

চোমরায় হইতে পুজন ষষ্ঠ পুরুষ। এই অসাধারণ বীরপুরুষের বীরকীর্ত্তির প্রতিভা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে রাজকুলমাননীয় দিল্লীশ্বর চোহান বংশীয় বিখ্যাতনামা পৃথ্বীরায় পুজনের সহিত স্বীয় সহোদরার বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং সভাস্থ একশত আটজন প্রধান কুলীন সেনানায়কের মধ্যে তাঁহাকে প্রধান পদ প্রদান করিয়াছিলেন। পুজন এবম্প্রকার গৌরবাস্পদ পদের যথার্থ যোগ্য পাত্র ছিলেন। তিনি দুইবার মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমা-সংলগ্ন পার্ব্বত্য প্রদেশের খাইবার নামক বিখ্যাত গিরি-সঙ্কটে পুজন এক ঘোরতর যুদ্ধে যবন সেনাপতি প্রসিদ্ধ সাহাবুদ্দিনকে পরাভূত করিয়া গিজনী নগর পর্য্যন্ত তাঁহার পশ্চাৎ২ ধাবিত হইয়াছিলেন। তাঁহারই অস্ত্রশিক্ষা প্রভাবে চণ্ডালাধিকৃত মাহোবা দেশ পৃথ্বী রায়ের করতলস্থ হয়। পৃথ্বীরায় যে কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের পরম রূপ লাবণ্যবতী দুহিতাকে হরণ করেন, তদভিনয়ে পুজন শৌর্য্যবীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের এই অযথা ব্যবহারে কোপান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত পাঁচদিন ঘোরতর যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধব্যাপারে

চতুঃষষ্টি বীরপুরুষ স্বগণসমভিব্যাহারে পৃথ্বীরায়ের সহকারিতার জন্য নিযুক্ত থাকেন। পৃজন এই যুদ্ধেই প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

রাজকবি চাঁদ এই যুদ্ধের যেরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিয়দংশের অনুবাদ প্রকাশ করা গেল;

" মিবার বংশীয় গোবিন্দ গেহলোট পৃজনসহ সমবেত হইয়া শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। গোবিন্দের পতনে শত্রুদল আনন্দে নৃত্য করিতেছে দেখিয়া বীরাগ্রগণ্য পৃজন কুলিশপাতের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। উভয় করে ভীষণ খড়্গ ধারণ করিয়া অবিরত শত্রুমুণ্ড নিপাত করিতে লাগিলেন। চারিশত যোদ্ধা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাঁহার সাহায্যার্থে কেবলমাত্র কেহরি, পীপা, বোহো, নরসিংহ এবং কচরা এই ভ্রাতৃপঞ্চ সশস্ত্রে উপস্থিত ছিলেন। নিরন্তর বল্লম ও খড়্গ চালিত হইতে লাগিল, অনবরত নরমুণ্ড বর্ষণ হইতে লাগিল এবং নরশোণিতে রণভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। এমন সময়ে পৃজন জয়চন্দ্রের যবন সেনাপতি ইতিমাদকে আক্রমণ করিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন, কিন্তু তাহার মস্তক ভূমিতে পতিত হইতে না হইতেই তাহারই পরিত্যক্ত কালরূপী বল্লম পৃজনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। কূর্ম্ম * বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। অপ্সরাগণ তাঁহার দেহ লইয়া বিবাদ করিতে লাগিল। রণভূমি মৃতদেহে আচ্ছন্ন হইল, মহাদেবের মালায় অনেক নরমুণ্ড সংযোজিত হইল। পৃজন ও গোবিন্দের পতন সময়ে দিবা এক প্রহর মাত্র অবশিষ্ট ছিল। ভ্রাতৃগণের উদ্ধার সাধনার্থ পন্থহন্ কম্পিত দেশমধ্যে প্রাণ শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কনৌজশ্রেণী স্তম্ভিত হইল, জয়চাঁদের ঘোষণকারী সদৃশ নিবিড় সৈন্য পশ্চাদ্বিমুখ হইল। পৃজনের ভ্রাতা ও পুত্র বীরকুলগৌরব বর্ণের ন্যায় বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়েই রণশয্যায় শয়ন করিলেন। সূর্য্যদেব আপনার রথ প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বর্লোকে লইয়া গেলেন।

" এই মহাযুদ্ধের ভীমগর্জ্জনে নাগা ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন, চন্দ্রদেব কম্পিত হইলেন, দিক্‌পালগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন, কনৌজ সম্প্রদায় প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং এই অবকাশে পৃজনাত্মজ পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। পৃজন পৃথ্বীরায়ের বন্ধুস্বরূপ ছিলেন। বানাকুজের বীরগণকে তিনি অতি তীব্রতর অস্ত্রসকল দান করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরকীর্ত্তি বর্ণন করা কবিরও সাধ্য নহে। তিনি শেষ নাগোপরি পাদস্থাপন করিয়া নরবন নির্মূল করিয়াছিলেন। বীরসন্তান কেহই তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে নাই। পৃজন রণশয্যায় শয়ন করিয়া কহিয়াছিলেন,—' মনুষ্যের একশত বৎসর মাত্র

* পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কচ্ছপ হইতে কচ্ছবহ বংশের নাম হওয়ায় পৃজনকে কূর্ম্ম বলা হইয়াছে।

পরমায়ু, তাহার অর্দ্ধেক রজনীর অন্ধকারে বিনষ্ট, তাহারও অর্দ্ধেক বাল্যক্রীড়ায় বৃথা অতিবাহিত হয়, কিন্তু জগদীশ্বর আমাকে খড়্গ ধরিতে ক্ষমবান করিয়াছিলেন।' তিনি এই কথা বলিতে বলিতে যখন কৃতান্তের করকবলিত হন, সেই সময়ে স্বীয় পুত্রের হস্ত শক্রমধ্যে বিকসিত দেখিতে পান। তাহাতে তাঁহার আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। মালসী সাতবার অস্ত্রাহত হন, তাঁহার ঘোটক অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হয়। পূজনপুত্র অত্যদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

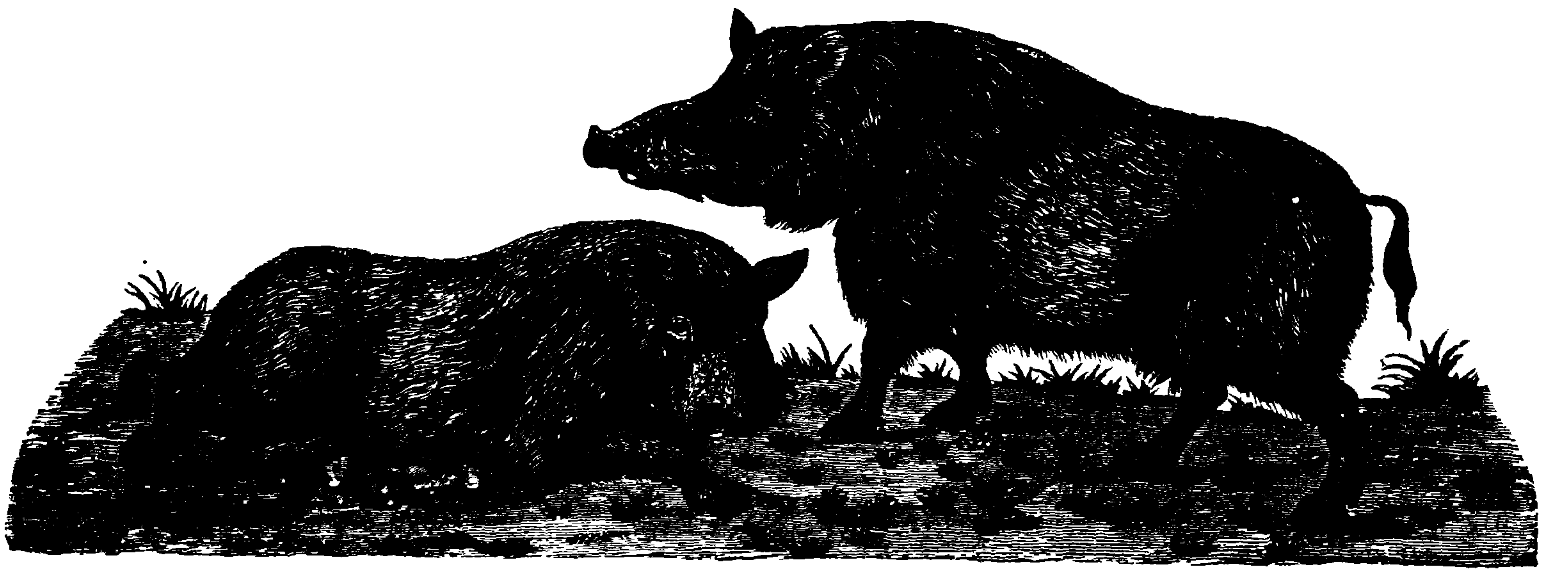
পূজনের কনিষ্ঠ পুত্র মালসী অম্বররাজ্যে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, রাজকবি চাঁদ "পৃথুরায় রাসু" নামক তদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মালসীর ভূয়োসী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মালসী কুরাহি নামক স্থানে এক ঘোরতর যুদ্ধে মাণ্ডুরাজকে পরাভূত করেন। মালসী হইতে দশম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজগণ কেহই কোন বিশেষ কার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। যথাক্রমে তাঁহাদের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।—বিজল, রাজদেব, কীলন, কুন্তল, জুন্সী, উদয়কর্ণ, নরসিংহ, বনবীর, উদ্ধারণ, ও চন্দ্রসেন। এতন্মধ্যে উদয়কর্ণের এক পুত্র বালোজী কোন কারণ বশতঃ পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমূর্ত্তশীর নগর অধিকার করিয়া তথায় বাস করেন। তাঁহার পৌত্র শিখজী ঐ ক্ষুদ্র রাজ্য ক্রমে বিস্তার করিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার শিখাবতী নাম প্রদান করেন।

চন্দ্রসেনের পুত্র পৃথ্বীরাজ। পৃথ্বীর সপ্তদশ পুত্র, তন্মধ্যে দ্বাদশজন মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হন। তিনি জীবদ্দশাতেই ঐ দ্বাদশ পুত্রকে আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। তাঁহাদিগের দ্বারাই কচ্‌বহ্‌ বংশের দ্বাদশ শাখা সংস্থাপিত হয়। ঐ দ্বাদশ শাখার নাম কচবহ্‌ বংশের "দ্বাদশ কোটরী" বলিয়া বিখ্যাত আছে। পৃথ্বীরাজ পুত্রগণের মঙ্গল সাধনে বিশিষ্ট রূপে যত্নবান্‌ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এক কালরূপী পুত্র ভীমসিংহ তাঁহার বধ সাধন করিয়া সিংহাসন অপহরণ করে। কালের কি বিচিত্র গতি! দুর্ব্বৃত্ত পিতৃহন্তা ভীমসিংহ এই দুষ্কৃতিলব্ধ রাজ্য অধিক কাল ভোগ করিতে পারে নাই। হাতে হাতেই ইহার ফলভোগ করিয়াছিল। তদীন দুরাচার পুত্র ঐশকর্ণ স্বগণগণের পরামর্শানুসারে পিতৃহন্তা পিতার বধ সাধন করে। * এই দুরাচার পিতৃবধের

* বোধ হয় ঐশকর্ণের এই দুরাচারিতা সম্বন্ধে তৎকালীন সম্রাট বাবর সাহের কিছু পরামর্শ ছিল, কারণ, রাজপুত ইতিহাস বেত্তারা কহেন, ঐশকর্ণ তীর্থযাত্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সম্রাট সন্নিধানে উপস্থিত হইলে বাবারসাহ তাঁহাকে 'নরবারের রাজা' এই উপাধি প্রদান করিলেন। এই নরবার রাজের বংশ কচ্‌বহ বংশের শাখাস্বরূপ গণনীয় হয়।

PACHYDERMATA OR THICK SKINNED ANIMAL

স্থূলত্বক্ পশু—শূকর।



Though the animal does not display any very great amount of literature, it exhibits a capacity of observation and obedience, which would hardly have been expected from so maligned an animal.——WOOD

পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তীর্থযাত্রা করিয়াছিল। অম্বর রাজ্যের কোন কোন রাজাবলীর মধ্যে এই দুই দুরাত্মার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ-হয় ঘৃণাপাত্র বলিয়াই পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পৃথ্বীরাজের পুত্র বাহার মল্ল সর্ব্ব প্রথমেই মুসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করেন। তিনি বাবর সাহের অনেক সহায়তা করেন এবং হুমায়ুন বাদসাহ কর্ত্তৃক "পঞ্চ হাজারী মন্ সব্" অর্থাৎ কখন রাজার অপুত্রতা নিবন্ধন কচ্বহ সিংহাসন শূন্য হইলে এই বংশ হইতে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত হয়। যখন অম্বরের শেষ রাজা জগৎসিংহ গতায়ু হন, তখন তাঁহার অপুত্রতা নিবন্ধন নরবার বংশ হইতে এক পুত্র আনিয়া উত্তরাধিকারী হন। পাঁচ হাজার অশ্ব সৈন্যের অধিনায়ক এই উপাধি প্রাপ্ত হন। বাহার মল্লের পুত্র ভগবান দাস মোগল সম্রাটদিগের সহিত অত্যন্ত সম্প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। আকবর অত্যন্ত কৌশলী ছিলেন। প্রতাপশালী ব্যক্তিগণের সহিত সম্প্রীতি করিতে তাঁহার কোন চেষ্টারই ত্রুটি হইত না। জানি না, তিনি ভগবান দাসকে কি কুহকে ভুলাইয়া ছিলেন। কচ্বহ রাজ মোগল রাজবংশের একপ অনুরাগী হইয়াছিলেন যে, আকবর পুত্র জাহাঙ্গীরের সহিত আপন দুহিতার বিবাহ দিয়া সূর্য্যকুল কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই পরিণয়ের ফল স্বরূপ রঘুবংশীয় কুলকামিনীর গর্ভে খসরু নামা দুর্ভাগা রাজকুমারের জন্ম হয়।

(ক্রমশঃ।)

শূকর।

বিগত বারের বান্ধবে আসিয়া এবং আফ্রিকা এই উভয় ভূখণ্ডের হস্তীর বিষয় উল্লেখ করিয়া কেবল আসিয়ার হস্তীরই বিবরণ লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আফ্রিকার হস্তীর জীবনবৃত্তান্ত উপযুক্তরূপে সংগ্রহ করিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলাম, এই বারের বান্ধবে তাহা প্রকাশ করিব। কিন্তু এবারও আফ্রিকার হস্তীর বিবরণ উপযুক্তরূপ সংগৃহীত হয় নাই, সুতরাং স্থূলচর্ম্মজাতীয় আর একটি পশুর জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠকের সমীপে উপস্থিত করিলাম, ইহার শীর্ষক দেখিলেই পাঠক ইহাকে চিনিতে পারিবেন, এই জন্তুকে বিশেষরূপে চিনিবার কারণ এই, আমাদিগের দেশে মনুষ্যনিবাসের নিকটে এই জাতীয় ভিন্ন অন্য কোন স্থূলচর্ম্মজাতীয় জন্তু বাস করিতে দেখা যায় না। ইহারা যেমন বলশালী তেমনি ভ-

রাবৎ। শরীর যেমন বলিষ্ঠ, স্বভাবও তেমনি কর্কশ এবং আকৃতিও তদনুরূপই হাস্যাস্পদ। অন্যান্য জন্তুর যেমন দূর হইতেই শরীর ও মস্তক পৃথক্‌রূপে দেখা গিয়া থাকে, শুকরের সেরূপ নহে। ইহাদিগের মস্তক ও শরীরের সংলগ্ন স্থান অতি খর্ব্ব ও স্থূল। শরীরের অন্যান্য স্থান কঠিন এবং মাংসল। শূকরের সর্ব্বাঙ্গ মোটা মোটা রোমাবলী দ্বারা আবৃত, কিন্তু উহা ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। ঘাড়ের রোমগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, মোটা ও দৃঢ়। সাধারণ ভাবায় এই রোমগুলিকে 'কুঁচি' বলে, আমরাও এখানে উহাকে শূকরের রোম না বলিয়া কুঁচি বলিব। এই কুঁচিগুলি মনুষ্যের অনেক কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, এদেশীয় প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগকে ইহা দ্বারা শাঁখা ও গহনা পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছি।

যখন শূকরের ক্রোধ হয়, তখন ঘাড়ের কুঁচিগুলি খাড়া হয়, কিন্তু শরীরের অন্যান্য স্থানের রোম ঐরূপ খাড়া হইতে পারে না। ইহাদের চক্ষু নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নিস্তেজ। মাথা হইতে নাসিকার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ১৬।১৭ ইঞ্চ দীর্ঘ। শরীর এবং মাথার সংলগ্ন স্থল অর্থাৎ গলা প্রায় মুখের সমানই পরিসর; এই স্থান হইতে মুখের অগ্রভাগ এমন সরু হইয়া আসিয়াছে যে, উহা দুই ইঞ্চের অধিক হইবে না। উপরের ওষ্ঠের মধ্য দিয়াই ইহাদের নাসারন্ধ্র মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ওষ্ঠের অগ্রভাগটি চেপ্টা, দৃঢ় এবং কার্য্যোপযোগী। শূকরের মাথা হইতে লাঙ্গুল পর্য্যন্ত এমন সমভাবে মাংসপেশীসকল সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে যে, এক দিক হইতে অন্যদিকে হাত বুলাইয়া নিলে অস্থির অনুসন্ধান পাওয়া ভার।

উহাদের চারি পায়ে প্রত্যেকটিতে দ্বিখণ্ডিত ক্ষুর। এবং ক্ষুরের বিপরীতদিগের উপরিভাগে প্রত্যেক পায়ে দুইটি করিয়া উপক্ষুর আছে। এই উভয় প্রকার ক্ষুরই একই উপকরণে নির্ম্মিত, এবং বেশ একটুকু ধারাল। উহাদের শরীরের সহিত তুলনা করিলে ক্ষুরগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়। তথাপি চলিবার কিংবা দৌড়িবার সময় কোনরূপ অসুবিধা হয় বলিয়া অনুমিত হয় না।

শূকরের দৈর্ঘ নাসিকার অগ্রভাগ হইতে লাঙ্গুলের শেষ পর্য্যন্ত ৪ হাতের বড় বেশী হইতে দেখা যায় না। উচ্চতাও ২।২॥ ফিটের অধিক নহে। সচরাচর ইহাদিগের দৈর্ঘ্যতা ও উচ্চতা ইহা অপেক্ষা কিছু কম আজি তিন বৎসর হইল, আমরা যে একটি শূকর শিকার করিয়াছিলাম, উহা হইতে বৃহৎ শূকর অনেকেই দেখে নাই বলিয়াছিল। উহারই শরীরের মাপ প্রথমে লিখিত হইয়াছে।

ইহাদের লাঙ্গুল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। লাঙ্গুলের অগ্রভাগটি অল্প কএক গাছি কুঁচি সন্নিবিষ্ট। উহারা সর্ব্বদাই ঐ ক্ষুদ্র লাঙ্গুলটি এদিক ওদিক ঘুরায়, কিন্তু আমরা

বুঝিতে পারি না যে উহাদ্বারা শূকরের কি উপকার হয়। এদেশীয় পূর্ণায়তন বন্য শূকরের বর্ণ গাঢ় ধূসর। কিন্তু শিশুগুলির বর্ণ বৃদ্ধ গুলির বর্ণের সহিত যার পর নাই অনৈক্য। শিশু গুলির লোম কোমল ও ঘন সন্নিবিষ্ট। এবং লোমের বর্ণ পিঙ্গল ও তাহার উপরে অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমাণ পরিসর ব্যাপিয়া হরিদ্রা রঙ্গের ডোরা দৈর্ঘ ভাবে শরীরের সমস্ত অঙ্গেই বিস্তৃত থাকে। উহারা যত বড় হইতে থাকে, ততই শরীরের বর্ণ ধূসরে পরিণত হইয়া যায়। জন্মিবার ২। ৩ মাস পরে উহাদের গর্ভ পশমগুলি পড়িয়া গিয়া ধূসর কুঁচি দ্বারা আবৃত হয়।

পূর্ণবয়ঃপ্রাপ্ত শূকর অনেক গুলি একত্র থাকিতে পারে না, যদিও কখন কখন একদলে ২০। ২৫টা শূকর একত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহারা একটিরই সন্তান সন্ততি। শূকরী ৬ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া এক কালে কতকগুলি সন্তান প্রসব করে। এমন কি আমি নিতান্ত বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, একটি মৃতা শূকরীর গর্ভ হইতে ২০টি সন্তান বাহির করা হইয়াছিল। কোন কোন শূকরীর প্রসব কালের কিছুদিন পূর্ব্বে উদর এবং স্তন এমন ঝুলিয়া পড়ে যে, উহা ২। ৩ ইঞ্চের জন্য মৃত্তিকা স্পর্শ করে না। বৃদ্ধ শূকরী গুলিরই এইরূপ উদর ঝুলিয়া পড়ে। গিলবার্ট্ হোয়াইট্ নামক জনৈক ব্যক্তি একটি শূকরের বিষয় এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐ শূকরীটি মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে অন্যূন ৩০০শত সন্তানের গর্ভধারিণী হইয়াছিল। শূকরী প্রসব কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে শুষ্ক পত্র, ঘাস ও অন্যান্য ডাল পালা দিয়া একটি কুটির নির্ম্মাণ করিয়া লয়, এবং উহা এইরূপ আশ্চর্য্য কৌশলে প্রস্তুত যে বৃষ্টির জল কিম্বা রৌদ্রের তেজ উহাতে কোন মতেই প্রবেশ করিতে পায় না। এতদ্দেশীয় ছোট লোকেরা এই প্রকার কুটিরকে 'শূকরের ডেরা' কহে। এই কুটির দেখিলে বোধ হয় যেন মনুষ্যে কতগুলি ঘাস পাতা একত্র রাখিয়াছে, প্রকৃত কুটিরের সহিত ইহার কোন সাদৃশ্য নাই। এদেশীয় শূকরেরা প্রায়ই বর্ষাকালে হৈমন্তিক ধান্য ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ জঙ্গলে এবং শীত ঋতুতে কাঁটা ঝোপার নীচে এইরূপ ডেরা প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রসব কালে উহারা দাড়াইয়া ঐ কুটিরের নিকটে প্রসব করে, প্রসব বেদনার সময় কোন ভয় পাইয়া যদি শূকরীকে স্থানান্তর যাইতে হয়, তবে তাহাতেও শূকরীর প্রসব কার্য্যের কোন প্রতিবন্ধক জন্মায় না। উহারা যেমনি অগ্রসর হইতে থাকে, অমনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ সন্তান গুলি ভূমিতে নিপতিত হয়। আবার সন্তান গুলি এমনি সবল যে, মাটিতে পড়িয়া দুই মিনিট কাল নড়িয়া চড়িয়াই তাহাদের প্রসূতীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে থাকে। এই রূপ আশ্চর্য্য কথা শুনিলে, সহসা যে পাঠক ইহাকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়া হাসিয়া উড়া-

ইবেন, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই,কিন্তু এই অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত কার্য্যকলাপ যতই পর্য্যালোচনা করিতে থাকিবেন, ততই ইহা হইতে অনেক নূতন ও আশ্চর্য্য বিষয়ের আবিষ্কার হইতে থাকিবে। সুতরাং সামান্য বিষয়ের একটি আশ্চর্য্য বিষয়ের কথা শুনিয়া কেহই ইহাকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া উপহাস করিবেন না। শূকরীর বুক হইতে পেট পর্য্যন্ত ২ পংক্তিতে ৬টি করিয়া ১২টি স্তন। পশ্চাৎ দিকস্থ শেষ দুইটি স্তনে একেবারেই দুগ্ধ হয় না। অন্য গুলিতে সমভাবেই দুগ্ধ সঞ্চার হইয়া থাকে।

শূকর শাবকেরা ৩। ৪মাসের অধিক মাতৃস্তন্য পান করে না। কিন্তু বহু সন্তানবতী বলিয়া শুকরী এই অল্প সময়ের মধ্যে এমন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে।

শূকরীর সন্তানের জন্য অত্যন্ত মমতা। যদি অন্য কোন বৃহত্তর জন্তু শূকরীর শাবক দিগকে আক্রমণ করিতে যায়, তখন সে অবশ্যই তাহাকে প্রত্যাক্রমণ করিবে। শুকরীর সামান্য দন্ত ভিন্ন যদিও আর কোনরূপ প্রতিযোগিতা করিবার অস্ত্র নাই, কিন্তু তথাপি সেই অস্ত্রই উহারা এমন দ্রুতগতিতে চালাইতে পারে যে, মুহূর্ত্তের মধ্যে একজনকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

যে পর্য্যন্ত শূকরীর পুনরায় গর্ভসঞ্চার না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ ছাগুলি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। এই ছাগুলি বড় হইলে একদলে অনেকটি শূকর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহাদের মাতা পুনরায় প্রসব করিলে ইহাদের সহিত আর কোন সম্পার্ক রাখে না। তখন উহারা আপনারাই সন্তানের মা বাপ হইতে আরম্ভ করে।

মৃত্তিকা খনন করিবার জন্য শূকরজাতি নিতান্তই উৎসুক। ইহাদের আহার্য্য বস্তুর অন্বেষণ করিতে অনেক সময় মৃত্তিকা খননের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ইহারা অনর্থকও ঐরূপ মৃত্তিকা খনন করিয়া রাখে। ইহাদের মৃত্তিকা খননের অস্ত্র উপরের ওষ্ঠ বা নাসিকার অগ্রভাগ। তেমন কঠিন মৃত্তিকার মধ্যেও উহা প্রবেশ করাইয়া বল প্রয়োগ করিলে উহা উঠিয়া আইসে। নাসার ফুৎকারও এমনি প্রবল যে, খোদিত মৃত্তিকা একবার ফুৎকার করিলেই উহা দূরে সরিয়া যায়। শূকরের নিম্ন ওষ্ঠ অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব এবং উপরি ওষ্ঠের মধ্যেই উহা রক্ষিত হয়, সুতরাং মৃত্তিকা খনন করিবার সময় উহাতে কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয় না।

পূর্ব্বে আমরা যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহাতে পুংশূকরের কোনরূপ কথারই উল্লেখ করি নাই, নিম্নে উহাদের স্বভাবে এবং আকৃতিতে শূকরী হইতে যাহা কিছু অনৈক্য আছে, তাহা লিখিত হইল।

পুংশূকরের উপরের এবং নীচের মাড়ির উভয় পার্শ্ব হইতে প্রত্যেক দিকে দুইটি অতি বৃহৎ দন্ত নির্গত হইয়া উপরের দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। ঐ দন্তগুলি সম্পূর্ণ গোল নহে, ত্রিকোণ এবং উহার

প্রত্যেকটি কোণ অত্যন্ত ধারাল। দন্তের যে ভাগ বাহিরে থাকে, উহা নিরেট এবং যাহা মাংস ও মাঢ়্যাস্থির মধ্যে থাকে, তাহা শূন্যগর্ভ। হস্তীদন্তের ন্যায় এগুলিও উৎকৃষ্ট রদ *। উহাদের আত্মরক্ষার জন্য এই দন্ত চারিটি প্রধানতম অস্ত্র। এই চারিটির মধ্যে নীচের দুইটি অধিক কার্য্যকারী। যে কোন পশুই কেন হউক না, যদি একবার উহার শরীরে দন্তবিদ্ধ করিতে পারে, তবে উহার শরীর ৮। ১০ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিতে পারে। পরে ইহার যে দুই একটি দৃষ্টান্ত লিখিত হইবে, পাঠক তাহা পড়িয়া বিস্মিত হইবেন। এদেশীয় ছোট লোকেরা এইরূপ দন্তবিশিষ্ট বড় বড় শূকরগুলিকে " বয়রা " কহে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে এই নর শূকর গুলির শ্রবণ শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু ইহা নিতান্তই একটি ভ্রম মূলক সংস্কার। এইরূপ সংস্কার হইবার একটি কারণ আছে, তাহা এই,—আমি দেখিয়াছি অত্যন্ত বলবান শূকর গুলি কোন প্রকার শব্দ পাইলেও বড় কিছু একটা মনে করে না। যখন উহারা ক্ষেত্র চাষ করিতে আসে, তখন কোন রূপ সামান্য শব্দে উহারা ভয় পায় না, বরং অহঙ্কার করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এজন্য কৃষকেরা মনে করে ইহারা কানে শোনে না।

শূকরের যুদ্ধ বড় ভয়ানক। ইহাদিগের দুইটি পুং শূকরের অন্য কোন সময়ে যুদ্ধ হউক আর না হউক, যখন একটি শূকরীর গর্ভ সঞ্চারের সময় উপস্থিত হয়, তখন দুইটি সমবলশালী শূকর একত্রে উপস্থিত হইলে আর রক্ষা থাকে না। যুদ্ধের অপরিহার্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া উহার একটি না একটি হত হয় বটে, কিন্তু অক্ষত শরীরে বিজয়ী হইবার সাধ্য নাই। এতদ্ব্যতীত যখনই ইহারা কাহারও উপরে ক্রুদ্ধ হয়, তখনই ইহারা ভয়ানক রূপ ধারণ করে। নিজ হইতে দশগুণ বড় জন্তু হইলেও আক্রমণ করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না। আমি অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি যে, একটি চিতা ব্যাঘ্র আহারের জন্য একটি শূকরকে ধরিয়াছিল, এবং শূকর ও ব্যাঘ্রকে ফিরিয়া এমন ভয়ানক আঘাত করে যে উভয়েরই এক স্থানে মৃত্যু হয়।

শূকরেরা সময় সময় এমনি কুৎসিত শব্দ করে, যে তাহা শুনিলে কর্ণ কপাটি ধরিয়া যায়। ঘটনাক্রমে যদি কোন শুকরের সম্মুখে ছোট ছোট বাঘ উপস্থিত হয়, তবে শুকরের চীৎকারে দৌড়িয়া পলায়, অথবা নিকটস্থ বৃক্ষে আরোহণ করে।

* ইংরাজিতে আইভরি শব্দে যে প্রকার অস্থিকে বুঝা যায়, বাঙ্গলাতে সেইরূপ অস্থিবোধক কোন শব্দ নাই; আমি বঙ্গসাহিত্যজগতের একটি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করাতে, তিনি আমাকে আইভরি শব্দের অর্থ রদ লিখিতে বলিলেন। আমি ভরসা করি, তাঁহার এই উপদেশ বাঙ্গলাতে উপেক্ষিত হইবে না।

পুংশূকরের শরীরের গঠনে অধিক কিছু প্রভেদ নাই বটে, কিন্তু তথাপি প্রকৃতিতে, পুরুষ এবং স্ত্রীর গঠনে যে পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা ইহাদিগের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। পুংশূকরের বক্ষ অধিকতর প্রশস্ত এবং কটিদেশ একটুকু সরু। ইহাদের মুষ্ক অতি বিচিত্রভাবে গুহ্যদ্বারের নিম্নে মাংসের সহিত লাগিয়া রহিয়াছে, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে না দেখিলে হঠাৎ ঐ স্থানের অত্যল্প উচ্চতা অনুভব করা যায় না। শূকরের মুষ্ক, শুনিয়াছি দুর্ব্বল গোরুর অতি বলকারক ঔষধ। আমি ইহা স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই, যাহারা পরীক্ষা করিয়াছে, তাহাদের নিকটে শুনিয়াছি।

শূকরের শরীরে স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ অধিক বসা আছে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যখন শস্য পরিপক্ক হয় এবং উহারা উপযুক্তরূপ আহার পায়, তখন ইহাদিগের বসা আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মাংসও নাকি অপেক্ষাকৃত তখন সুস্বাদু হয়। এদেশীয় চণ্ডাল এবং ফিরিঙ্গিরা আমাকে এবিষয় অবগত করাইয়াছে। উহারা ইহাও বলে যে, যখনি পেয়ারা পাকিয়া উঠিলে শূকর উহা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তখন উহাদের বসা কমিয়া যায়, মাংসও সুস্বাদু রহেনা।

এদেশীয় শস্যের পক্ষে বন্যশূকর এক ভয়ানক শত্রু। ইহারা বহুসংখ্যক এক সময়ে একত্র হইয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, এবং যত না আহার করে, তাহার দশগুণ অনিষ্ট করিয়া যায়। শূকরেরা সচরাচর রাত্রিতেই আহারাদি করে, দিবসে কাঁটা ঝোপার নীচে শুইয়া থাকে।

শস্য রোপণের পূর্ব্বে শূকরগুলি কোন কোন ক্ষেত্র এমনভাবে খুঁড়িয়া রাখে যে প্রথম দৃষ্টিতে উহা কর্ষিত ভূমি বলিয়া বোধ হয়। এদেশীয় কৃষকেরা শুকরের দৌরাত্ম্য হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য সুন্দর একটি উপায় অবলম্বন করে। ক্ষেত্রের কোন এক স্থানে উচ্চ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া লয়। কৃষকেরা উহাকে "টং" বলে। সমস্ত রাত্রি 'টং' এ বসিয়া বন্দুক কি অন্য কিছুদ্বারা ভয় দেখাইয়া শূকরদিগকে ক্ষেত্রে আসিতে দেয় না। যদি একটি রাত্রি কৃষকেরা এইরূপ সতর্কতার সহিত না থাকে, তবে পরদিবস জমীদারের নিকটে বৎসরের খাজানা মাপ পাওয়ার জন্য তাহাদিগকে করজোড় করিয়া কাঁদিতে হয়। কোন কোন দাঁতাল শূকর এমন ভয়ানক ক্রোধী যে, যে দিক হইতে উহাদিগের প্রতি বন্দুক ছোড়া যায়, ধূঁয়া দেখিয়া সেই দিকেই আক্রমণ করিতে দৌড়িয়া আইসে। শিকারীরা যদি শূকরের এই প্রকার স্বভাব অবগত না থাকে, তবে তাহাদের পক্ষে ইহা নিতান্ত বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়ায়। পদব্রজে শিকার করিতে হইলে, শূকরের নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার একটিমাত্র সামান্য উপায় আছে;—শূকর যখন সোজাভাবে শিকারীকে আক্রমণ করিতে

দৌড়িয়া আইসে, তখন যদি শিকারীও কেবল সোজাভাবে না দৌড়াইয়া একবার এদিক ওদিক বক্রগমনে দৌড়িতে থাকে, তবে অনেকটা রক্ষা পাইবার আশা থাকে। শূকর সোজা দৌড়িয়া মনুষ্যকে ধরিতে পারে বটে, কিন্তু মনুষ্য বক্রগমনে একদিকে সরিয়া গেলে, শূকর তাহার প্রকাণ্ড শরীরের সম্মুখগতি রোধ করিয়া হঠাৎ মনুষ্যের দিকে ফিরিতে পারে না। সুতরাং এই নিয়ম জানা থাকিলে সময় সময় অনেকটা উপকারের সম্ভব। প্রকৃত পক্ষে মাটিতে দাঁড়াইয়া শূকর শিকার করা নিতান্তই অন্যায়। হস্তীর উপরে থাকিলে শূকর শিকারে একেবারেই আশঙ্কা নাই। শূকরীরা মনুষ্যদিগকে এরূপ সাহসিকভাবে আক্রমণ করে না; কোন রূপ শব্দ শুনিলেই দৌড়িয়া পলায়।

ইদানীং সাহেবেরা অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া বল্লমদ্বারা শূকর হত্যা করিয়া থাকে। (শূকর শিকারের বল্লমগুলি মুঙ্গের প্রদেশে প্রস্তুত হয়, ইহার ফলকের সহিত ৪। ৫ ফিট একটি বংশদণ্ড লাগান থাকে ও ঐ দণ্ডের অপর প্রান্তে কতকগুলি সীসক গলাইয়া ভারি করিয়া দেয়।) হস্তী দ্বারা কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বন হইতে শূকরগুলিকে তাড়াইলে যেমন উহারা মাঠে বাহির হয়, অমনি উহার পিছে পিছে অশ্ব চালাইয়া পৃষ্ঠে বল্লম বসাইয়া দেয় এবং সময় সময় এইরূপ শিকারীরা এরূপ বিপদে পড়ে যে, তাহার গল্প শুনিলে বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া থাকা যায় না।

এদেশের একজন মৃগয়াপ্রিয় প্রসিদ্ধ ভূস্বামীর বল্লমশিকার করিবার অভ্যাস ছিল। তিনি এক দিবস এইরূপে একটি শূকরকে আহত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে শূকরও মরিল না, দুর্বিপাক বশতঃ হাত হইতে বল্লমও পড়িয়া গেল। এমন সময় শূকর ভয়ানকরূপে আক্রমণ করাতে তিনি ঘোড়া লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিলেন, শূকরও তাঁহার পিছে পিছে ছুটিল। তিনি যাইতে যাইতে একটি কর্দ্দমময় স্থানে ঘোড়া সহিত একেবারে গাড়িয়া পড়িলেন, শূকরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সেই কর্দ্দমাক্ত স্থানে গাড়িয়া পড়িল। সুতরাং শূকর আর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না, ইত্যবসরে সঙ্গীয় একটি লোক গিয়া শূকরকে সংহার করিল।

১৮৭৬ সনে শিকার সময়ে একটি আহত শূকরে ক্রমান্বয়ে ৭। ৮টি হস্তীকে পরাস্ত করে। শূকরটি আহত হইয়া একটি জঙ্গলে ছিল, উহাকে বাহির করিবার জন্য যেমন একটি হস্তী ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করে, অমনি উহার পায়ে দাঁত বিঁধাইয়া উহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর সকল গুলি হস্তী একেবারে জঙ্গলে প্রবেশ করাইয়া উহাকে বাহির করিয়া হত্যা করা হয়।

শূকরের প্রধান আহার্য্য কচু, ধান,

কেঁচুয় ইত্যাদি। কখন কখন বা মৃতদেহ পর্য্যন্ত ইহাদিগকে আহার করিতে দেখা গিয়াছে। পালিত শূকরেরা এতদ্ভিন্ন এত অপরিষ্কার বস্তু আহার করে যে, তাহা মনে হইলেও ঘৃণা উপস্থিত হয়।

শূকরের প্রাণ অত্যন্ত কঠিন। ফুস ফুস ভিন্ন শরীরের অন্য স্থানে ৭। ৮টি গুলি লাগিলেও শীঘ্র প্রাণে বিনষ্ট হয় না। আমি একটি শুকরকে বারটি গুলি মারিয়াছিলাম। শূকরের শিশুগুলিও অত্যন্ত কঠিনপ্রাণ। একটি অল্পবয়স্ক শূকর-শিশুকে গুলি মারিলে উহার সমস্ত নীচের ওষ্ঠ ও গলার কতক অংশ ছিঁড়িয়া গেল; তবুও প্রাণে মরিল না। আমার সঙ্গে বেড্‌ফোর্ড নামে বলশালী জনৈক ইংরেজ ছিল, তিনি বলিলেন, "যখন শূকরটি বাঁচিবে না, তখন শীঘ্র মারিয়া ফেলাই ভাল।" এই বলিয়া তিনি একটি লাঠী দ্বারা উহার মস্তকে সজোরে ১০। ১২ টী আঘাত করিলেন, তথাপি উহার প্রাণ বিয়োগ হইল না।

শূকরকে শিশুকাল হইতে যত্ন করিয়া পুষিলে বেশ পোষ মানে। এদেশে মাঝে মাঝে অনেককেই শূকর পুষিতে দেখাযায় এবং উহাদের মধ্যে শূকরের বর্ণেরও নানা বৈচিত্র পরিলক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশস্থ শূকরের রঙ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এবং ইহাদের শকর জাতিরও বিভিন্ন প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে। এই শূকর শাবক গুলির বর্ণ পূর্ব্বোল্লিখিত শূকর শাবকের বর্ণের ন্যায় নহে। উহাদিগের শরীরের যে বর্ণ (সাদা কাল প্রভৃতি) জন্মিবার সময়ই তাহা পরিদৃষ্ট হয়, অর্থাৎ উহারা বড় হইলেও বর্ণের আর পরিবর্ত্তন হয় না। এতদ্দেশে এই জাতীয় শূকর গুলিই অনেকে প্রতিপালন করিয়া থাকে। একদলে ৫০০ শূকরের অধিক প্রতিপালিত হইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এইরূপ বৃহৎ পালের মধ্যে যে শূকরী গুলির শাবক নিতান্ত শিশু, তাহারা রাত্রিতে শয়নের সময় পাল হইতে ১০। ১২ হাত দূরে গিয়া সন্তান গুলিকে স্তন্য পান করায়। বৃদ্ধগুলি ঘুমাইয়া রহে, ও ছা গুলি তাহার দুধ খায়। সময় সময় শাবকগুলি উহাদের মাতাকে ভুলিয়া অন্য শূকরীরও স্তন্য পান করে, কিন্তু ইহাতে সেই শূকরী শাবককে কিছু বলে না।

বন্য শূকরের ন্যায় ইহারা প্রসবের জন্য ডেরা প্রস্তুত করে না। রাখালেরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার সময়, যেখানে প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়, সেইখানেই প্রসব করে।

প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, শূকরের বিলক্ষণ বুদ্ধি আছে; কেবল ইহাদের বিশ্রী আকৃতি দেখিয়া, এবং আহারাদি সম্বন্ধে ইহাদের নিতান্ত জঘন্য প্রবৃত্তি অবলোকন করিয়া, মনুষ্যেরা ইহাদের মানসিক বৃত্তির পরিমার্জ্জনপূর্ব্বক ইহাকে নানারূপ কার্য্যশিক্ষা দিতে আলস্য করে, কিন্তু চেষ্টা করিলে ইহাদের দ্বারা অনেক প্রকার কার্য্য সংসাধিত করা যাইতে

পারে। কখন কখন ইহাদের পৃষ্ঠে জিন্ কসিয়া উপরে আরোহণ করা যায়, কখন কখন বা শকটাদিতে ২টী বা ৪টী যোজনা করিয়া শকট চালান যায়।

একটি কৃষক তাহার শকটে ৪ টী শূকর যুড়িয়া, সেণ্ট এল্‌বিন্‌সের বাজারে যাইত, এবং ২।৩ বার সেই বাজারে পরিভ্রমণ করিয়া, শূকরদিগকে কিছুকাল বিশ্রাম করাইত। এবং পুনরায় সমস্ত জিনিস পত্র পূর্ণ শকটে উহাদিগকে যোজনা করিয়া, অবলীলাক্রমে ২।৩ মাইলের পথ উহার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত।

নর্ফোক দেশীয় আর একটী কৃষক, ৪ চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী উইচ্‌বেইচ স্থানে এক ঘণ্টায় উপস্থিত হইবে এই বাজি রাখিয়া, তাহার শূকরে আরোহণ করিত, কিন্তু তাহার শূকর নির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্ব্বে তাহাকে তথায় পৌঁছাইয়া বাজি জিতাইয়া দিত। শিক্ষা দিলে শূকরেরা অশ্বের ন্যায় ৪ চারি ফিট উচ্চ দেয়াল লাফাইয়া পার হইতে পারে।

শূকরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। কোন কোন শূকরকে শিক্ষা দিলে কুকুরের ন্যায় বন হইতে বিবিধ শিকার বাহির করিতে পারে। এক ব্যক্তির স্লাট্ নামে একটি শূকরী ছিল, সে শিকারে নিতান্ত পারদর্শিতা দেখাইত। ৪০ গজ দূরে কোন রূপ শিকার থাকিলে তাহা যাইয়া বাহির করিয়া দিত, কিন্তু উহার এরূপ আশ্চর্য্য স্বভাব ছিল যে, সম্মুখে কোন শশক থাকিলে তাহার সে তল্লাসও নিত না।

শূকরের মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু। কিন্তু য়াহুদি ও মুসলমানেরা ইহাকে অশুদ্ধ বলিয়া স্পর্শও করে না। এতদ্দেশীয় আদিম অসভ্য জাতিদিগের ইহা একটি প্রধান জীবিকা। সুসভ্য ইংরেজেরাও শূকরের মাংস নিতান্ত সুখাদ্য বলিয়া মনে করেন। ইহারা বন্যশূকর কিংবা সাধারণ পালিত শূকর ভক্ষণ করেন না। তাহাদের জন্য যে শূকরের মাংস মনোনীত করা হয়, সেই গুলিকে শিশুকাল হইতে ছোট কামরাতে বদ্ধ রাখিয়া অন্য কোনরূপে অপরিষ্কার বস্তু খাইতে দেওয়া হয় না। সিদ্ধ আলু ও সিদ্ধ যব খাওয়াইতে খাওয়াইতে উহাদিগের শরীরে যখন ২ ইঞ্চ পরিমাণ বসা সঞ্চয় হইয়া থাকে, এবং আপন শরীরের ভারে যখন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তখন উহাদিগকে হত্যা করিয়া সেই মাংস সাহেবদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করা হয়।

শূকরেরা সন্তরণে বিলক্ষণ পটু। সন্তানবতী শূকরী সাঁতার দিলে ছা গুলিও পিছে পিছে সাঁতারিয়া যায় এবং ক্লান্ত হইলে সম্মুখের পা দিয়া উহাদের মায়ের পৃষ্ঠে ভর দিয়া রহে।

শূকরের তৈল অনেক প্রকারে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কুঁচিতে সুন্দর সুন্দর বিলাতী ব্রাস প্রস্তুত হয় এবং চর্ম্মে অশ্বারোহণের নিমিত্ত উৎকৃষ্ট জিন্ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। সাধারণ জিন্ হইতে এই জিনের মূল্য ও স্থায়িত্ব উভয়ই অধিক।

শূকর সম্বন্ধে আমরা আজি পর্য্যন্ত যে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি, তাহা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম, আমার শূকরে যদি তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্য একটু সুখী করিতে পারে, তবে ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষা একটি ভাল পশু আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিব।

শ্রীঃ—

স্প্যানিস্ সভ্যতা।

আজি কালি ইউরোপের সকল জাতিই শ্রীমান্। ফ্রান্স বর্ষণোন্মুখ মেঘরাশির ন্যায় নিষ্কম্পভাবে নিজ সময় প্রতীক্ষা করিতেছে। ইংলণ্ড ও রুসিয়া ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী দেশ সকল স্বায়ত্ত করিতেছে। জর্ম্মাণেরা প্রভূতবল যথেচ্ছাচার রাজগণের নিকট হইতে আপনাদের স্বত্ব সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু স্পেন, হতবল, নিরুপায়, নির্জ্জীব; স্পেন, ধীরে ধীরে ইতিহাস ও মনুষ্য হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে।

কিন্তু স্পেন কি চিরকাল এইরূপ ছিল? না এমন একসময় ছিল, যখন স্পেনের জয়পতাকা দেশে বিদেশে উড্ডীন হইত, যখন হলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশ হইতে স্পেনের ধনাগার পরিপূরিত হইত, যখন স্পেনের নামে মহারাজ্ঞী এলিজেবেথও কম্পিতা হইতেন? কি কারণে স্পেনের আধুনিক উচ্ছেদদশা উপস্থিত হইল সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে স্পেনের সহিত ভারতবর্ষের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইহার উত্তরে হিমালয়ের ন্যায় পিরিনিস "স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মেরুদণ্ডঃ" রূপে অবস্থিত। দেশের মধ্যভাগ বিন্ধ্য প্রভৃতির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন পর্ব্বতমালায় বিভক্ত। ভারতবর্ষে যেমন গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি দীর্ঘব্যাপিনী নদী, স্পেনেও সেইরূপ ইব্রো, টেগস প্রভৃতি বিশাল স্রোতস্বতী। স্পেনের তিন দিক্ ভারতবর্ষের ন্যায় বিশাল সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাকৃতিক দৃশ্য মহান্ ও বিস্ময়কর হইলে মনুষ্যের মনে যে সকল ভাব সঞ্চারিত হয়, স্পেনীয়দের মনেও সেই সকল ভাব আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। যে দেশের লোকেরা নিত্য নিত্য অভ্রভেদী পর্ব্বত ও বিশাল সমুদ্র দেখিতে পায়, তাহাদের মনে স্বভাবতঃই পর্ব্বত ও সমুদ্রের স্থষ্টি কর্ত্তার সত্তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয়। তাহারা এই সকল দৃশ্য দেখিয়া আপনাদের অসারত্ব ও ক্ষুদ্রত্ব বু-

বিতে পারে এবং একান্ত মনে অবসন্ন চিত্তে সেই বৃহৎ হইতেও বৃহৎ দেবাদিদেব পরমেশ্বরের নিকট আশ্রয় লয়। ঈশ্বর-ভক্তি ও নিজের প্রতি অনাদর তাহাদের হৃদয়ের প্রধান প্রবৃত্তি হইয়া উঠে। প্রথম হইতেই ভারতবর্ষীয় ও স্পেনীয়দের মনে এই দুইটি প্রবৃত্তির আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মনুষ্য আপনার প্রতি হতাদর হইলে, অন্য একজন প্রভুর আশ্রয়াকাঙ্খী হয়। সুতরাং প্রভুভক্তি ঐরূপ মনুষ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে; এবং নিজে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইলেও তিনি অন্যের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে, স্পেনীয়দের মনে তিনটি প্রবৃত্তি সংযোজিত হয়—ঈশ্বর ভক্তি, নিজের প্রতি অনাদর, এবং প্রভু ভক্তি। যাঁহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, যে প্রাচীন কালে ভারতবাসীদের মনেও এই তিনটি প্রবৃত্তি প্রবল ছিল। ভারতে তেত্রিশ কোটি দেবতার সৃষ্টি, ব্রাহ্মণদের একাধিপত্য এবং দুর্ব্বল ভারতবাসীদের ভৃত্যোচিত সন্তোষ এই কয়টি প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

নানা কারণে স্পেনীয়দের মনে এই কয়টি প্রবৃত্তি ক্রমশঃ পরিপুষ্টই হইয়াছিল। স্পেনীয়েরা প্রথমতঃ রোম কর্ত্তৃক বিজিত হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত দেশের স্বাধীনতা ও ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে রোমের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহারা প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকটে জয় প্রার্থনা করিয়া যাইত। যুদ্ধে জয়লাভ হইলে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিত, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইলে হত ব্যক্তিদের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিত। যুদ্ধ কালে, তাহারা প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত, কারণ প্রভুর শাসনাধীন হওয়াই যুদ্ধে জয় লাভ করার প্রধান উপায়। এই রূপে স্পেনীয়দের মনে প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি অধিকতর রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল।

রোমের ক্ষমতার কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে ভিসিগথেরা স্পেন অধিকার করে। স্পেনীয়দিগকে পুনরায় দেশ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হয়। সুতরাং তাহাদের মনে, পূর্ব্বের ন্যায়, ঈশ্বর ভক্তি ও প্রভুভক্তি আরও অধিকতর বদ্ধমূল হইয়া গেল।

ভিসিগথেরা (Visigoth) দেশে লব্ধাধিকার না হইতে হইতেই আরবীয় মুসলমানেরা স্পেন অধিকার করিল। সুতরাং স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য স্পেনীয়দিগকে পুনরায় বদ্ধপরিকর হইতে হইল। রোমীয় ও ভিসিগথদিগের সহিত যুদ্ধে স্পেনীয়দের প্রভুভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তি পূর্ব্বেই অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এক্ষণে বিধর্ম্মী, ভিন্ন বর্ণধারী, অসভ্য আফ্রিকাবাসী মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে ঐ দুই প্রবৃত্তি আরও অধিকতর রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধ কালে অন্য অন্য অনেকগুলি হৃদয় বৃত্তি পরিপোষিত হয়, তন্মধ্যে সাহস ও কর্ম্মক্ষমতা সর্ব্বপ্রধান। প্রভু-ভক্তির সহিত এই শেষোক্ত দুইটি গুণ যোগ দেওয়াতে স্পেনীয়েরা তাৎকালিক জাতিদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধবিদ্যা বিশারদ হইয়া উঠিল। এক দেশের পর অন্য দেশ তাহাদের করকবলিত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় সমস্ত জাতিগণের মধ্যে স্পেন সর্ব্ব প্রধান বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

কিন্তু একদোষে স্পেনের এই সম্পদ্ চিরস্থায়ী হইল না। স্পেনীয়েরা অন্য অন্য অনেক গুণে বিভূষিত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা যেরূপ অন্যের মুখাপেক্ষী ছিল এখন ও সেইরূপ রহিল। সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে স্পেনীয়েরা রাজার মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিত। রাজা তাহাদিগকে যে পথে চালাইতেন, তাহারা সেই পথে অকুতোভয়ে অমিত সাহসের সহিত চলিত, কখন দ্বিরুক্তি করিত না। আবার পারলৌকিক উন্নতি সম্বন্ধে স্পেনীয়েরা স্বদেশস্থ ধর্ম্ম যাজকের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত। ধর্ম্ম যাজক যে কিছু উপদেশ দিতেন, স্পেনীয়েরা অক্ষুণ্ণ চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত সেই সকল প্রতিপালন করিত। এই রূপে, স্পেনীয়েরা কখন বা রাজার কখন বা ধর্ম্মযাজকের অনুবর্ত্তী হইয়া নানা রূপ সৎকর্ম্ম করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা স্বাধীন চিন্তা বা স্বানুবর্ত্তিতা একেবারে পরিত্যাগ করিল।

যতদিন স্পেনের রাজা ও ধর্ম্মযাজক নিজ২ কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহিত ছিলেন, ততদিন স্পেনের উন্নতিও অপ্রতিহত ছিল। কিন্তু যখন রাশি রাশি অর্থদ্বারা স্পেনের ধনাগার স্ফীত হইতে লাগিল, যখন ইতঃস্তত রাজ্যবিস্তার দ্বারা স্পেনের ক্ষমতা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল, তখন রাজা ও ধর্ম্মযাজক উভয়েই গর্ব্বিত, স্বার্থপর ও সুখবিলাসী হইয়া উঠিলেন। সেই দিন হইতে স্পেনের অধঃপতন আরম্ভ হইল। যতক্ষণ সেনাপতি জীবিত ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যেরা বলবিক্রম প্রকাশ করিয়া বিপক্ষ দলের ভীতি বিধান করিতেছিল। কিন্তু যে দণ্ডে সেনাপতি হত হইলেন, অমনি সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া, যে যেদিকে পারিল সে সেইদিকে পলায়ন করিয়া নিজের প্রাণরক্ষা করিতে লাগিল।

এস্থলে ইংলণ্ডের সহিত স্পেনের তুলনা করিলে, স্পেনের অবস্থা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। ইংলণ্ডে যখন কোন গর্ব্বিত অত্যাচারী, বা স্বার্থপর রাজা সিংহাসনারোহণ করিতেন, তখন ইংলণ্ডের প্রজারা স্পেনীয়দের ন্যায় সমস্ত আশা ভরসা ত্যাগ করিয়া, নিরুদ্যম নির্জ্জীব ভাবে আপনাদের অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইত না। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া যাহাতে সেই রাজা সিংহাসন হইতে দূরীকৃত হন সেই চেষ্টা করিত। প্রয়োজন পড়িলে তাহারা ঐরূপ রাজার

প্রাণবিনাশে পর্য্যন্ত সঙ্কুচিত হইত না। প্রথম চার্লস্, এইরূপে প্রজাদের কর্তৃক বিনষ্ট হন। দ্বিতীয় জেম্‌স যদি সময়ে ইংলণ্ড হইতে পলায়ন না করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনিও প্রথম চার্লসের "রক্তস্রোত* বৃদ্ধি করাইতেন।" ইংলণ্ডীয়েরা শুদ্ধ এইরূপ রাজাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করাইয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। যাহাতে ঐ সকল অত্যাচারী রাজার পরিবর্ত্তে দেশহিতৈষী, প্রজাবৎসল, সত্যপ্রিয় রাজা সিংহাসনারূঢ় হয়েন তাঁহারা সেই চেষ্টা করিতেন। এক্ষণে ইংলণ্ড ও স্পেনের অবস্থাগত বৈষম্য বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ইংলণ্ড স্বানুবর্ত্তী। সুতরাং ইংলণ্ডের রাজার অধঃপতন হইলে ইংলণ্ডের সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইত না। কিছুকাল বিদ্রোহ বিপ্লব সহ্য করিয়া ইংলণ্ড শান্তির পথে, উন্নতির পথে পুনরায় ধাবমান হইত। স্পেন পরানুবর্ত্তী সুতরাং রাজার অধঃপতন হইলে সমস্ত দেশ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত।

এই রূপে স্পেনীয়দের অধঃপতন আরম্ভ হইলে, তাহারা সহজেই অন্য জাতি কর্তৃক বিজিত হইতে লাগিল। সন্নিহিত ফ্রান্সরাজ সহজেই স্পেন অধিকার করিলেন। যত দিন অন্য কোন ইউরোপীয় জাতি স্পেনের সহিত যোগ দিত ততদিন স্পেন অমিত সাহসের সহিত ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ করিত। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সেই জাতি স্পেন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই স্পেন পূর্ব্বের ন্যায় শত্রুর পদ দলিত হইত। কিছু কাল এই রূপে অতিবাহিত হইলে ফ্রান্সরাজ দৃঢ়রূপে স্বকীয় ক্ষমতা স্পেনে সংস্থাপিত করিলেন।

তখন বিজিত জাতিদের যে সকল দোষ ঘটে, এক একটি করিয়া সেই সকল গুলি স্পেনীয়দের মনে অধিকার লাভ করিতে লাগিল। সে দিকে ফ্রেঞ্চরাও যাহাতে স্পেনীয়দের সকল দিকে উন্নতি হয় সর্ব্বান্তঃকরণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুতরাং এক্ষণে ভারতবর্ষের যে অবস্থা স্পেনের অবস্থাও তৎকালে অবিকল সেইরূপ হইয়া উঠিল। জেতারা উভয়েই ভিন্ন দেশী। উভয় স্থলেই জেতারা বিজিতদের মঙ্গল প্রার্থী। উভয় স্থলেই জেতারা স্বদেশস্থ মঙ্গলকর নিয়মাবলী বিজিতদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সচেষ্ট। উভয়েরই একদল লোক জেতাদের পক্ষপাতী, তাঁহাদের পক্ষে জেতাদের সমস্তই (ভাষা, পরিচ্ছদ, প্রভৃতি) সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। উভয় এই অন্য একদল লোক স্বদেশ প্রচলিত পূর্ব্ব প্রথা ও পূর্ব্ব নিয়মের পক্ষপাতী; তাঁহাদের চক্ষে দেশে পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল তৎ সমস্তই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। উভয় এই জেতাদের পক্ষই, সকল প্রকার বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও বহুসংখ্য ও ক্রমশঃ লব্ধপ্রসর।

* জগৎসিংহ ওসমানকে বলিয়াছিলেন, "মা জয় বীরেন্দ্রসিংহের রক্তস্রোত বৃদ্ধি করাইব।"

তখন স্পেনে ফ্রান্সের কাপড না হইলে বস্ত্র পরিধান করা হইত না, ফ্রান্সের রাজমন্ত্রী না হইলে গৃহ প্রস্তুত হইত না। ফ্রান্সের রীতিতে না হইলে গৃহ সজ্জায় মনস্তুষ্টি হইত-না। অল্প কথায় এখন যেমন ইংরাজ ভারতবাসীদের প্রধান অবলম্বন, ফ্রেঞ্চরাও স্পেনীয়দের পক্ষে প্রায় সেইরূপ ছিল।

যতদিন ফ্রান্স ক্ষমতাশালী রহিল, ততদিন স্পেনের অবস্থা এইরূপ চলিল। কিন্তু যখন ফ্রান্স নিজে হতবল হইল, যখন ওয়েলিংটন স্পেনে তাহাদের ক্ষমতা খর্ব্বীকৃত করিলেন তখন স্পেনে আবার এক ভয়ানক বিপ্লবের সৃষ্টি হইল। যে সকল ফ্রেঞ্চ প্রথা স্পেনে রোপিত হইয়াছিল, স্পেনীয়েরা একে২ সেই গুলিকে সমূলে উন্মূলিত করিতে লাগিল, এবং তৎপরিবর্ত্তে ও তৎস্থলে স্বদেশের প্রাচীন প্রথা সমস্ত প্রচলিত করিতে লাগিল। সামাজিক ও রাজনৈতিক শাসন, গৃহ কর্ম্ম প্রভৃতি যে খানে যে টুকু ফ্রেঞ্চদের অনুযায়ী ছিল, স্পেনীয়েরা সেই খানে সেই টুকু পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া তদ্বিপরীতে স্বদেশ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া দিলেন। আজিও স্পেনে এই রূপ পরিবর্ত্তন ও প্রবর্ত্তন চলিতেছে। ফ্রেঞ্চেরা যে গৃহটি অতি যত্নে, অতি পরিশ্রমে পরিপাটী রূপে নির্ম্মান করিয়াছিল, স্পেনীয়েরা আজি তাহার ছাদটি, কালি তাহার কড়িটি পরদিন তাহার দরজাটি একে২ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং পুরাতন বাটির সংস্কার কালে যেরূপ দৃশ্য হয়, আজি কালি স্পেনের দৃশ্যও অবিকল সেইরূপ। এখানে কতক গুলি লোক সুরকি প্রস্তুত করিতেছে। ওখানে কতক গুলি লোক ইটের বোঝা লইয়া গোলমাল করিতে২ উপরে উঠিতেছে। ওখানে ভগ্ন ইষ্টক পতনের শব্দ, এখানে ভৃত্যদের কলরব, ওখানে মিস্ত্রীদের কলরব, এখানে ইঞ্জিনিয়রের তাড়না প্রভৃতি নানা বিরক্তিকর দৃশ্যে দেশ পরিপূরিত হইতেছে। স্পেন আপন লইয়া ব্যস্ত, সুতরাং পৃথিবীর কোথায় কি হইতেছে, তাহা তাহার দেখিবার অবকাশ নাই।

শুদ্ধ ইতিহাসে বিদ্যার পরিচয় দিবার জন্য এ প্রস্তাব লিখিত হইল না। স্পেনের এই অবস্থা ভারতবর্ষের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী কি না, এবং ইংরেজেরা এদেশ হইতে বিদায় লইলে ভারতীয়েরা স্পেনবাসীদের ন্যায় আকুল হইবে কিনা এই তত্ত্বটি প্রশ্নাকারে পাঠকের নিকট উপস্থিত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।

লুক্রিসিয়া।

"অইত দিবসনাথ, উঠিল পূরবে,
ছড়াইয়া কণকের তরল কিরণ,—
"এনিওর" শ্যাম জলে; নেহারি উষায়
অইত্ত মধুরে মরি! কুঞ্জনিল বনে
বিহঙ্গম বিহঙ্গীর চুম্বিয়া অধর;
অইত ফুটিল ফুল, ফুটিলা সরোজি
সরোবরে বৃন্তাসনে জলজ সুন্দরী;
অইত প্রকৃতি দেবী ধরিলা সোহাগে
বিশ্ববিনোদিনী বেশ নয়নরঞ্জিনী;
কেন আজি কোন দুঃখে কেমনে বলিব,
প্রভাতের চারুবেশ সহেনা নয়নে,
তরুণ অরুণ অই তরল অম্বরে,
এনিও-লহরী লীলা, অনিল চঞ্চল,
বিহঙ্গের কলকণ্ঠ, কুসুম কানন;
কিম্বা অই সুহাসিনি সরোজীর পাশে,
সমীরের ভ্রমরের প্রণয় মিনতি,
হলাহলে মাখা যেন, নয়নে আমার,
ইচ্ছাকরে এইক্ষণে, কি বলিব আর
অনন্ত তিমিরজালে লুকাই বদন।
এখনো এল না কেন প্রাণেশ আমার!
রাখিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ,
ত্যজিব কি কলঙ্কিত জীবন এক্ষণে?
ত্যজিব না ত্যজিব না আসুক প্রাণেশ
চরণকমলে তাঁর করি নিবেদন।
অকলঙ্ক মরমের অসহ্য বেদনা।
তার পরে জন্মশোধ, দেখি একবার,
মিটায়ে মনের সাধ, ভরিয়ে নয়ন
প্রাণেশের প্রেমময় বদন মণ্ডল!!
অবশেষে, অরপিয়া নাথের চরণে,
কলুষিত কলেবর, প্রফুল্ল হৃদয়ে,
ছিড়িব প্রাণের লতা, জীবন কাননে!
আর কেন প্রাণনাথ, এস একবার!
করুণ বিকল কণ্ঠে ডাকে অভাগিনী,
কত দিন, যদি নাথ ডাকিত কিঙ্করী,
শিবিরে, প্রান্তরে, কিম্বা আহব অঙ্গনে,
যথায় থাকিতে তুমি, মুহূর্ত্ত ভিতরে,
কি বলিব, প্রণয়ের বিজলী সঞ্চারে,
অমনি হৃদয়-তার, বাজিত তোমার,
অমনি প্রাণেশ তুমি, আসিতে সত্বরে,
তুষিতে, বদন মম করিয়া চুম্বন!
আজি কেন, ডাকি নাথ, ডাকি শতবার,
নাহি পাই দরশন, অভাগীর প্রতি
কেন এত অকরুণ, জীবন জীবন!
এস নাথ ত্বরা করি, আর কতক্ষণ,
বহিবেন বসুমতী, পাপীনীর ভার!
যত উঠিছেন রবি, তরম্বি অম্বর,
ততই বাড়িছে মম হৃদয়বেদনা;
ও কি ও তুরঙ্গ অই হ্রেসিল দুয়ারে,
অই বুঝি আসিলেন হৃদয়রঞ্জন!
এই যে প্রাণেশ মম, নয়ন উপরে,

নিরখি নাথের মুখ, শোক-পারাবার
উচ্ছ্বাসিত হল প্রাণে, জ্বলিল অনল,
রাখিতে পারি না আর নয়নের নীর!
নয়নের বারি আজি, অনন্ত যতনে,
অভাগিনী সম্বরণ করিতে অক্ষম!
ঝরুক ঝরুক তবে, নয়নধারায়
প্রক্ষালিব প্রাণেশের যুগল চরণ!
এস নাথ দুঃখিনীর নয়নের তারা!
দূরে থাক, স্পর্শিও না মিনতি আমার!
স্পর্শিও না কলঙ্কিত কলেবর মম!
এস তুমি স্নেহময়, জনক আমার!
আজি তাত! অভাগিনী নন্দিনী তোমার,
অনন্ত বিদায় চায় চরণকমলে;
দাঁড়াও দাঁড়াও তাত! নয়ন উপরে,
বিদীর্ণ হৃদয়ে আজি, সকরুণ স্বরে,
নিবেদিবে অভাগিনী, হৃদয়বেদনা,
শুন নাথ দয়া করি, অনন্যশ্রবণে!
কালি সেই আহারান্তে, কক্ষে আপনার,
সঙ্গিনী সমাজে বসি, নীরব বদনে,
তুলিতেছিলাম হায়! চারু 'কারপেট'
চম্পকের কলি, যথা মন্দ সমীরণে,
নিরবে নাচিতে ছিল, অঙ্গুলি নিচয়;
ভাবিতেছিলাম কভু, প্রাণেশমুরতি,
সাজিয়া গেলেন যবে, আর্জিয়া সমরে,
সজ্জিত সমরসাজে, কক্ষে অভাগীর!
হেনকালে দেখিলাম, জীবন জীবনে,
দেখিলাম হায়! সেই নির্দ্দয় বর্ব্বরে,
দেখিলাম আর কত, সঙ্গী প্রাণেশের!
পূজিলাম প্রেম ভরে, নাথের চরণ,
পূজিলাম সঙ্গীগণে, কতই যতনে,

কতক্ষণ পরে নাথ! সহ সঙ্গীগণ,
গেলা চলি পুনরায়, 'আর্টিয়া' নগরে!
সজল নয়নে আমি, উন্মাদিনী প্রায়,
দাঁড়াইনু একাকিনী অলিন্দ উপরে,
চাহিলাম একমনে, রাজপথপানে,
দেখিলাম আশুগতি তুরঙ্গমগণ
মিলাইল ক্রমে ক্রমে, মুহূর্ত্ত ভিতরে,
অভাগি নয়ন পথ অতিক্রম করি
অমনি নিষাদবিদ্ধ কপোতিনী প্রায়,
ফিরিনু মনের দুঃখে, আপন মন্দিরে!
সঙ্গিনী কুলের সেই আমোদ সাগরে,
ঢালিয়া দিলাম প্রাণ, জুড়াতে হৃদয়,
অলিন্দ উপরে বসি নিরানন্দ মনে!
দেখিলাম ক্রমে ক্রমে, দিবস রতন,
নীরবে পড়িল খসি, পশ্চিম গগনে,
দেখিলাম দিনমণি, ক্রমে পুনরায়,
লুকাইল সম্বরিয়া, সহস্র কিরণ!
দেখিনু হাসিল সন্ধ্যা, কুসুমবদনে,
তুলিয়া বিনোদহাসি, চিরসৌরভিনী,
শুনিনু গাহিল দূর নিকুঞ্জ কাননে,
বিহঙ্গিনী-মালা মিলি সন্ধ্যার সংগীত।
দেখিলাম স্থির নেত্রে, ক্রমে পুনরায়,
আলোকমালিনি মহী, তিমির বসনে,
আবিরল শ্যাম তনু, সন্ধ্যার মিলনে;
তারাময়ী সুহাসিনী যামিনী সুন্দরী!
ক্রমে ক্রমে দেখাদিল, কুসুম স্যন্দনে,
নবমীর চারুশশী, হাসিল অম্বরে,
চঞ্চলিল চারুশশী, 'এনিওর' জলে।
ত্যজিয়া অলিন্দ পুনঃ, কক্ষে বসিলাম!
শুইলাম সুরঞ্জিত কোমল শয্যায়,

গাইলাম মৃদুস্বরে, ব্যথিত হৃদয়ে,
খুলিয়া কুসুম কণ্ঠ, সঙ্গীত লহরী !
দেখিনু মর্ম্মর মঞ্চে, বিনোদ মন্দিরে,
জ্বলিছে মৃদুলে দীপ, স্ফটিক আধারে,
প্রদীপ হইতে ঝরি, আলোক তরল,
দেখিলাম থরে থরে নাচিছে চঞ্চলে !
শুনিলাম সমীরণ, মধুর নিঃস্বনি,
বিকচিত মধুমদ, কোমল কপোলে,
নাচাইছে ধীরে, নব অলকার দাম।
শুনিলাম দূরে কল সঙ্গীত কোমল,
কামিনীর কলকণ্ঠে ঝ রছে মধুরে,
কোমল শয্যায় শুয়ে, দেখিনু উল্লাসে,
কাদম্বিনী মাঝে শশী, সুদূরগগনে !
দেখিনু কার্পেট পরে কক্ষের দুয়ারে,
অচঞ্চলা চন্দ্রমার, কোমল মালতী,
মিলিয়া পলকহীন ; অচল নয়ন,
দেখিতেছি সেই জ্যোতি, কতই ভাবনা,
ভাবিতেছি একমনে, হেনকালে হায় !
সহসা চরণধ্বনি, শুনিনু সোপানে।
শুনি সে চরণধ্বনি, ফুটিল অমনি,
শত সাধে অভাগীর হৃদয় কমল,
উজ্জ্বল হইল পদ্ম, নয়নের তারা !
চঞ্চলে বহিল রক্ত, ধমনী ভিতরে,
ত্যজিয়ে শয়ন আমি, উঠিনু সত্বরে,
চমকিয়া চলিলাম চঞ্চল চরণে,
ভাবিয়া অন্তরে বুঝি, প্রাণেশ আমার,
আসিলেন তুষিবারে এই অভাগীরে !
কিন্তু কি বলিব হায় ! মুহূর্ত্ত ভিতরে,
শুকাইল আশালতা হৃদয় কাননে,
দেখিলাম ক্ষীণালোকে, সোপান উপরে,
সজ্জিত সমর সাজে প্রাণেশ বান্ধবে !
তখন জানিনি মনে, অমৃত জলদ
বরশিবে হলাহল ; কোমল মুরতি,
কে জানে কণ্টকময় ; জানে কি কখনো,
কুরঙ্গিনী, মরীচিকা, তরঙ্গিনীরূপে
শোভে যবে মরুভূমে, জানিনা অন্তরে !
দেববেশে এল সেই, কৃতান্ত আমার।
প্রবেশিয়া নিজ কক্ষে হায় ! তার সনে,
বসাইনু সমাদরে, কাষ্ঠাসনপরে,
আপনি বসিনু পাশে, পবিত্র অন্তরে !
শুনিবারে প্রাণেশের ! মঙ্গল বারতা,
শুনিবারে সমরের অপূর্ব্ব কাহিনী,
কণ্টকিত কলেবরে শুনিনু শিহরি,
মনোহরা শোভাময়ী আর্ডিয়া নগরী
বেষ্টিয়াছে চারিদিকে, রোম অনীকিনী।
কহিলা বর্ব্বর পুনঃ, কতক্ষণ পরে,
"সমরের পরিশ্রমে ক্লান্ত কলেবর,
তোমার মন্দিরে আমি, অতিথি সুন্দরি,
বঞ্চিব যামিনী দেবি, মন্দিরে তোমার !
অনুমতি দাও তুমি, ভুবনমোহিনী।"
কি বলিব পতিপ্রাণা, সতী সাধ্বী প্রায়,
তখনি সম্মতি দিনু, কহিনু আবার
ভাগ্যবতী আজি আমি, ধরণী মণ্ডলে !
রাখিলাম অতিথিরে, অমৃত প্রদানে
পোষিলাম আশীষে ; কিছুক্ষণ পরে,
অই কক্ষে নিদারুণ করিল শয়ন।
বসিলাম গিয়ে আমি, অলিন্দ উপরে,
দেখিলাম সুখময়ী নিদ্রা পরশনে,
অচল জীবনস্রোত, ক্ষণেকের তরে
ঘুমাইছে জীবকুল, কেবল কাননে

নিঃস্বনিছে সমীরণ, আর নীলাম্বরে
ছুটিতেছে কাদম্বিনী, আবরি সলাজে,
সকলঙ্ক চন্দ্রমা ছবি, নয়ন নন্দন!
দেখিনু অলিন্দে বসি, শয়ন অদূরে,
ভুবন সুন্দরী রোম নিদ্রায় বিহ্বলা।
ক্রমে নবমীর শশী চলিল পশ্চিমে,
সম্বরি মধুরময় কৌমুদী কোমল।
বসিয়াছি, হেনকালে কতক্ষণ পরে,
ডাকিল 'জুলিয়া' আসি, ভাঙ্গিল চেতন,
চলিলাম দ্রুত পদে শয়ন মন্দিরে,
পশিয়া শয়ন কক্ষে, ' জুলিয়ার ' সনে,
খুলিলাম চারুবেশ, রাজেন্দ্রমোহিনী,
পরিনু শয়ন বাস, পর্য্যঙ্ক-উপরে,
রাখিলাম কলেবর, কোমল শয্যায়
তুষার শীতল জল, স্ফটিক আধারে,
রাখিয়া নিশীথ-মঞ্চে, 'জুলিয়া' সুন্দরী
আবরিল চারু দীপ, নীল বসনের
সুকোমল আবরণে, বাঁধিল আবার,
প্রফুল্ল কুসুম দাম, মুক্ত বাতায়নে;
বিদায়িনু ' জুলিয়ায় ' কতক্ষণ পরে।
তার পরে আসিলেন, বিশ্ববিনোদিনী
চিরসুখময়ী নিদ্রা নিকটে আমার,
পরশিলা কলেবর, চিরমোহময়ী,
মুদিয়া নয়ন দুটি হনু অচেতন
সময়ের চল চক্রে মধুরা যামিনী
নীরবে গম্ভীরা; ক্রমে কোমল শয্যায়,
নিদ্রায় বিহ্বলা প্রাণ, হেনকালে হায়!
বোধ হল কলেবরে কর-পরশন;
অমনি ভাঙ্গিল নিদ্রা উঠিনু শিহরী
হৃদয়ের প্রতিঘাত, হইল চঞ্চল,
সভয় হইল হিয়া, সৌদামিনী সম।
উঠিয়া বসিনু সেই পর্য্যঙ্ক উপরে,
দেখিনু শয়ন কক্ষ পূর্ণিত আলোকে!
ঘুচিয়াছে প্রদীপের, নীল আবরণ,
চঞ্চল প্রদীপালোকে, দেখিনু আবার,
পর্য্যঙ্কের পাশে সেই দুরাত্মা বর্ব্বরে!
নিষ্কোষিত অসি করে, মুহূর্ত্তেক তরে,
ঘুরিলা, নয়ন মম, চমকিল প্রাণ!
সঞ্চারিল সৌদামিনী ধমনী ভিতরে,
তরল অনল স্রোত, বহিল শরীরে,
* * * * * * * * * *
মুহূর্ত্ত ভিতরে পুনঃ, পর্য্যঙ্ক ত্যজিয়া,
ব্যাধ শরে বিদ্ধ মত্তা সিংহিনী যেমতি
পড়িলাম হর্ম্ম্যতলে, আকুল অন্তরে;
ভিজানু নয়নাসারে, চরণ তাহার,
করিনু বিকল কণ্ঠে, সহস্র মিনতি,
ভাগ্যদোষে, কি বলিব, নয়নের জলে,
দ্রবীভূত হইল না, নির্ম্মম পাষাণ!
কি বলিব প্রাণনাথ! সেই দণ্ডে হায়!
আলিঙ্গন করিতাম উলঙ্গ কৃপাণে,
ত্যজিতাম এই প্রাণ, অম্লান বদনে!
কিন্তু সুধু ভাবিলাম, কলঙ্ক বেদনা,
ব্যথিবে প্রাণেশ প্রাণ, ভাবিতে ভাবিতে
অবশ হইল প্রাণ, ঘুরিল আবার,
নয়ন মস্তক মম, চেতনা প্রবাহ,
অচল হইল ক্রমে ধীরে ধীরে হায়!
খসিল ভূতলে নব বসন্ত বল্লরী
অচেতন হর্ম্ম্যতলে রহিনু পড়িয়া।
* * * * * * * * *
বল তবে প্রাণনাথ! ধরিবে কেমনে,

কলঙ্কিত তনু পুনঃ হৃদয়ে তোমার !
সতীত্ব বিহনে নাথ ! যুবতী জীবন,
রাখিয়া কি ফল আর সমক্ষে সবার !
এখনি ত্যজিব প্রাণ, অম্লান বদনে ;
প্রাণেশ্বর প্রাণনাথ ! জনক আমার,
অনন্ত বিদায় দাও, চিরঅভাগীরে,
ধরিতে পারি না আর, কলঙ্কিত প্রাণ।
আর কি বলিব নাথ ! শিরায় তোমার,
প্রবাহিত হয় যদি, রক্তের লহরী,
প্রতিফল পায় যেন, পাষণ্ড বর্ব্বর,
বিদায়ের কালে এই, মিনতি আমার !
এই দেখ, করে নাথ ! কৃপাণ উজ্জ্বল,
পবিত্র অন্তর মম, পবিত্র হৃদয়,
কলঙ্কিত কলেবর, শুধু অভাগীর
বর্ব্বরের পরশনে, সেই কলেবর
প্রক্ষালিত করি এই, পবিত্র শোণিতে !
বিদায় মা বসুমতী ! দাও অভাগীরে,
বহিতে হবে না আর পাপিনীর ভার।
যাই তবে এ নাথ ;--ওকি ? প্রাণেশ্বর !
স্পর্শিওনা কলঙ্কিত কলেবর মম !
বিদায় বিদায় তাতঃ। প্রাণেশ বিদায়,
এই বিদারিনু বক্ষ। এই দেখ নাথ !
উছলিল বক্ষঃস্থলে, লোহ-নির্ঝরিণী,
সম্বরিয়া নর লীলা, নারীকুলেশ্বরী,
পশিলা পবিত্রপুরে, নবীন যৌবনে,
রূপের আকাশে মরি, বাসন্তি পূর্ণিমা,
আবরিল অন্ধকারে, অনন্ত জলদে,
শুকাল বসন্ত ফুল, প্রফুল্ল কাননে,
মিলাইল ক্ষণপ্রভা, অনন্ত অম্বরে,
সম্বরিয়া চন্দ্রজ্যোতি, চির অন্ধকারে ;
উষার চুম্বনে চারু, নব প্রমোদিনী,
সৌরভিনী কমলিনী জলজ সুন্দরী
ডুবিল অতল জলে, ফুটিবে না আর।

শ্রীহঃ—

স্ত্রীকবি ও তদনুযায়ী উপদেশ।

পীঠিকা।

সম্প্রতি স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ অবস্থা তাহাতে যাহা পুরুষের শিক্ষণীয়, স্ত্রীলোকেরা প্রায় তাহাই শিক্ষা করিতেছেন। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের উভয়জাতীয় শিক্ষা না হইলে সংসারের কখনই উন্নতি হইবে না। গৃহস্থালি, গার্হস্থ্যশিল্প, পাকবিদ্যা, এই সকলই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ও অবশ্য শিক্ষিতব্য। বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষাতে এ সকলের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হইতেছে।

পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকেরা পুস্তক পড়িতে পারিতেন না, অক্ষর আঁকিতেও জানিতেন না, কিন্তু তাঁহারা গৃহস্থালি, গার্হস্থ্যধর্ম্মোপযোগী শিল্প, বিনয়, সদাচার, ধর্ম্মপ্রবলতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয়

শিক্ষিতব্য বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণা ছিলেন। তাঁহারা বালিকাদিগকে যে সকল খেলা রচনা করিয়া নির্দিষ্ট রাখিতেন, তদ্দ্বারা বালিকাদিগের বালিকা অবস্থাতেই গৃহস্থালি শিক্ষায় অনুরাগ সঞ্চার হইত। রাঁধাবাড়ি খেলায় রন্ধন বিষয়ে অনুরাগ উৎপাদন করিত, পুতুল খেলায় পুত্র কন্যার লালন ও তাহাদের বিবাহ, আত্মীয় কুটম্বের আদর আহ্বান, দাম্পত্য ধর্ম্মের মর্যাদা, লৌকিকতা রক্ষা, প্রতিবেশীপ্রেম, পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে শিক্ষা প্রদান, তাহাদের কলহ ভঞ্জন ইত্যাদি সমস্ত গৃহস্থালীর ব্যাপার অভ্যাস পাইত। ঐ সকল ক্রীড়াতে স্ত্রীলোকের অলঙ্কার ও অমৃতস্বরূপ লজ্জা, ভয়, বিনয়, কোমলতা প্রভৃতি জন্মিত। এক্ষণ ক্রমে সে সকল উঠিয়া যাইতেছে, কেবল অক্ষর শিক্ষাই প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রাচীনকালের গৃহিনীরা কি প্রকারে শিক্ষা দিতেন, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র প্রস্তাব লিখিত হইল। প্রাচীনা স্ত্রীগণের যে সকল সারগর্ব্ভ উপদেশাত্মক বাক্য আছে, তাহাকে আমরা স্ত্রী কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। পুরুষেরা ভাষায় পণ্ডিত, তাঁহাদের ভাষা সুশ্রাব্য, স্ত্রীদিগের ভাষায় তত অধিকার ছিল না, এজন্য তাঁহাদের কবিতা তত সুশ্রাব্য নহে; স্ত্রীভাষা স্বতন্ত্র। স্ত্রীভাষায় গ্রথিত খণ্ডখণ্ড কবিতার মত বাক্যকে আমরা স্ত্রীকবি বলিলাম। ইহার ভাষা এখন শ্রবণ-সুখকর না হইলেও সারগর্ব্ভ বলিয়া প্রমাণস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শিক্ষার আবশ্যকতা ও সময়।

বিধাতা স্ত্রী পুরুষ সৃজন করিয়া আপন সৃষ্টির সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সংসারে স্ত্রী পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া চলিবে এবং পরস্পরকে সুখী করিবে ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত। স্ত্রী পুরুষ যদি যথাযোগ্য রূপ সুশিক্ষিত হইয়া একযোগে সংসারসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সামঞ্জস্যে জীবনাতিপাত করেন, তাহা হইলে এই মানব ধাম স্বর্গতুল্য সুখধাম হয়।

প্রধানতঃ পুরুষেরা গৃহস্থ জাতি, নারীগণ গৃহিনীজাতি। স্ত্রী পুরুষের শিক্ষাবিভাগ এই যে, পুরুষেরা অর্জ্জন শিক্ষা করিবেন এবং গৃহিণীরা গৃহস্থালী শিক্ষা করিবেন; ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি সাধারণে থাকিবেক। উহা পুরুষেরাও শিক্ষা করিবেন, স্ত্রীরাও করিবেন। যেমন এক যোগে গৃহস্থালি করিলে তাহা সুচারু ও সুখের হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মও একযোগে করিলে ভাল হয়। নারীজাতি ধর্ম্মানুষ্ঠান, গার্হস্থ্যবিদ্যা, শিক্ষা প্রভৃতি স্বতন্ত্র হইয়া করুণ, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু ঐ সকলের অনুষ্ঠান একযোগে হওয়া উচিত, একযোগে হইলে বিনাক্লেশে ও সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়।

কি প্রকারে গৃহস্থালি করিতে হয়, কি উপায়ে ধর্ম্মোপার্জ্জন হয়, নারী এ সকল শিক্ষা করিবেন এবং সুশিক্ষিতা হইয়া ধর্ম্ম ও ন্যায় পথে থাকিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। পুরুষদিগের প্রতি এইরূপ নিয়ম যে, গৃহস্থালি ও ধর্ম্মোপার্জ্জন এই দুইটি সংসার বৃক্ষের শাখা, ধর্ম্মসুখ সম্ভোগ তাহার ফল। স্ত্রীজাতির গৃহস্থালি না জানা বিড়ম্বনার বিষয়, পুরুষেরও ধনোপার্জ্জনের অক্ষমতা অসীম দুঃখের কারণ। ধর্ম্মমতির অভাব উভয়েরই অনিষ্টকর। যিনি যাহাই শিক্ষা করুন, তদানুষঙ্গিক ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়। অনুষ্ঠানকালেও ধর্ম্ম ও নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য; যিনি তাহা না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্য করেন, তিনিই বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন।

বিনা শিক্ষায় কিছুই হয় না, ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অতএব কি গৃহস্থালি, কি ধনোপার্জ্জন সমস্তই শিক্ষা করিতে হয়। যাহা শিক্ষিতব্য, তাহা শৈশবাবস্থায়ই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। কেন না বাল্যকালে যাহা শিক্ষা করা যায়, তাহাতেই উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে। বয়োবৃদ্ধিসহকারে নানা বিষয়ে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হওয়ায় স্মরণশক্তির হ্রাস হয়, সুতরাং কোন বিষয়ই ভাল শিক্ষা হয় না। তখন ভোগের সময়, সুখভোগে মন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, সুতরাং কষ্টসাধ্য শিক্ষাসকল ঘটিয়া উঠে না। তখন বুদ্ধি প্রশস্ত হয় বটে, কিন্তু সংসারের চিন্তায় ব্যাকুল হইতে হয় ও ঈদৃশ কষ্ট সহ্য হয় না। এই সকল কারণে শিশুকালেই শিক্ষা আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা বলিয়া থাকেন—

"কচিতে না নোয়ালে বাঁশ।
পাকলে করে টাঁশ টাঁশ॥" (স্ত্রীকবি)

পূর্ব্বে বাঁশের ছড়ি ব্যবহৃত হইত, "চৌপালী" নামক এক প্রকার ঘুনশি ছিল; তাহার ডাণ্ডি বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত হইত, ঐ বাঁশ কচি অবস্থায় চৌপালীর উপযুক্ত করিবার জন্য বাঁকাইয়া দিতে হইত। কেন না পাকা বাঁশ নোয়াইতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়। উপরোক্ত শ্লোকটি তদ্দৃষ্টে কোন গৃহিণী কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। পল্লীবাসিনী বৃদ্ধা গৃহিনীরা কোন বুদ্ধিমতী বালিকা দেখিলে আহ্লাদিতচিত্তে তাহার মাতাকে উপদেশ দিতেন 'তোমার এই মেয়েটিকে এই বেলা গৃহস্থালি শিখাও নচেৎ ইহার পর আর শিখিতে পারিবেনা।' এবং আপনার কথা সপ্রমাণ জন্য উপরোক্ত পুরাতন স্ত্রী-কবিকৃত শ্লোকটির আবৃত্তি করিতেন। অতএব যাহা শিক্ষিতব্য তাহা সংসারভার স্কন্ধে না পড়িতে পড়িতে বাল্যকালেই শিখিতে হইবে। যাহারা প্রথমকালে শিক্ষা না করেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সংসারী হইলে তাঁহাদিগের দুর্গতির সীমা থাকে না।

অশিক্ষিতা নারী কোন ক্রমেই গৃহস্থালির সুব্যবস্থা করিতে পারেন না। সোনার সংসারও অশিক্ষিতার হস্তে, প-

ড়িম্বে ছারখার হয়। কি করিলে সকল দিক্ রক্ষা পাইবে, কিরূপ করিলে সাংসারিক কার্য্য সহজ সাধ্য হইবে, কি কার্য্য করিলে সংসারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে সংসারের অনিবৃতি বা অপ্রতুল ঘুচিবে এবং শ্রীবৃদ্ধি হইবে, অশিক্ষিতা রমণীরা এ সকল বুঝিয়া উঠিতে পারে না। অজ্ঞতা ও অনভ্যাস নিবন্ধন তাহারা সংসারকে ভার জ্ঞান করে এবং কার্য্য কালে তাহাদের ক্লেশ বোধ হয়, ক্রমে আলস্য প্রশ্রয় পাওয়াতে সংসার শ্রীহীন হইতে থাকে; সুতরাং তাহারা জীবনের সারধর্ম্ম ও সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হয়। দুরবস্থা ও ক্লেশসহিষ্ণুতা বশতঃ ক্রমে তাহাদের রুচি কলুষিত হয়। অধর্ম্ম স্পর্শ করে, সুতরাং তাহাদিগের পারলৌকিক সুখেও জলাঞ্জলি দিতে হয়।

পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে। পুরুষেরাও যদি প্রথম বয়সে উপার্জ্জন, নীতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান শিক্ষা না করেন, তাঁহারাও সংসার-দশায় অশেষবিধ ক্লেশ পান। সংসার তাঁহাদিগের ভার বোধ হয় এবং তাঁহারা সংসার চালাইতে ব্যাকুল হন। অবশেষে হয় ত অধর্ম্ম ও অন্যায় উপায়ে ধনার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহপর উভয় কালই নষ্ট করেন।

বাহির হইতে আনয়ন করা বা উপার্জ্জন করা আর গৃহস্থালি কার্য্য করা এই উভয় ভার যদি এক ব্যক্তির স্কন্ধে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয় এবং কার্য্যও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয় না। এজন্য গৃহস্থ ও গৃহিণীর উহা অংশ করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। গৃহস্থ বাহির হইতে ধনাদি আহরণ করিবেন এবং গৃহিণীরা তাহা সামঞ্জস্য করিয়া ব্যয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তাহা হইলে উভয়েরই ভারের লাঘব হয় এবং উভয়েই সুখী হইতে পারেন। যদি গৃহিণীর আহরণের চিন্তা না থাকিল এবং যদি রক্ষণাবেক্ষণের চিন্তাও গৃহস্থের না থাকে, তাহা হইলে উভয়েই আপনাপন কর্ত্তব্যের উন্নতি করিতে পারেন ও সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হয়েন। এইরূপ হইলে অতি সুন্দররূপে সংসার নির্ব্বাহ হয়। নচেৎ একজন দাস হইয়া সমস্ত করিবেন, আর একজন যোগীর ন্যায়, উদাসীনের ন্যায়, পরের ন্যায়, নিঃসম্পর্কিত থাকিবেন ইহা অতীব অন্যায়। ইহাতে উভয়েরই অত্যন্ত কষ্টের বিষয় তাহা প্রাচীন কালের স্ত্রী কবিরা এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

'গাছে পাড়া তলায় কুড়ান এ
সামান্যি নয়।
ন্যাকের জলে চোকের জলে একাকার
হয়॥' (স্ত্রীকবি)

কোন বৃহৎ বৃক্ষের ফল পাড়িতে হইলে দুই জনের আবশ্যক হয়। একজন পাড়িবে ও একজন কুড়াইবে। এরূপ না হইলে কষ্ট এবং ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আম্র পাড়িয়া তলায় ফেলিলে যদি রক্ষক না থাকে, তাহা হইলে অন্য-

স্থানে তাহা দুষ্টলোক কর্ত্তৃক অপহৃত অথবা বন্যপশু দ্বারা ভক্ষিত হইতে পারে। অতএব পাড়িতে গেলে কুড়ান এবং কুড়াইতে গেলে পাড়া হয় না। এই দৃষ্টান্ত শিক্ষা ও অভ্যাস করিলে সংসারকে ভারজ্ঞান হয় না এবং অনায়াসে সংসার কার্য্য-নিচয় সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা যায়। মুটেরা শিক্ষা কৌশল ও অভ্যাস বশে লোকের কত বহুভার দ্রব্য বহন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সংসারের অঙ্গ ও তাহার প্রণালী।

সংসারে সকলেই অজ্ঞানাবস্থায় জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে নানা প্রকার শিক্ষালাভ হয়। কিছু না কিছু শিক্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক। জ্ঞানসঞ্চার আরম্ভ হইলে কিছু না কিছু শিক্ষা হইবেই হইবে। যখন কোন প্রকার ঘটনা আপনা হইতেই হইবে, তখন ভাল বিষয় শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। যে শিক্ষা দ্বারা ইহকালে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও পরকালে শুভ হয়, তাহা শিক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সে বিষয়ে আলস্য করিলে মন্দ শিক্ষার ফল—কষ্টভোগ করিতে হয়। মনুষ্য যদি ধর্ম্ম, নীতি, সংসার-নির্ব্বাহন-প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা না করে, এবং কেবল আহার ভয় ও ইন্দ্রিয়বলিাশ লইয়া থাকে তাহা হইলে সে পশু হইতেও অপকৃষ্ট হয়। পশুরা কোন ভাল বিষয় অর্থাৎ জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি, গৃহস্থালী ইত্যাদি শিখে না। মনুষ্যেরা ইহা শিখে বলিয়া পশু অপেক্ষা সুখী ও শ্রেষ্ঠ। যে মনুষ্য এসকল শিক্ষা না করে সে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া থাকে, কারণ পশুদের কোন বিশেষ প্রকার পাপ শিক্ষা ঘটেনা। মনুষ্য অশিক্ষিত হইলে সে দুর্নিবার ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া কেবল পাপ শিক্ষা করে, সুতরাং অধঃপাতে যায়। এবিষয়ে পুরাতন একটি স্ত্রীগাথা এই—

"বসে বসে খুটি নুটি।

অভাগী যেন পাপের কুটি॥"

যে নারী কোন আত্মহিতকর কার্য্য করিতে ভাল বাসেন না, তাঁহাকে 'খুটি নুটি' অর্থাৎ বৃথা বা নিষ্ফল কার্য্য করিতে হয়, যেহেতু কাহারও চুপ করিয়া থাকিবার যো নাই। একজন বহুদর্শী পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'মনুষ্য কার্য্যের অভাবে অকার্য্য করে' অর্থাৎ কোন ভাল কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলে মন্দ কার্য্য আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। বৃথা কার্য্যে আসক্ত হইলে তাহাকে ক্রমে পাপ আশ্রয় করে, সুতরাং অভাগ্যবতী হইতে হয়।

অনেকে মনে করেন, পুস্তক পড়িতে পারিলেই জীবনের সমস্ত শিক্ষা সমাধা হইল। এটি বড় ভ্রম। পুস্তক পড়িতে শিখা আর দুটি কত অক্ষর পড়িতে শিখা একই কথা। কএকটা অক্ষর জানা কোন ক্রমেই জীবনের প্রধান শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অনেক বালক বালিকা কেবল অক্ষর পড়িয়া বাবু অর্থাৎ অক-

র্মণ্য হইয়া পড়েন; অলস, দুর্ব্বল, অহঙ্কারী, বিদ্যাভিমানী, কার্য্যাক্ষম, বিলাসপ্রিয় হন। নিরবচ্ছিন্ন অক্ষর-শিক্ষা অনর্থের হেতু; অতএব অক্ষর-শিক্ষা অপেক্ষা কার্য্য শিক্ষাই ভাল। এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা লিখিতে বা পড়িতে পারে না অথচ তাহাদের হৃদয় লেখা পড়ার পরিণাম-ফলস্বরূপ—ধর্ম্ম,জ্ঞান,নীতি, কার্য্যদক্ষতা, সদাচার প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট। এই সকল গুণই লেখা পড়ার ফল, নচেৎ উহা পাখীর মতন পড়া ও আঙ্কোড়নের ন্যায় লিখা।

লেখা পড়ার এত সম্মান কেন এবং তাহার সৃষ্টি কেন হইয়াছে, ইহা যিনি অনুধাবন করেন তিনিই উহার যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝেন এবং শিক্ষার উন্নতি করিতে পারেন। যেমন কার্য্যের সুবিধা ও শ্রমলাঘবার্থ নানা প্রকার যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ সহজে শিক্ষার নিমিত্ত লেখা পড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। অতএব লেখা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি শিক্ষার যন্ত্র স্বরূপ। অভিজ্ঞদিগের উপদেশই শিক্ষণীয়; লেখা পড়া উপকরণ মাত্র।

বয়োবৃদ্ধি সহকারে বালক বালিকারা অনেক প্রকার শিক্ষা করিয়া থাকে তৎসমস্তই যে লিপি অবলম্বন করিয়া লাভ হয়, তাহা নহে। গুরূপদেশ ও অন্যান্য নানাবিধ উপায়েই অধিক শিক্ষা হয়। এসম্বন্ধে একটি স্ত্রী-গাথা আছে—

"যে শেখে সে শেখে
ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে॥"

যাহার শিখিবার ইচ্ছা থাকে, সে কোনমা কোন প্রকার শিখিবেই শিখিবে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বজন, গুরু এই সকলের উপদেশ অনুসারে শিক্ষালাভ হয়। কখন কখন এবং কোন কোন বিষয় বিনা উপদেশেও শিক্ষা হইয়া থাকে। বিনা উপদেশে যাহা শিক্ষা হয়, তাহার দুই প্রণালী আছে; এক ঠেকিয়া শিক্ষা আর দেখিয়া শিক্ষা। বুদ্ধিমতী বালিকারা অন্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া অনেক কার্য্য শিখিয়া থাকে। ইহসংসারে সময়ে সময়ে নানাবিধ আপদগ্রস্ত হইতে হয়। বিপৎপাতে সর্ব্বদাই ক্লেশ ও ক্ষতি ঘটে, তৎকালে অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব বহুবিষয় শিক্ষা করা যায়। অন্যায় কার্য্যের ফল উপস্থিত হইলে অনুতাপ জন্মে, তাহা হইতে শিক্ষা হয়, ইহাই ঠেকিয়া শিখা।

(ক্রমশঃ।)

রসিকতা ও রসের কথা।

এই বঙ্গদেশ রসিকতার সমুদ্রবিশেষ। পৌরাণিকেরা ক্ষীরলবণ প্রভৃতি সপ্তসমুদ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন। যদি তাঁহারা বঙ্গভূমির আধুনিক ইতিহাস দিব্যনেত্রে পাঠ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ইহাকে রস-সমুদ্র নাম দিয়া পুরাণপ্রসিদ্ধ ভূগোলশাস্ত্রে সমুদ্রের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আট লিখিতেন। জ্ঞানানন্দের অভিধানে বঙ্গের এক নাম দাসনিবাস, আর এক নাম রস-নিবাস। কেন না, এদেশের সকলেরই ললাটপটে দাসত্বের ধ্বজবজ্র কুশ-রেখা এবং অধরে ও নয়নপ্রান্তে রসিকতার মধুরলাঞ্ছন, সকল সময়ে সমানরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পুত্রকন্যা কি ভ্রাতাভগিনীর নাম রাখিতে হইবে,—বাঙ্গালি তখনও রসিক। কারণ, পুত্রের নাম রসিকচন্দ্র, কন্যার নাম রসময়ী চৌধুরাণী। ভ্রাতার নাম প্রাণনাথ দত্ত, কি রতিকান্ত রায়; ভগিনীর নাম অনঙ্গমঞ্জরী। নামে এইরূপ অসাধারণ রসিকতা পৃথিবীর আর কোন্ দেশে দৃষ্ট হইয়াছে?

দেশবিশেষের নামাবলী পাঠ এক হিসাবে সেই দেশের প্রকৃতি-পাঠ। বৃটনেরা জ্ঞানে গুণে, বৈজ্ঞানিকবলে এবং রাজনীতির কৌশলে আজি কালি সমস্ত সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া থাকিলেও তাঁহারা কোন এক দিন যে গর্ত্তে বাস করিতেন ও আম-মাংস ভাল বাসিতেন, এবং এইক্ষণও তাঁহাদিগের বাস্তুরাজ্যে ডারউইনের ক্রীড়াময়ী কল্পনা যে বিরাজ করিতে পারিতেছে, তাঁহাদিগের নামেই তাহার নিদর্শন। কারণ, যদিও তাঁহাদিগের মিল মেকলে প্রভৃতি ঐতিহাসিকবর্গ, পরকীয় জাতি চরিত ও সাহিত্যাদির সমালোচনায় ক্ষুরধারতীক্ষ্ণতা অবলম্বন করিয়া, পৃথিবীর পুরাণতম জাতিকেও অকুণ্ঠিতকণ্ঠে অসভ্য বলিয়া গালি দিতেছেন, এবং ভাষাতত্ত্বের ভাষাস্বরূপ দেবজনস্পৃহনীয় সংস্কৃত ভাষাকেও বিকটবুলি জ্ঞান করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে Fox (শৃগাল), Wolf (বৃক), Savage (বন্যবর্ব্বর), Hogg (শূকর) ও Badcock (মন্দকুক্কুট) প্রভৃতি শ্রুতিমধুর ও মধুরার্থক নামসমূহ সাহিত্যে গ্রথিত ও সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে এবং লোকে অদ্যাপি এই সকল নাম সাদরে গ্রহণ ও সসম্মানে ব্যবহার করিতেছে। স্বামী, দিবসের পরিশ্রমের পর ক্লান্তকলেবরে গৃহে আসিতেছেন, গৃহলক্ষ্মী প্রেমভরে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছেন,—'হে শৃগাল, হে শৃগাল!' অথবা—'হে বৃক

হে বৃক!' পুনরপি বলিতেছি, কি মোহনধ্বনি, কি মধুর। বঙ্গীয় কুলকামিনীরা ক্লান্তকলেবর কান্তকে 'হে শৃগাল', অথবা 'হে বৃক' বলিয়া সম্বোধন করেন না বটে, কেন না বাঙ্গালি রসিক। কিন্তু রসিকতার অনুরোধে বাঙ্গালির নামাবলী যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, তাহা পুরুষের শোভা পায় কি না এবং পুরুষের তাহাতে তৃপ্তিলাভ সম্ভব কি না, ইহা গভীর সন্দেহের বিষয়। অথবা ইহাতে সংশয় ও বিস্ময়ের কথা কি? যাঁহারা ভারতউদ্ধারের জন্য আন্ধার তালে গীত গাইতে পারেন, তালে তালে নাচিয়া নাচিয়া নাচনিচ্ছন্দের অশ্রাব্যকবিতায় জাতীয় হৃদয়ের মর্ম্মনিহিত শোকবহ্নি উদ্গারণ করিতে সমর্থ হন, তাদৃশ বীরেন্দ্র কেশরী, সুরসিক ধুরন্ধর পুরুষদিগের নাম কামিনীকান্ত, যামিনীকান্ত, কুমুদিনীকান্ত ও বিনোদিনীকান্ত এবং রমণীমোহন ও 'দলিতাঞ্জন পুঞ্জগঞ্জন' ভামিনীরঞ্জন ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

কবিসমাজের কীর্ত্তিস্তম্ভ শেক্ষপীর কহিয়াছেন—

'নামে কি করে,
গোলাপ, যে নামে ডাক, মধু বিতরে।'

আমরা অকবি, সুতরাং একথা আমরা মানিতে পারি না। আমাদিগের এই বিশ্বাস যে, নামে আর কিছু না করুক, উহা দেশীয় রুচি এবং সাময়িক প্রকৃতির অনুকূল পর্য্যন্ত প্রদর্শন করে। প্রাচীন আর্য্যবীরদিগের নাম, ভরত, শত্রুঘ্ন, ভীষ্মার্জ্জুন, বলদেব, বাসুদেব, দুর্য্যোধন, ভীম;—ঋষিদিগের নাম ব্যাস, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ,—শাস্ত্রকারদিগের নাম, পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, কণাদ;—এবং দেশস্থ সাধারণ ভদ্রলোকদিগের নাম শতানন্দ, শাকটায়ন। যখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি মাননীয় আর্য্যগণ, বঙ্গে প্রথম সমাগত ও উপনিবিষ্ট হইলেন, তখন এই বঙ্গেরই বাঙ্গালিদিগের নাম শূরসেন ও বীরসেন, বিজয় ও বল্লাল, এবং সেই সমাগত মহানুভাবদিগের নাম দক্ষ, বেদগর্ভ, মকরন্দ ও বিরাট। তাহার পর, যবন অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব সময়ে বঙ্গভূমি যখন অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন এবং সর্ব্বথা অধোগতিপ্রাপ্ত হইল, শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে ভাটা লাগিল, বিদ্যাবুদ্ধি ও মহত্ত্ব গৌরব পর-পাদুকা-লেহন জন্য নূতন গৌরবের নিকট হীনপ্রভ হইয়া পড়িল, তখন তাঁহাদিগের নাম হইল, আই, চাই, কচু, ঘেচু, বিক, কোক ইত্যাদি। এইরূপ বহুদিনের পর, বহুযুগের তপস্যার পর, বিলাসসমুদ্রে ভাসমান, সুশিক্ষিত সুসভ্য, সুরুচিসম্পন্ন বাঙ্গালি-বীরদিগের নাম হইয়াছে,—রমণী, কামিনী, মানিনী, ভামিনী, কুমুদিনী, বিনোদিনী, রাই, কিশোরী। ইহার পর, কোন দিন হয়ত, কোন এক সুরসিক বাঙ্গালি, ব্রজবিলাস যাত্রায় জয়দেবের গীত শুনিয়া, আত্মজের নাম রাখিবেন,—"ললিতলবঙ্গলতাবল্লভ'

—এবং অনুজের নাম রাখিবেন, 'প্রেমময়ী পদ-পঙ্কজ'। তিনকালের ত্রিবিধ রুচি, সুতরাং ত্রিবিধ নাম।

নামে যেমন বাঙ্গালির রসিকতা, সাহিত্য এবং সামাজিকতাতেও বাঙ্গালির সেইরূপ কি ততোধিক রসিকতা, 'দেদীপ্যমান, দোদুল্যমান ও চকচকায়মান' রহিয়াছে। আদৌ গ্রাম্যরসিক। গ্রাম্যরসিকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাচীন, তাঁহাদিগের বেদ দাশরথির পাঁচালী, ভাষ্য আধুনিক কবিওয়ালাদিগের টপ্পা এবং টীকা গোবিন্দের দুই একটি গীত। তাঁহারা সভাস্থলে ইহার কোন না কোন ব্যক্তির নাম লইতে পারিলেই, আপনাদিগকে সায়নাচার্য কি কল্লুকভট্টের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র জ্ঞান করিয়া অভিমানে ফুলিয়া উঠেন; এবং আলাপে কাহারও মাতা, শ্বশ্রুমাতা, দুহিতা কি ভগিনীকে যদি ভঙ্গিক্রমে কুলকলঙ্কিনী, অথবা সন্তানতুল্য ঘনিষ্ঠ-জন-সম্পর্কে বন্ধুসহচারিণী বলিতে পারেন, তাহা হইলে, কি রসিকতা প্রদর্শন করিলেন, আর কি রসের কথাই বা বলিলেন, ইহা ভাবিয়া আহ্লাদে অবশ হন।

আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা নব্য রসিক,—হয়ত কোন দিন কোন এক গ্রাম্য পাঠশালায়, বাঙ্গালার দুচারি পংক্তি পড়িয়াছেন,—হয়ত কোন দিন কোন এক ভদ্র লোকের মুখে ব্যাকরণের নাম শুনিয়াছেন,—যাঁহারা এইরূপ রসিক, তাঁহারা সাধারণতঃ, বাবর ঘরের বিনোদচন্দ্র,—নাটক নবেল রূপ বমনবমনের নবীন ভ্রমর, এবং প্রেমসরোবরের ভেক। দুই একটি বদর্থ কবিতা কণ্ঠস্থ আছে,—বিদ্যার এই পর্য্যন্তই দৌড়—অবসর পাইলেই সেই কবিতা পঠিত হইবে। কিন্তু একটি গীত কোনকালে শিখিয়াছিলেন, তাহাও সুযোগ মতে গাইতে হইবে। আর, মধ্যে মধ্যে মাইকেল নামক কাব্য-রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্রের কথা, এবং বিষবৃক্ষ নামক ছন্দ-তত্ত্ব রচয়িতা বিদ্যাপতির কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকারের নিন্দা কি প্রশংসা করিতে হইবে। নহিলে, লোকে তাঁহাদিগকে রসিক বলিবে কেন? যদি দেশে এইরূপ রসিকতারই আদর না থাকিত, তাহা হইলে কবির আসরের এক পার্শ্বে পিতা আর এক পার্শ্বে দুহিতা যুগপৎ উপবিষ্ট থাকিয়া কাব্য-রস-পিপাসার চরিতার্থতা সাধনে সমর্থ হইতেন না,—যাত্রার আসরে বেশ্যা রাম শোকে খেমটা নাচিতেন না, এবং অর্দ্ধ শিক্ষিত কুল কামিনীরা, অর্দ্ধ শিক্ষিত নব্য রসিকদিগের ন্যায়, শিক্ষার নামে অবলার স্বভাব-সুন্দর শালীনতায় জলাঞ্জলি দিতে উৎসাহ পাইতেন না।

নগরবাসী রসিকদিগকে পুরাকালে নাগর কহিত;—এখনও তাঁহারা সেই নাগরই রহিয়াছেন;—বেশে নাগর, বিভূষণে নাগর, এবং রসিকতা ও রসের কথাতেও ষোড়শ কলায় সুশোভিত দুর্নিবার

নাগর। মুখে সতত অর্থশূন্য অট্টহাস্য, মনুষ্যের মর্মান্তিক দুঃখ এবং শোকের অন্তর্ভেদি আর্ত্তনাদ লইয়াও হাস্য পরিহাস, সকল কথাতেই মুখভঙ্গি এবং মুখভঙ্গিতেই বিশ্ব বিজয়;—ভগবানের চিরিয়া খানায় এই এক শ্রেণীর জীব। যেমন আগমবাদী তান্ত্রিকের নিকট মদিরাগন্ধ-শূন্য মনুষ্য মাত্রই পশু, ইহাদিগের নিকটও ধীর, গম্ভীর, চিন্তাপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রই ভণ্ডতাপস ও অকর্মণ্য লোক। ইহাদিগের রসিকতার প্রথম লক্ষণ পরনিন্দা। যিনি মুক্তকণ্ঠে ও মুক্ত হৃদয়ে, প্রাণের সহিত পরনিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন,—মহৎসাহসশীল কৃতী পুরুষকে পাগল কি পাষণ্ড বলিয়া করতালি দিতে এবং কি দেশের হিতকর, কি সমাজের মঙ্গলকর সমস্ত প্রকারের সৎকর্ম্মকেই সময়ের অপব্যয় অথবা বাল-চাপল্য বলিয়া ভ্রূক্ষেপে উড়াইয়া দিতে লজ্জা অনুভব করিবেন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাঁদিগের রসিকতার দ্বিতীয় লক্ষণ ইতর-জনসেব্য অশ্লীল ভাষা। যে সকল শব্দ, অভিধান কর্ত্তৃক ঘৃণায় পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সমাজের ভদ্র বিভাগ কর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়া পাপনিবাসের পঙ্কিল হ্রদে লুকাইয়া রহিয়াছে, সেই সকল অকথ্য শব্দই ইহাঁদিগের কথ্য ভাষা এবং আদরের ধন। যিনি জিহ্বাকে তাদৃশ শব্দের দ্বারা কলুষিত করিতে সঙ্কুচিত হন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহার আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। ইহাঁদিগের রসিকতার তৃতীয় লক্ষণ নিজ নিজ ভার্য্যা প্রসঙ্গে প্রেমালাপ। যিনি সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, জীবনের সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপরিগৃহীতা ভার্য্যাকে গণিকা হইতেও ঘৃণিত রূপে বর্ণনা করিতে ম্লান ও পরিম্লান হয়েন, ইহাঁদিগের নিকট তাঁহারও আসন লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা। হায়! এইরূপ রসিকদিগের হস্তেই বঙ্গভূমির ভবিষ্যৎ ন্যস্ত রহিয়াছে।

যখন ক্ষণ-জন্মা মধুসূদন মনোমদমধুর নিঃস্বনে কবিতায় বঙ্গ-ভারতীর স্তুতিগীত গাইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বঙ্গের কতিপয় উচ্চ শিক্ষান্বিত ও প্রতিভা সমন্বিত ক্ষমতাশালী পুরুষ বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিশোধন ও পরিবর্দ্ধন এবং উন্নতি ও বিকাশের জন্য প্রথম লেখনী ধারণ করিলেন, তখন লোকের এইরূপ আশা হইয়াছিল যে, এতদিনে বাঙ্গালি, পঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া, পদ্ম-মধুর জন্য মানস সরোবরে সন্তরণ করিতে শিক্ষা করিবে। কিন্তু এইক্ষণ দেখা যাইতেছে যে, লোকের সে আশাও মৃগ-তৃষ্ণিকায় পরিণতি পাইতেছে। কারণ, অনুকরণের পর অনুকরণে, তার আবার অনুকরণে, বাঙ্গালায় ইদানীং যাহা কিছু লিখিত হইতেছে, তাহার সাধারণ নাম—রসের কথা; এবং যে কেহ বাঙ্গলা গ্রন্থ পাঠ করেন, তাঁহার সাধারণ নাম,—রসিক।

পূর্ব্বে যেমন আমরা বাঙ্গালার ভারত-

উদ্ধার-রত বীরভদ্রদিগের নামাবলী পাঠ করিয়াছি, যে সকল অমূল্য গ্রন্থের দ্বারা সেই ভারত-উদ্ধার লাভ করিবে, পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য আমরা এস্থলে তাহারও দুচারিটি নাম উল্লেখ করিতে পারি। বাঙ্গালির মস্তিষ্কসম্ভূত বঙ্গাক্ষরে লিখিত প্রাচীন গ্রন্থমালার নাম অনুমানদীধিতি, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, শব্দতত্ত্বকৌমুদী। এইক্ষণকার গ্রন্থ সমূহের নাম,—'তুমি কি আমার', 'আমি কি তোমার', 'হায় কি মজার শনিবার', 'হায় কি রসের নূতন বাহার' ইত্যাদি। বঙ্গদেশ কাব্যের প্রিয়নিবাস, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রসসমুদ্রের আকাস্মিক উচ্ছ্বাসে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই একবারে এক সঙ্গে কবি হইয়া বসিয়াছে, এবং দুর্ভিক্ষ-দুঃখ-কাতরা ক্ষীণদেহবরা বঙ্গভূমি কাব্যের তটাভিঘাতি তরঙ্গ-তাড়নে এবং রসের কথার উৎপীড়নে অহোরাত্র থর থর কাঁপিতেছে। গ্রন্থকার চতুর্দ্দশ বৎসরের বালক, শিক্ষকের গল-গর্জ্জনে বিদ্যালয়ে তাঁহার স্থান হইল না—গৃহিণী একাদশবর্ষীয়া বালিকা, শ্বশ্রূজনের নিষ্ঠুর গঞ্জনায় গার্হস্থ্যজীবনে তাঁহার চিত্ত রহিল না। অতএব উভয়ে মিলিয়া কবিতা লিখিলেন, 'হায় বৃথা আছি'— অথবা 'হায় বৃথা কাঁদি'। অনুসন্ধান করিলে সপ্রমাণ হইবে যে, আধুনিক কবিতাপুঞ্জের অনেক কবিতাই এইরূপ রসশিশু বালক বালিকার রসিকতার নিদর্শন।

কেবল বালক বালিকারাই যে এই দোষে দোষী, এমন নহে। বৃদ্ধ এবং পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্ত তরুণদিগের মধ্যেও অনেকে এই রস বিকারের প্রবলস্রোতে পড়িয়া ইদানীং হাবু ডুবু খাইতেছেন। এদেশের একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন নবীন কবি আদিরসের কবিতা লিখিতে বড় ভাল বাসেন। আদিরসের কবিতা লিখিতে তাঁহার ক্ষমতাও আছে। ঐ প্রকার আদিরসের কবিতা নীতিবিগর্হিত বলিয়া অনেক সময়ে যার পর নাই অনিষ্টকর হইলেও, ভাবের আবেগে এবং ভাষার পারিপাট্যে প্রায়শই পাঠকসমাজের একান্ত প্রীতিকর হইয়া থাকে। তিনি কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন দেখিলাম'। কবিতাটি সুন্দর ও সুখপাঠ্য। তাঁহার ছন্দানুবর্ত্তনে ন্যূনতঃ একশত মস্তিষ্কশূন্য এবং শতাধিক রস-পরিচয়শূন্য অকর্ম্মণ্য যুবা কবিতা লিখিয়াছেন,—'কেন চাহিলাম', 'কেন চাহিলে', 'কেন নাচিল নয়ন', 'কেন ঝাঁপিলে বদন'। এইভাবে, যেন তেন প্রকারে অদ্যাপি অনন্তকোটি 'কেন' বাঙ্গালায় লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচলিত হইতেছে। এই 'কেন' এইরূপ রসিকতার রাজ্য ছাড়িয়া আর যে যায়, এমন ভরসা কি?

যে সময়ে যুবরাজ এদেশে পদার্পণ করিলেন,—প্রফুল্ল শরচ্চন্দ্রের ন্যায়, আ-

নন্দনলহরী বিকীরণ করিয়া ভারতে ভারত-সাম্রাজ্য সংস্থাপনের জন্য উপনীত হইলেন, তখন এদেশের কাব্যকণ্ঠে ভয়ানক এক কণ্ডূয়ন উপস্থিত হইল। যেই দুই তিনটি প্রকৃত কবি জাতীয়-সম্মান রক্ষার অভিলাষে কবিতায় যুবরাজকে সম্ভাষণ করিলেন, অমনি কবিতার বকার-বোধ-বিরহিত সহস্র যুবা, যেন কি এক রসাবেশে আবিষ্ট হইয়া, যুবরাজকে কবিতায় অঞ্চলের ধন, স্নেহরতন বলিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন। লোকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করিল,—ইহা কি? বঙ্গভূমির বাৎসল্যরস সহসা এইরূপ উছলিয়া উঠিল কেন?—কিন্তু যেহেতু শুধু এক বাৎসল্যরসেই কবিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হয় না, এই নিমিত্ত বঙ্গের এক বয়োবৃদ্ধ পরিচিত কবি রঙ্গভূমিতে দর্পসহকারে প্রবেশ করিয়া, কবিতায় বর্ণনা করিলেন যে, ভারতমাতা জরতী হইলেও আজি রস-ভাবের উচ্ছলিত প্রবাহে পুনরায় যুবতী হইয়াছেন, এবং যৌবনের শোভা দেখাইয়া, কেশে ফুল, কর্ণে দুল এবং কপোলে চূর্ণকুন্তল দুলাইয়া, মদনমোহন নৃপনন্দনকে প্রেমভরে আহ্বান করিতেছেন,—অতএব যুবরাজ সানন্দে আসিয়া সমাগত হউন। এই কবিতা আমাদিগের কল্পিত প্রলাপ নহে। ইহা লিখিত, মুদ্রিত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল এবং সহৃদয় পাঠকবর্গ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—ইহা রসের কথা। পঞ্চবিংশতি কোটি মনুষ্যের দগ্ধপ্রাণ ভারতমাতা বলিয়া যাঁহার নাম করিতেছে—দেশে বিদেশে শাস্ত্রার্থদর্শী সুধীপুরুষেরা যাঁহাকে সভ্যতা ও সামাজিক নীতির আদি জননী, পরমার্থতত্ত্বের রত্ন-খনি এবং সকল ভাষার ভাষাপ্রসবিনী বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছে, সেই আর্য্যাশ্রপ্রবাহরূপা নর্ম্মদা ও ভাগীরথীর পবিত্রবারিধৌতা ভারতভূমিকে চটুলনয়না নবীননায়িকা সাজাইয়া, তাঁহাকে রাজবেশে বিভূষিত নবীননায়কের সঙ্গে সম্মিলিত করা সামান্য কবিত্ব-শক্তি এবং সামান্য রসিকতার পরিচায়ক নহে।

আর একজন অভিনব কবি রূপজীবিনী পণ্যবিলাসিনীদিগের রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি নিগূঢ় তত্ত্ব লইয়া কবিতা লিখিতেই বড় সুখী হইয়া থাকেন। মনুষ্য মনুষ্যের নিকট যাহা বলিতে পারে না, মনুষ্য মনুষ্যের নিকট যাহা শুনিতে চাহে না,—শুনিতে পারে না, তিনি কবিতায় সেই সকল অশ্রাব্য কথা অতি মনোহর ভাষায় প্রকটন করিতেছেন এবং সংপ্রতি ঐরূপ একখানি কাব্য লিখিয়া তাঁহার ভার্য্যার নামে তাহা উৎসর্গ করিয়াছেন। এই কাব্য তাঁহার ইতিহাস, এই কাব্য তাঁহার উপন্যাস। ইহার অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার আত্মকথা। তিনি কোন একটি সরলহৃদয়া কুলবালাকে কিরূপ কৌশলে ও কুহকে বশ করিয়া কুলপিঞ্জরের বাহিরে আনিয়া-

ছেন, আর একটিকে বাহিরে আনিয়া পরিশেষে কেন ত্যাগ করিয়াছেন, তৃতীয় একটিকে প্রণয়কলহে একবার পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কি উপায়ে নগরের উপকণ্ঠে স্বকীয় উদ্যানে লইয়া গিয়াছেন, চতুর্থ একটিকে নর্ত্তকী বানাইয়া সেরী সাম্পেন প্রভৃতি সামগ্রী সহকারে পাঁচ ইয়ারের মজলিসে কিরূপে সভায় আনিয়া দেখিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ও উল্লিখিত কাব্যখানিতে বিবিধ মধুরচ্ছন্দে বিন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে ইহা বলিয়া অবশ্যই এইক্ষণ আশ্বাস দিতেছে যে,—'হে কবিবর! হে বঙ্গীয় বীণাপাণির কাব্যবনের নূতন ভ্রমর! তুমি আর অকারণ করুণস্বরে রোদন করিও না। তুমি যাঁহার জন্য এই কাব্য রচনা করিয়াছ, রচনা করিয়া যাঁহাকে ইহা উপহার দিয়াছ, তিনি অতঃপর নিঃসংশয় তোমাকে রসিক বলিয়া সাদরে সম্ভাষণ করিবেন, এবং বঙ্গদেশের গ্রামস্থ ও নগরস্থ উভয় শ্রেণীস্থ রসিক পাঠকই ইহার অভ্যন্তরীণ রসের স্বাদ গ্রহণ করিয়া তোমার ক্ষমতা ও গুণবত্তা, তোমার ভাবুকতা ও রসশাস্ত্রে প্রবীণতার কথা সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।'

যদি উদাহরণের বাহুল্য প্রদর্শন আবশ্যক হইত, তাহা হইলে আমরা এইরূপ কাব্যগত রসিকতার বহু সংখ্যক উদাহরণ পাঠকবর্গের নিকটে অনায়াসে উপস্থাপন করিতে পারিতাম। কিন্তু বোধ হয়, আমাদিগকে সে আয়াস পাইতে হইবে না। যাঁহারা বাঙ্গালা কাব্যের অনুশীলন কি সমালোচন করেন, আমাদিগের ভরসা আছে যে, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে আমাদিগের কথায় সায় দিবেন এবং উল্লিখিতরূপ রসের লহরীতে ভাসিয়া যে বাঙ্গালি ও বাঙ্গলা সাহিত্য প্রাণে মরিতেছে, ইহা হৃদয়ের সহিত স্বীকার করিবেন।

তবে কি রসিকতা ও রসের কথা পাপ? প্রকৃতির এই রসপূর্ণ অমৃত-নিকেতনে উপবেশন করিয়া, এমন কথা মুখে আনিতেও আমাদিগের সাহস হয় না। আমরা যখন জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সেই অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয়, ঔদাস্যাত্মক শোভাদর্শনে বিমোহিত হইয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া যাই, তখন আত্ম-স্মৃতির প্রথমস্ফূরণেই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এইরূপ বলিতে থাকি যে, ইহা দেখিলেও যাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃসত্ত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন সহসা কোন অটবীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, অটবীর শ্যামকান্তিতে প্রতিবিম্বিত সায়ন্তন সূর্য্যের অপরূপ কান্তি অবলোকন করি—সূর্য্যের আলোক বৃক্ষের পত্রে পত্রে ও পত্রান্তরালে এলায়িত ভাবে জড়িত হইয়া কিরূপ হাসিতে থাকে ও খেলিতে থাকে, যখন আমরা স্তিমিত নেত্রে তাহা দর্শন করি, তখন ইহাই প্রথম মনে হয় যে, এই

মাধুরী, এই তরুরাজি, এই লতাবিতান, এই নিস্তব্ধ সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শনেও যাঁহার হৃদয়ে রস-সঞ্চার হয় না, তিনি চক্ষুঃস্বত্ত্বে অন্ধ, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়। আমরা যখন কোন প্রশস্ত-হৃদয়া ও প্রসন্ন-সলিলা স্রোতস্বিনীর পুলিনপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া উহার তরঙ্গরাজির সহিত পূর্ণ-চন্দ্রের প্রভা-তরঙ্গের লীলানৃত্য নিরীক্ষণ করি, স্রোতস্বিনী চন্দ্র-কিরণ-স্পর্শে প্রমত্ত হইয়া, বক্ষে চন্দ্রহার পরিয়া, চন্দ্রমালা পরিয়া, কুলু কুলু ধ্বনিতে কতই কি কহিতে থাকে, আমরা যখন কর্ণ ভরিয়া তাহা শ্রবণ করি,তখন মুখে কথা না ফুটিলেও মনে ইহা বলি যে,প্রকৃতির এই চারু দৃশ্য দর্শনে, এই অপরিস্ফুট রসলাপ শ্রবণেও যাঁহার হৃদয় রসসঞ্চারে আর্দ্র হয় না, তিনি চক্ষুঃস্বত্ত্বে অন্ধ,তিনিশ্রুতি স্বত্ত্বে বধির, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি মূঢ়।

কাব্যে নবরস, প্রকৃতির এই অনন্ত বিস্তারিত মায়াকাননে,—অনন্ত রস। তুষার-সমাবৃত দুর্নিরীক্ষ্য পর্ব্বতের কাছে রসের এক কাহিনী, তরুশাখাবিলম্বিত পুষ্পস্তবকের কাছে রসের আর এক কাহিনী। সমুদ্রের ফেণায়মান ধূ ধূ বিস্তারে রসের এক কথা, সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে রসের আর এক কথা। যাঁহারা যথার্থ রসলিপ্সু, যথার্থ রসিক, তাঁহারা এই রসই পান করিতেছেন এবং চিরকাল এই রসই পান করিয়া কৃতার্থ হইবেন। বিজ্ঞানের গম্ভীর মূর্ত্তি এই রসের সংস্পর্শ পাইয়াই সাধকের নিকট সুধাময়ী বলিয়া প্রতিভাত হয় এবং প্রকৃত কবিতাও এই রসের কণিকা লইয়াই, কোকিলার ন্যায় কলকণ্ঠে গাইয়া গাইয়া সর্ব্বত্র সুধা বিতরণ করে।

পাঠক, তুমি কি প্রকৃতির এই রসোপহারে উপেক্ষা করিয়া,—বিজ্ঞান ও কবিতা চিরপ্রীতবদ্ধ দম্পতীর মত সম্মিলিতস্বরে যে গভীর গীত গাইতেছে তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া, শুধু ভ্রমরগুঞ্জন সদৃশ তরল রসের তরল কথা শুনিতেই ভালবাস? যদি তাহাতেই তোমার হৃদয়ের তৃষ্ণা ও লালসা থাকে, তবে এস,—যেখানে কল্পনার কুঞ্জবনে শকুন্তলা মাধবী ও সহকারের সহিত স্নেহকম্পকণ্ঠে কথোপকথন করিতেছেন, রামচন্দ্র রমণীকুলের মুকুটমণি জনকনন্দিনীকে বাহুলতা উপরে রাখিয়া, চারি চক্ষে চিত্রপট দেখিতেছেন, অথবা রোমিও জুলিয়টের গবাক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রবাহ অপূর্ণ মাধুরীভাষার ঢালিয়া দিতেছেন, সেই স্থলে গমন করি। কি গভীর, কি তরল, রসের কথা শুনিতে চাও ত কোকিল ও ভ্রমরের নিকট যাও। কাক ও ভেকের নিকট কে কবে রসের কথা শুনিয়া তৃপ্ত হইয়াছে?

সমালোচন।

১। "নিভৃত নিবাস। কাব্য। প্র- .মখণ্ড। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।" —আমরা রাজকৃষ্ণ বাবুর গুণপক্ষপাতী। তাঁহার কবিতায় সৃষ্টি নৈপুণ্য নাই, উদ্দী- ।প্য নাই। কিন্তু আমরা তথাপি তাঁহার ়রল ও প্রাঞ্জল পদাবলী পাঠ করিয়া বি- শষ প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। ঘনসন্নি- বষ্ট সুবর্ণরাশি এবং সুবর্ণের সূক্ষ্মাগত বিতত পত্রে যে প্রভেদ, প্রগাঢ় রচনার র- 'পূর্ণ কবিতার সহিত রাজকৃষ্ণ বাবুর ক- ।তারও সেই প্রভেদ। ইংলণ্ডীয় গ্রের শাক-গীত নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় বন- সুমের অলোক-দৃষ্ট, অনাঘ্রাত সৌন্দ- ।ার একটি আশ্চর্য্য বর্ণনা আছে। সেই ।নাটি অল্পাক্ষর-গ্রথিত তত্ত্ব-সূত্রের ন্যায় র পর নাই সংক্ষিপ্ত, সুতরাং যার পর ই গাঢ়। পাঠ মাত্রেই সেই শব্দ কয়টি ।ঠকের হৃদয়ে গিয়া চিরজীবনের জন্য ব্রুদ্ধ হয়, এবং সেই শব্দগামা ।নগূঢভাব কিয়া থাকিয়া মনে পড়ে ও মনে এই সার-সমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, -এই অনন্ত জগতের অনন্ত সুন্দরচ্ছবি ও কল্পনার সান্নিধ্যে অর্দ্ধপরিস্ছন্ন ধীরে ধীরে প্রদর্শনের জন্য লইয়া রাজকৃষ্ণ বাবু নিভৃত নিবাসের ায় সেই ভাবটিকে তরল ব'- া দিয়াছেন। কিন্তু প্রসূন কৌশলে এই অনুবাদও একান্ত মনোহর হইয়াছে। আমরা কবিতাটি উদ্ধৃত করি- লাম। বাঙ্গালি কবি, বাগানের ফুলে মালা গাঁথিয়াও, তাহাতে বনফুলের শোভা কিরূপ ফলাইতে পারিয়াছেন, পাঠক তাহা দেখিয়া তৃপ্ত হইবেন।

—"প্রিয়তমে, হৃদয়েশি! এ পোড়াকপালে
তোমা হেন সুরভিত সুললিতফুল
সরস থাকিবে কেন? হায়রে, অকালে
নীরস, বিশীর্ণ মোর কুসুম অতুল।
বনের কুসুম বনে আপনিই ফুটে,
নিজে হাসে, নিজেদোলে, নিজেই খেলায়;
অযত্নে সৌরভ তার আপনিই ছুটে,
বনের কুসুম বনে আপনি শুখায়।
কেহ নাহি করে তারে আদর যতন,
কাজেই না হয় মায়া নাহি কাঁদে মন।"

যদি নিভৃত-নিবাস শুধু এইরূপ ভাবা- নুবাদেই পূর্ণ থাকিত, তথাপি আমরা ই- হার প্রশংসা করিতাম। কারণ, কবিতায় কবিতার অনুবাদ নিতান্ত অনায়াসসাধ্য নহে। এদেশের একজন যশস্বী কবি বা ঙ্গালায় সংস্কৃতের অনুবাদ করিতে গিয়া উপহসিত হইয়াছেন। যদি বাঙ্গালায় - স্কৃতের অনুবাদই এত কঠিন, তাহা হ ইংরেজীর অনুবাদ কত কঠিন, তাহা f ক্ষম ব্যক্তি মাত্রই অনুভব করিতে প কিন্তু নিভৃত নিবাসের সমস্ত ব।

শই যে অনুবাদ কিংবা অনুকৃতি, এমন নহে। ইহার অনেক কবিতা নূতন এবং নিতান্ত মধুর, কিন্তু কোন কবিতাই তাড়িত-তরঙ্গময়ী নহে। যাঁহারা রাজকৃষ্ণ বাবুকে কবি নামের অযোগ্য বলেন, তাহারা হয় পরিহাস-রসিক, না হয় ভ্রমান্ধ। অবসর সরোজিনী ও নিভৃত নিবাসের মত উপাদেয় কাব্য, উচ্চতর শক্তির পরিচায়ক না হইলেও উপেক্ষা কি অবজ্ঞার বস্তু নহে।

২। "উপদেশ মঞ্জরী। শ্রীশিবচন্দ্র বিশারদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত"।—গ্রন্থের কলেবর চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠা, গ্রন্থোক্ত বিষয় বিদ্যাশিক্ষা, ধনোপার্জ্জন, অহঙ্কার, ইত্যাদি প্রসঙ্গে চিন্তাশূন্য প্রচলিত উপদেশ। যথা। "অভিমানের প্রধান সহচর দ্বেষ, অতএব যিনি অভিমানের বশবর্ত্তী, তিনি দ্বেষেরও দাস হইয়াছেন, সংশয় নাই"। যাঁহারা মানবজগতের ইতিহাস শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং মহত্ত্বের অবতার-স্বরূপ প্রকৃত মহানুভাব পুরুষদিগের জীবনচরিত সমালোচনা করিয়া জীবনের নীতিসূত্র শিখিয়াছেন, তাঁহারা এসকল অর্থশূন্য কথায় তৃপ্ত হইবেন কি না, জানিনা। গ্রন্থকার একজন প্রাচীন শ্রেণীস্থ ...ণ্ডিত; অতএব বাঙ্গালার অনুশীলনে ...হাকে উৎসাহ দেওয়া আমরা উচিত ... করি।

৩। "শোকাঞ্জলি। ১৮৭৮ সনের ...র্চ তারিখে শ্রীলশ্রীযুক্ত অনরেবল ...ডন বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর কে, সি, এস্, আই, সাহেব ...য়ের চট্টগ্রামে শুভাগমনোপলক্ষে শ্রী...নীকমল দত্ত প্রণীত"। ইহা একখানি ক্ষুদ্র পদ্যপ্রবন্ধ। লেখকের শব্দবোধ আছে এবং শব্দের সহিত শব্দগ্রন্থনের ক্ষমতা আছে। অভ্যাস করিলে, তিনি পদ্যরচনায় পটু হইবেন বলিয়া ভরসা হয়। আমরা তাঁহার একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। গ্রন্থকার বিগত কার্ত্তিকের সেই ভয়াবহ ঝটিকাবর্ত্তের বর্ণনায় লিখিতেছেন,

"সেইদিন ডুবিলাম লবণাম্বু জলে,
যেন মজাইতে সৃষ্টি ভীষণ নিস্বনে
বহিল উত্তাল স্রোত কল কল কলে,
ভাসিল সকলদেশ সে ঘোর প্লাবনে।
স্মরিলে সে দুঃখরাশি ফেটেযায় বুক
চিরতল কেন নাহি করিল সে জল?
তবে আর কে সহিত এ বিষম দুঃখ!
কে খণ্ডাবে ভবিতব্য লিখা কর্ম্মফল!"

৪। "সাহিত্য-বিন্দু। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত"।—ইহা স্বভাব দর্শন, শূন্যস্থোদ্যান, রাজা প্রতাপসিংহ ইত্যাদি শিরোনামে নীতিবিষয়ক ঐতিহাসিক কথামূলক কতকগুলি পদ্য প্রবন্ধ আছে। এই গ্রন্থখানি বালকবালিকার উপযোগী। লেখা স্থানে স্থানে অপরিপক্ক এবং কোন কোন স্থলে ব্যাকরণ বিরুদ্ধ ও অশুদ্ধ হইলেও সাধারণতঃ প্রাঞ্জল। আমরা একটি অশুদ্ধি দেখাইয়া দিতেছি, ভরসা করি গ্রন্থের পুনঃসংস্করণে এইরূ...

বিশুদ্ধ করিয়া দিবেন। যথা, পিরামিডের বর্ণনায় ৩২ পৃষ্ঠায়,—"ইহা অল্প সময়ের মধ্যে বিলয় হইতে পারে।" ব্যাকরণ ও ভাষার চিরপ্রতিষ্ঠিত রীত্যনুসারে "বিলয় পাইতে পারে," কি "বিলীন হইতে পারে" লেখা যায়, "বিলয় হইতে পারে" কখনই এইরূপ লেখা যায় না। কারণ লয় শব্দের অর্থ সংশ্লেষ ও বিনাশ; সংশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট নহে।

৫। "আক্ষেপ। কলিকাতা ভবানীপুর, ওরিএন্ট্যাল প্রেসে শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত"। গ্রন্থকর্ত্রীর নাম কমলকামিনী। তিনি যে একটি সুশিক্ষিতা কুলকামিনী তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার এই প্রণয় বিচ্ছেদের কবিতাগুলি মিষ্ট ও মধুর। আমরা মিষ্টতার অনুরোধে দুই তিনটি কবিতা নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

সখীরে!—

চেয়ে দেখ, দিনমণি যায়, যায়, যায়;
প্রদোষ-অম্বরতলে, কাদম্বিনী ছুটে চলে,
ঝলসিছে মৃদু মৃদু সরসীর গায়;
বিষাদিনী কমলিনী সলিলশয্যায়।

*   *   *

খীরে!—

কমল কমল-আঁখি ওই দেখ মুদিল;
কুমুদিনী হাসি,হাসি,আনন্দ-সাগরে ভাসি,
ধীরি ধীরি আঁখিমেলি নাথপানে চাইল;
রজত-কিরণ, মরি, সে বদনে খেলিল।

সখীরে!—

কেন লো সহসা আজি হৃদিমন কাঁপিল?
প্রাণেশ না দিবে যদি,দূর দূরে কেন হৃদি
হুতাশ হুতাশে কেন পোড়া দেহ পুড়িল?
না জানি কপালে সখি আজি কিবা ঘটিল।

*   *   *

সখীরে!—

মনে হয় যেন সেই এ হৃদয়ে পশিয়া,
লইয়া হৃদয় যন্ত্রে, সদয়ে মিশায়ে তন্ত্রে,
ডাকিছে মোহনস্বরে,সে যন্ত্রেতে খেলিয়া;
রাধাকুঞ্জে বাঁকা যেন বেণু বাঁশী ধরিয়া।

যদি সকলগুলি কবিতা এইরূপ হইত, তাহা হইলে আমরা শুধু প্রশংসা করিয়াই গ্রন্থখানি পরিত্যাগ করিতে পারিতাম। কিন্তু 'আক্ষেপের' বিষয় এই গ্রন্থকর্ত্রী আমাদিগকে এইরূপ সহজে বিদায় লইতে দিলেন না। তিনি প্রিয়-বিরহের প্রীতিকর প্রসঙ্গে হৃদয়ের উচ্ছ্বসিতবেগে কয়েকটি ভাল কবিতা লিখিয়া পরিশেষে, কি ভাবে, কি হেতুতে জানি না, কয়েকটি অতিকদর্য্য কবিতা এই গ্রন্থে নিবিষ্ট করিয়াছেন। উহার একটি কবিতায় স্পষ্টরূপে উল্লেখ না থাকিলেও ভাবতঃ তিনি ব্রজের রাধা হইয়া বসিয়াছেন এবং তাঁহার 'মনচোর' মদনমোহনকে চন্দ্রাবলীর চারুবল্লভ এবং কুব্জার কেলিনায়করূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অবশ্যই মনে করিয়াছেন যে, ইহাতে লোকে তাঁহাকে রসিকা বলিবে; কিন্তু আমরা তাঁহাকে অতি কাতরবচনে এই কথা সবিশেষ বলিতে পারি যে, কি বঙ্গদেশের সুশি ভদ্রসমাজ, কি এই চিরঅনুগত বিশি

ন্ধব, কেহই এই কদর্য্য রসিকতার উৎসাহদাতা নহে।

৬। "নীতিরত্নাহার। শ্রীকালীকিশোর চক্রবর্ত্তী প্রণীত"।—ইহা নীতিবিষয়ক একখানি পদ্যগ্রন্থ। ইহার দুই একটি পদ্যরচনা অংশতঃ প্রীতিপ্রদ হইয়াছে।

৭। "স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান (দার্শনিক) কাব্য। বেনারস নিবাসিনী শ্রীমতী ভুবনমোহিনী দেবী প্রণীত ও শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত"। দর্শনশাস্ত্রের গূঢ়াদপিগূঢ় আগমতত্ত্ব লইয়া কাব্য রচনা করা অনেকেরই শোভা পায় না। দেবী ভুবনমোহিনী আমাদিগের বিবেচনায় এইরূপ আয়াস-সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ভাল করেন নাই। তবে ইহা অবশ্যই বলিতে পারি যে, তাঁহার রচনাশক্তি আছে এবং স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া এই গ্রন্থ আদরযোগ্য।

৮। "মনুসংহিতা ও কুল্লূকভট্ট। অর্থাৎ মহর্ষি মনুর মতের সহিত কুল্লূকভট্টের মতের তুলনায় সমালোচন। ভূতপূর্ব্ব 'আর্য্যপ্রতিভা' সম্পাদক শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ প্রণীত"। এই প্রবন্ধটি প্রশংসার্হ হইয়াছে;—লেখা উৎকৃষ্ট, লেখকের বিদ্যাবত্তা ও চিন্তাশক্তিও সম্মানার্হ। প্রাচীন তত্ত্ব লইয়া এইরূপ আন্দোলন করিলে, যেমন ইতিহাসের পথ খুলিবে, বাঙ্গালা ভাষারও তেমনই উপকার দর্শিবে।

৯। "সাহিত্যরত্নাবলী। শ্রীহরি-মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত"।—হরিমোহন বাবুর এই পুস্তকখানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার বিশেষ উপযোগী। ইহাতে উৎকৃষ্ট কবিতা আছে, উৎকৃষ্ট গদ্য প্রবন্ধ আছে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের অনতিসংক্ষিপ্ত একটি ইতিবৃত্ত আছে।

১০। "বিশ্ব-বিষ চিকিৎসা। শ্রীহরিমোহন সেনগুপ্ত প্রকাশিত"।—এই গ্রন্থখানি লেখকের যারপর নাই অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রন্থকার নকলনবিশ নহেন। পদার্থশাস্ত্র ও চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে এবং তিনি লিপিক্ষম।

১১। "জীমূতবাহন। (পূজাপদ্ধতি) শ্রীঅনুকূল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত ও প্রকাশিত"।—নারায়ণ সেবার পুরাতন পুথির মত ইহা একখানি নূতন পুথি। ইহার কলেবর ১৬ পৃষ্ঠা, মুদ্রণে পারিপাট্য আছে। ইন্দ্রের এক নাম জিমূতবাহন। এই জিমূতবাহন ইন্দ্র নহেন, ইনি এক নূতন দেব। গ্রন্থকারের ইচ্ছা যে, জগতে ইহাঁর পূজা প্রতিষ্ঠিত হউক।

১২। 'সুলোচনা বিনাশম্। শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীতম্। প্রথম সংস্করণম্।'—বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রে যেরূপ জন্ম আদিরসের উপকথা এবং উপকথার অবসানে নীতি কথা আছে, এই গ্রন্থখানিতেও সেইরূপ উপকথা ও নীতিকথার অদ্ভুত মিশ্রণ দৃষ্ট হইল। প্রভেদ এই, বিষ্ণুশর্ম্মার সংস্কৃত যেমন পরিপক্ব ও প্রীতিপ্রদ, ইহার সংস্কৃত সেইরূপ পরিপক্ব ও প্রীতি-

দ নহে। তবে গ্রন্থকারের এই এক প্রশংসা, তিনি সংস্কৃতে ইহা রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

১৩। "কবিতাবলী। লবপুর সংস্কৃতপাঠশালা-সংস্কৃতাধ্যাপকান্যতম শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রিণা বিরচিতা।"—এখানিও সংস্কৃতে রচিত, কিন্তু ইহার রচনা অপেক্ষাকৃত মধুর। পণ্ডিতবর হৃষীকেশ শাস্ত্রী আধুনিক সংস্কৃত লেখকদিগের মধ্যে সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য। তাঁহার রস বোধ আছে, ছন্দোবোধ আছে, এবং লিখিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে।

১৪। "কামিনী কলঙ্ক। ইদিলপুর নিবাসী শ্রীহরমোহন ঘোষ প্রণীত। উত্তরপুর নিবাসী শ্রীআনন্দচন্দ্র গুহের প্রযত্নে সংকলিত।"—এই চৌদ্দ পোনর পৃষ্ঠার চটি, কামিনী কলঙ্ক নামে অভিহিত না হইয়া, কলমের কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত হইলেই ভাল ছিল। জল-প্লাবন-বিপন্না একটি ভদ্র মহিলা দস্যু হস্তে নিপতিতা হন, দস্যুরা তাঁহার ধর্ম্ম নাশ করে, একথায় কামিনী-কলঙ্ক কিসে আসিল? লেখা পড়িয়া বোধ হইল গ্রন্থকার কখনও কখনও বাঙ্গালা বই পড়িয়া থাকেন। "শোক একপ্রকার নহে" এই নীতি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার কএকটি পংক্তি লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে সেই পংক্তি কয়টিই আমাদিগের নিকট ভাল লাগিল। অন্যান্য স্থান পাঠে বোধ হইল, যেন ভাবা তাঁহার নিকট নিতান্ত নিপীড়িত, নিগৃহীত অবস্থায় অবস্থান করিতেছে;—তিনিও তাহাকে ভালবাসেন না, সেও তাঁহার নিকট পার্শ্বমানে যাইতে চাহে না।

১৫। "ভারত নলিনী। নাট্যগীতি। শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত বিরচিত।" এই নাট্যগীতি অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুকৃতি। কিন্তু ইহাতে প্রশংসা করিবার কিছুই নাই। কালিদাসের সেই লীলাময়ী লেখা পড়িয়া, তার পর ইহা পাঠ করা সময়ের অপব্যয় মাত্র। ভারতনলিনীর একটি গীত নিম্নে উদ্ধৃত হইল। আমাদিগের বোধ হয়, বাঙ্গালা গীত সাধারণতঃ ইহা অপেক্ষা অধিকতর ললিত, মধুর ও মনোহর হইয়া থাকে।

"কেনরে অবোধ চিত, প্রবোধ কথা না শুন?
জান ত দুরাশা। শুধু, মিলিবে না সে রতন।
হে বিধাতঃ, লওহে হরি, হৃদি হতে প্রাণেশ্বরী,
না না না বিনয় করি থাক্ থাক এজীবন।
এই কি কুসুম-বাণ, কহ মার! মোর প্রাণ,
বজ্রহতে খরশাণ, বিঁধিছে যে এ পরাণ।
এই কি সুধার অংশু, বিতর ওহে সুধাংশু
তব ও সুধার অংশু দহিছে পাবক যেন।"

১৬। "বিজয়া, উপহার। শ্রী[illegible]লাল সরকার প্রণীত।" গিরিরাজ-বালা উমা বিজয়া দশমীতে জনক নিবাস পরিত্যাগ করিয়া কৈলাসে যাইতেছেন,—এই কথা অবলম্বনে এই পদ্যময় ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে। ইহার মুদ্রণ পারিপাট্য মনোহর, রচনাও স্থানে স্থানে সুন্দর। আমরা এস্থলে ইহার [illegible] পংক্তি উদ্ধৃত ক-